ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড প্রিজার্ভেশন-২

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড প্রিজারভেশন-২

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

নবম-দশম শ্রেণি

লেখক

মোহাম্মদ আনোয়ার পারভেজ

এমএস ইন ফুড টেকনোলজি (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদক

ড. শ্রীকান্ত শীল

পি.এইচ.ডি ইন ফুড টেকনোলজি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৭

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগারি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিকস্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনালস্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনালস্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ বছর উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম পত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	কাঁচামাল	১-৭
দ্বিতীয়	কাঁচামালের গ্রেডিং, সর্টিং, স্পেসিফিকেশন	৮-১৭
তৃতীয়	দানাদার শস্য	১৮-৪৬
চতুর্থ	বেকারি ও কনফেকশনারি দ্রব্য	৪৭-৬২
পঞ্চম	তেলবীজ	৬৩-৬৮
ষষ্ঠ	তেলবীজজাত দ্রব্য	৬৯-৭৪
সপ্তম	ডাল	৭৫-৭৭
অষ্টম	খাদ্য ভেজালকরণ	৭৮-৮১
নবম	খাদ্যে ব্যবহৃত সংযোজনীয় দ্রব্য	৮২-৮৫
দশম	খাদ্য আইন	৮৬-৮৮
একাদশ	খাদ্যের নির্ধারিত মানদণ্ড	৮৯-৯২
দ্বাদশ	খাদ্যদ্রব্য প্যাকেজিং/মোড়কীকরণ	৯৩-১০৩
ত্রয়োদশ	ধারক বা কনটেইনার	১০৪-১০৮
	ব্যবহারিক	১০৯-১১৯
	লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট	১২০-১৩৩
	Skill in Communicative English	১৩৪-১৪৮

দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	প্রক্রিয়াজাত কারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি	১৪৯-১৭১
দ্বিতীয়	ফল ও সবজি সংরক্ষণ	১৭২-১৯২
তৃতীয়	মাছ	১৯৩-২০১
চতুর্থ	মাংস	২০২-২১০
পঞ্চম	মাংস সংরক্ষণ	২১১-২১৭
ছষ্ঠ	ডিম ও ডিমজাত দ্রব্য	২১৮-২২২
সপ্তম	ডিমের পুষ্টিমান	২২৩-২২৬
অষ্টম	দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ	২২৭-২৪৭
নবম	ফ্লেভার	২৪৮-২৫১
দশম	দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	২৫২-২৫৪
একাদশ	প্লান্ট সেনিটেশন ও হাইজিন	২৫৫-২৬৩
দ্বাদশ	জ্যাম ও জেলি	২৬৪-২৭৪
ত্রয়োদশ	ভিনেগার	২৭৫-২৭৯
	ব্যবহারিক	২৮০-২৮৭
	লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট	২৮৮-৩০৭
	Skill in Communicative English	৩০৮-৩১৮
	সহায়ক পুস্তকের নাম (Reference)	৩১৯-৩২০

প্রথম পত্র

প্রথম অধ্যায়
কাঁচামাল

১.১ কাঁচামালের সংজ্ঞা
নির্দিষ্ট নামের কোনো একটি খাদ্যপণ্য প্রস্তুত করতে যে সমস্ত খাদ্যসামগ্রী যেমন টাটকা ফলমূল, শাকসবজি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, দানাদার শস্য, তেল বীজ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাদেরকে ঐ খাদ্যপণ্যের কাঁচামাল বলে।

১.২ কাঁচামালের ভৌত অবস্থা
খাদ্যসামগ্রীর গুণগত মান নির্ভর করে ব্যবহৃত কাঁচামালের ওপর। প্রথমত ভৌত অবস্থা বিবেচনা করে কাঁচামাল নির্বাচন করা হয়। নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে কাঁচামালের ভৌত অবস্থা নির্ণয় করা হয়।

(ক) আকার
(খ) আকৃতি
(গ) বর্ণ
(ঘ) গঠন
(ঙ) গন্ধ
(চ) ক্ষত

কোন ধরনের খাদ্যদ্রব্য তৈরি হবে তার ওপর ভিত্তি করে কিছু কাঁচামালের ভৌত অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হলো :
আম : ঝাল আচারের জন্য কাঁচা আম যা আঁটিসহ ছুরি দিয়ে কাটা যায় এবং মিষ্টি আচারের জন্য সম্পূর্ণ পাকা আম নির্বাচন করা হয়। কাটা, আঘাতপ্রাপ্ত, অপরিপক্ব অথবা ঝরে পড়া আম আচারের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

আনারস : পাকা আনারসের গোড়ার দিকের রং সবুজ থেকে হলুদ অথবা হালকা বাদামি প্রকৃতির হয়। চোখের উপরের আবরণ শুকিয়ে যায়। গভীর চোখ বিশিষ্ট আনারস প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় সমস্যা সৃষ্টি করে।

পেয়ারা : জেলি তৈরির জন্য সাধারণত অর্ধ পাকা বড় বা মাঝারি আকারের পেয়ারা নির্বাচন করতে হয়। অপরিপক্ব অথবা বেশি পাকা পেয়ারা বাদ দেওয়া হয়।

টমেটো : সস, কেচাপ, ককটেইল ইত্যাদি তৈরিতে গাছপাকা লাল টমেটো ব্যবহার করা হয়। কোনো অংশ সবুজ বা হলুদ থাকবে না। কোনো অংশ ক্ষত বা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবে না।

পেঁপে : পেঁপে বেশি পরিপক্ব হলে এর গায়ের রং সবুজ থেকে হালকা সবুজে পরিণত হয়। বোঁটার দিকের সবুজ রং হালকা হলুদ রং ধারণ করে।

কলা : কলার চিপস তৈরির জন্য শক্ত, সবুজ (৩/৪ ভাগ পক্ব) বর্ণের আনাজি অথবা সাগর কলা নির্বাচন করতে হয়।

জলপাই : আচারের জন্য ব্যবহৃত জলপাই হবে গাঢ় সবুজ, পরিপক্ব, দাগ বা ক্ষতমুক্ত।

লিচু : লিচু পাকলে ফলের রং সাধারণত লালচে উজ্জ্বল হয়ে আসে এবং কাঁটাগুলো আর শক্ত থাকে না।

কাঁচা মরিচ : বড় আকারের কাঁচা মরিচ ব্যবহার করা হয়। তবে মরিচ অবশ্যই পরিপুষ্ট হতে হবে। অপুষ্ট মরিচ দিয়ে আচার বানালে আচারের স্বাদ ও ঘ্রাণ নিম্নমানের হয়।

১.৩ কাঁচামাল সংগ্রহের পদ্ধতি

প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যের ধরনের ওপর ভিত্তি করে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে কখনও কখনও সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত কাঁচামালের নমুনা দেখে বা কাঁচামাল উৎপাদিত এলাকা থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা হয়। তবে মৌসুমভিত্তিক উৎপাদিত কাঁচামাল যেমন- বিভিন্ন রকম ফলমূল ও শাকসবজি একসাথে বেশি সংগ্রহ করে সাময়িকভাবে হিমায়িত করে সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়া কিছু কিছু প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যের জন্য বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করা হয়।

যেসব বিষয় বিবেচনায় রেখে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয়, সেগুলো হলো–

১) সংগ্রহের জন্য খাদ্যভিত্তিক পরিপক্বতা নির্ধারণ।
২) সঠিক পদ্ধতিতে চয়ন, বাছাই ও ত্বরিত শীতলীকরণ।
৩) সঠিক পদ্ধতিতে প্যাকেটজাতকরণ।
৪) সঠিক পদ্ধতিতে পরিবহন।
৫) সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ।
৬) ভালো তদারকির ব্যবস্থা।
৭) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

১.৪ কাঁচামালের ব্যবহার

খাদ্যদ্রব্য তৈরির প্রথম যে উপাদানটির প্রয়োজন সেটি হলো কাঁচামাল। এরপর অন্যান্য উপাদান যোগ করে বিভিন্ন রকমের খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা যায়। কাঁচামালের বিবিধ ব্যবহার রয়েছে। নিম্নে কাঁচামালভিত্তিক খাদ্যদ্রব্যের তালিকা দেওয়া হলো :

ক্র. নং-	কাঁচামাল	খাদ্যদ্রব্য
১.	ফল : আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, কমলা, আনারস, আপেল, আঙ্গুর, বেল, তেঁতুল, কুল, লেবু, চালতা ইত্যাদি।	জ্যাম, জেলি, আচার, স্কোয়াশ, মোরব্বা, জুস, টফি, চাটনি, পানীয়, টিন জাত দ্রব্য ইত্যাদি।

২.	শাকসবজি : বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, মটর দানা, মাশরুম, আলু, পেঁপে, টমেটো ইত্যাদি।	টিনজাত বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, মটর, আলুর শিঙ্গাড়া, ভেজিটেবল রোল, টমেটো সস ইত্যাদি।
৩.	মাছ-মাংস : বিভিন্ন ধরনের খাবার উপযোগী সামুদ্রিক মাছ, মিঠাপানির মাছ, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, মোরগ ও মুরগির মাংস।	মাছ ও মাংসের কাবাব, কোপ্তা, কালিয়া, কাটলেট, মিট বল, ফিশ বল, স্মোকড ফিশ, মিট, মাছ ও মাংসের পিকেল, টিনজাত মাছ এবং মাংস, সসেজ ইত্যাদি।
৪.	দানাদার শস্য : ধান, গম, জব, ভুট্টা ইত্যাদি।	চিড়া, মুড়ি, খই, রুটি, বিস্কুট, কেক, পিঠা, কর্নফ্লেক, ছাতু ইত্যাদি।
৫.	ডাল : মসুর, মুগ, ছোলা, খেসারি, মটর, মাসকলাই ইত্যাদি।	চানাচুর, বেসন, ডালভাজা, ছোলাভাজা, চটপটি, হালিম ইত্যাদি।
৬.	দুধ : গরু, মহিষের দুধ।	দই, ঘোল, মাখন, ক্রিম, পনির, আইসক্রিম, পাউডার দুধ ইত্যাদি
৭.	ডিম।	পুডিং, কেক, অমলেট, চপ, সুপ, এগ পাউডার ইত্যাদি।

১.৫ কাঁচামালের গুণগত বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব

কাঁচামালের গুণাগুণ বহুলাংশে তার পরিপক্বতার ওপর নির্ভর করে। প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্যের ধরন ও বাজারের দূরত্ব বিবেচনা করে কাঁচামালের পরিপক্বতা নির্ণয় করে সংগ্রহ করতে হয়। যেসব কাঁচামালে অণুজীবের ক্রিয়া দ্রুত হয় এদের জন্য ত্বরিত শীতলীকরণ ব্যবস্থা করতে হয় যেমন- মাছ ও মাংস দ্রুত জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় বিধায় শীতলীকরণের প্রয়োজন পড়ে। কাঁচামালের প্যাকেটজাতকরণ খুব সতর্কতার সঙ্গে করতে হয়, তাছাড়া পরিবহনের সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্যাকেটের আকার-আকৃতি এমনভাবে নির্ধারণ করা দরকার, যেন পরিবহনকালীন সময় সব রকম আঘাত হতে রক্ষা পায় এবং উঠানো-নামানোর কাজটি সহজতর হয়। ডিম পরিবহনের জন্য ক্রেট ব্যবহার করলে কোনো প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। পরিবহনের জন্য সাধারণত কম দূরত্বের সুন্দর রাস্তা বেছে নিতে হয় যেন তাড়াতাড়ি কারখানায় পৌঁছানো যায়। কারখানায় পৌঁছানোর পর পুনরায় পর্যবেক্ষণ করতে হয় পরিবহনের সময় কোনো প্রকার ক্ষত হলো কি না। কাঁচামাল সংগ্রহের সকল স্তরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে কার্য সম্পাদন করতে হয়। এজন্য দক্ষ তদারকির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

কাঁচামাল পরিষ্কারকরণ

খাদ্যদ্রব্য বিশেষ করে কাঁচামাল যখন সংগ্রহ করা হয় তখন তার মধ্যে নানা রকম অপদ্রব্য মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। এই অপ্রয়োজনীয় অপদ্রব্যকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল থেকে পৃথক করার প্রণালিকে ক্লিনিং বা পরিষ্কারকরণ বলা হয়। প্রধানত দুইটি কারণে কাঁচামাল পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন-

(১) কাঁচামালে অবস্থিত অপদ্রব্য অনেক সময় স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে থাকে। তাই এসব অপদ্রব্য দূর করতে ক্লিনিং করা হয়।
(২) কাঁচামালে উপস্থিত অণুজীব, রাসায়নিক দ্রব্য ও কীটনাশকের পরিমাণ কমাতে বা দূর করতে ক্লিনিং করা হয়।

কাঁচামাল ভালোভাবে পরিষ্কার করার পর এমনভাবে রাখতে হবে যেন তা পুনরায় অপদ্রব্য দ্বারা সহজে দূষিত হতে না পারে। পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অব্যশই পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত হতে হবে। তাছাড়া কাঁচামাল পরিষ্কার করার সময় খুব সতর্ক থাকতে হবে যেন তা আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। আঘাতপ্রাপ্ত হলে এগুলো সহজেই নষ্ট হয়ে যায়।

অপদ্রব্য : যে সমস্ত দ্রব্য কাঁচামালের সাথে মিশ্রিত থেকে এগুলোকে দূষিত করে তাদের অপদ্রব্য বলা হয়। একই জাতীয় পদার্থের ক্ষেত্রে অন্য যে কোনো পদার্থই সংশ্লিষ্ট পদার্থের অপদ্রব্য হিসেবে গণ্য হয়।

কাঁচামালে উপস্থিত অপদ্রব্য : খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত কাঁচামালে নিম্নলিখিত বস্তুসমূহ অপদ্রব্য হিসেবে থাকতে পারে -

(ক) খনিজ পদার্থ: যেমন- মাটি, বালি, কাঁকর, ধাতব পদার্থ, গ্রিজ, তেল।
(খ) উদ্ভিজ্জ পদার্থ : পাতা, খোসা, কাণ্ডের অংশ, খড়কুটা ইত্যাদি।
(গ) প্রাণিজ দ্রব্য : যেমন- প্রাণির লোম, মল, পতঙ্গের অংশবিশেষ, অণুজীব ইত্যাদি।
(ঘ) রাসায়নিক দ্রব্য : যেমন- সার, কীটনাশক, অণুজীব দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন পদার্থ ইত্যাদি।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানাগুলোতে অপদ্রব্য মুক্ত করতে অধিক তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় এবং যে সমস্ত কাঁচামাল অধিক ঝুঁকিপূর্ণ সেগুলোর ব্যাপারে বিশেষ নজর দিতে হয়। নিম্নবর্ণিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অপদ্রব্য দ্বারা দূষিত হওয়ার ঝুঁকি কমানো যায় :

১. কাঁচামাল কারখানায় সরবরাহের সময়।
২. কাঁচামাল কারখানায় মজুদকরণের সময়।
৩. কারখানার প্রক্রিয়াজাতকরণের স্থানে।
৪. প্রস্তুতকৃত খাদ্য মজুদকরণের সময়।
৫. পাইকারি বা খুচরা বিক্রেতা কর্তৃক মজুদকরণের সময়।

কাঁচামাল পরিষ্কার করার পদ্ধতি : কাঁচামাল প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা হয়ে থাকে-
(১) ড্রাই ক্লিনিং পদ্ধতি বা পরিষ্কারকরণের শুষ্ক পদ্ধতি।
(২) ওয়েট ক্লিনিং পদ্ধতি বা পরিষ্কারকরণের ভিজা পদ্ধতি।

১) ড্রাই ক্লিনিং পদ্ধতি

(ক) স্ক্রিনিং বা ছাঁকন : এই পদ্ধতিতে স্ক্রিন বা ছাঁকনির সাহায্যে কাঁচামাল হতে অপদ্রব্য দূর করা যায়। যেমন আটা থেকে গমের ভুসি দূর করতে চালনি ব্যবহার করা হয়। কাঁচামালের আকার অপদ্রব্য হতে ছোট বা বড় হলে তখন উভয় ক্ষেত্রেই স্ক্রিন ব্যবহার করে অপদ্রব্য দূর করা যায়।

(খ) অ্যাব্রাশন ক্লিনিং বা ঘষে অপদ্রব্য দূরকরণ : এই প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্যকে পরস্পরের সাথে ঘর্ষন করে বা খাদ্যদ্রব্য ও ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে পরস্পর ঘর্ষণ করে খাদ্যদ্রব্য পরিষ্কার করা যায়। এক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান ব্রাশ বা চাকা অথবা টাম্বলার-এর সাহায্যে পরিষ্কার করা হয়ে থাকে।

(গ) অ্যাসপিরেশন ক্লিনিং বা বাতাস শোষণ পদ্ধতি : এ ক্ষেত্রে বায়ু শোষণ প্রক্রিয়ায় ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করে কাঁচামাল হতে হালকা অপদ্রব্য, যেমন- ধুলাবালি, খকুটা ইত্যাদি পরিষ্কার করা হয়ে থাকে।

(ঘ) ম্যাগনেটিক ক্লিনিং বা চুম্বক দ্বারা অপদ্রব্য অপসারণ : এই প্রক্রিয়ায় চৌম্বক পদার্থসমূহকে অস্থায়ী চুম্বকের সাহায্যে অপসারণ করা হয়।

২) ওয়েট ক্লিনিং বা পরিষ্কারকরণের ভিজা পদ্ধতি

(ক) সোকিং বা ভিজিয়ে পরিষ্কারকরণ
(খ) স্প্রে ওয়াশিং বা ঝরণার সাহায্যে পরিষ্কারকরণ।

(ক) সোকিং বা ভিজিয়ে পরিষ্কারকরণ

অপদ্রব্য পরিষ্কার করার এটা একটা সাধারণ পদ্ধতি। এক্ষেত্রে ফলমূল, শাকসবজি, শস্য ইত্যাদি কৃষিজ পণ্য পানিতে ডুবিয়ে পরিষ্কার করা হয়। এ সমস্ত পণ্যে লেগে থাকা অপদ্রব্য যেমন- ধুলাবালি, কাদামাটি ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার হয়ে যায়। এ কাজের জন্য সাধারণত পাকা চৌবাচ্চা বা স্টিলের বড় বড় পাত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেক সময় অণুজীবের পরিমাণ কমাতে পানির সাথে ক্লোরিন যোগ করা হয়ে থাকে।

(খ) স্প্রে-ওয়াশিং

এটা একটা বহুল ব্যবহৃত ক্লিনিং প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় উপর থেকে পানি উচ্চবেগে ঝরনার মত কাঁচামালের উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা প্রধানত ব্যবহৃত পানির চাপ, পরিমাণ, তাপমাত্রা, কাঁচামাল থেকে ঝরনার দূরত্ব এবং সময়ের ওপর নির্ভরশীল। এই কাজে যন্ত্র হিসাবে স্প্রে-ড্রাম ওয়াসার এবং স্প্রে-বেল্ট ওয়াসার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

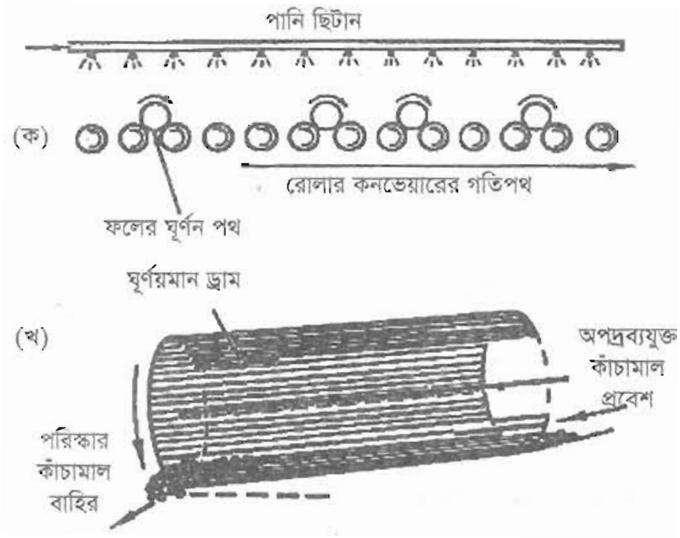

চিত্র : স্প্রে ওয়াসার (ক. স্প্রে-বেল্টওয়াসার খ. স্প্রে-ড্রাম ওয়াসার)

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ড্রাই ক্লিনিং পদ্ধতিতে কাঁচামাল পরিষ্কার করা হয়-

(ক) পানিতে ডুবিয়ে (খ) তেলে ডুবিয়ে
(গ) আগুনে পুড়িয়ে (ঘ) বায়ু শোষণ পদ্ধতিতে।

২. কাঁচামাল থেকে অণুজীবের পরিমাণ কমাতে পানির সাথে ব্যবহার করা হয়-

(ক) অক্সিজেন (খ) নাইট্রোজেন
(গ) ক্লোরিন (ঘ) কোনোটিই নয়।

৩. ভ্যাকুয়াম ক্লিনিং করা হয়-

(ক) বাতাস স্প্রে করে (খ) বাতাস গরম করে
(গ) বাতাস শোষণ করে (ঘ) বাতাস প্রবাহিত করে।

৪. অ্যাব্রাশন ক্লিনিং করা হয়ে থাকে-

(ক) চাকা (খ) ব্রাশ
(গ) টাম্বলার (ঘ) উপরের সব কটির সাহায্যে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কাঁচামাল বলতে কী বোঝ?
২. কী কী বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কাঁচামালের ভৌত অবস্থা নির্ণয় করা হয়?
৩. কাঁচামাল পরিষ্কারকরণের প্রয়োজনীয়তা কী?
৪. কাঁচামাল পরিষ্কারকরণের সংজ্ঞা লিখ।
৫. কাঁচামালে উপস্থিত বিভিন্ন অপদ্রব্যের নাম লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কাঁচামাল বলতে কী বোঝ? বিভিন্ন ধরনের কাঁচামালের ভৌত অবস্থার বর্ণনা দাও।
২. বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল এবং তাদের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের নাম লিখ।
৩. কাঁচামাল সংগ্রহের পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪. কাঁচামাল পরিষ্কার করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কাঁচামালের গ্রেডিং, সর্টিং, স্পেসিফিকেশন

২.১ কাঁচামাল সর্টিং বা বাছাইকরণ
কাঁচামালের আকার, আকৃতি, ওজন এবং রঙের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শ্রেণিতে পৃথক করার পদ্ধতিকে সর্টিং বলা হয়।

২.২ কাঁচামাল সর্টিং বা বাছাইকরণের পদ্ধতি
১. হাতে বাছাই বা মেনুয়্যাল পদ্ধতি
২. যান্ত্রিক পদ্ধতি

২.৩ সর্টিং বা বাছাইকরণের প্রয়োজনীয়তা
সুষ্ঠুভাবে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সর্টিং বা বাছাইকরণ একটি প্রয়োজনীয় ধাপ। কাঁচামাল সাধারণত নিম্নলিখিত প্রয়োজনে বাছাই করা হয়ে থাকে :

১. খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করার সময় বিভিন্ন পর্যায় যেমন- খোসা ছাড়ানো, ব্লানচিং, পিটিং ও বহন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সর্টিং করা হয়।
২. সকল বস্তুতে সমভাবে তাপ প্রবাহের সুবিধার জন্য বাছাই করা হয়।
৩. আদর্শ কনটেইনারে বা কৌটায় ভর্তির ক্ষেত্রে ওজন নিয়ন্ত্রণের সুবিধার জন্য বাছাই করা হয়।
৪. ক্রেতা সাধারণকে আকৃষ্ট করতে এবং তাদের ক্রয় সুবিধার জন্য বাছাই করা হয়।

২.৪ কাঁচামাল সর্টিং বা বাছাইকরণের হাতবাছাই পদ্ধতি
মেনুয়্যাল পদ্ধতি সাধারণত অভিজ্ঞ লোক দিয়ে করা হয়। এক্ষেত্রে আকার, আকৃতি, বর্ণ, গন্ধ, গঠন ও প্রস্তুতকৃত খাদ্য ইত্যাদি বিষয় নির্ণয়ের মাধ্যমে বাছাই করা হয়। বিভিন্ন ফলমূল প্যাকেজিং-এর মাধ্যমে পরিবহনের জন্য নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতি বজায় রেখে কাঁচামাল বাছাই করা হয়। শাকসবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রথমত বর্ণ দেখে বাছাই করতে হয়, বর্ণ দেখে না বোঝা গেলে গন্ধ দেখে বাছাই করতে হয়। প্রস্তুতকৃত খাদ্যের গুণাগুণ কাঁচামালের ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল যেমন- পেয়ারার জেলি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আধা পাকা পেয়ারা বাছাই করতে হয়, তা না হলে ভালো মানের জেলি পাওয়া যায় না।

২.৫ কাঁচামাল সর্টিং বা বাছাইকরণের যান্ত্রিক পদ্ধতি
সঠিকভাবে অল্প সময়ের মধ্যে কাঁচামাল বাছাইকরণের জন্য সাধারণত যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নিচে কাঁচামাল বাছাইকরণের বিভিন্ন যান্ত্রিক পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো :

১. ওজনভিত্তিক বা ওয়েট সর্টিং (Weight Sorting)
২. সাইজ সর্টিং (Size Sorting)
ক. স্থির ছিদ্রযুক্ত স্ক্রিন (Fixed Aperture Screens)
খ. ফ্লাট বেড স্ক্রিন (Flat-bed Screens)
গ. ড্রাম স্ক্রিন (Drum Screens)
(১) কনসেনট্রিক ড্রাম স্ক্রিন (Concentric Drum Screens)
(২) সিরিজ টাইপ কনজিকিউটিভ ড্রাম স্ক্রিন (Consecutive Drum Screens)
(৩) প্যারালাল টাইপ বা সমান্তরাল ড্রাম স্ক্রিন (Parallel Drum Screens)

৩. আকৃতির ভিত্তিতে সর্টিং (Shape Sorting)

৪. ফটোমেট্রিক সর্টিং (Photometric Sorting)
ক. দৃশ্যমান কালার সর্টিং (Visual Colour Sorting)
খ. যান্ত্রিক কালার সর্টিং (Mechanical Colour Sorting)

৫. প্লাবতা বা ঘনত্ব সর্টিং (Buoyancy or Density Sorting)

২.৬ কাঁচামাল সর্টিং বা বাছাইকরণের যান্ত্রিক পদ্ধতির বর্ণনা

১. **ওজনভিত্তিক বা ওয়েট সর্টিং :** এক্ষেত্রে কাঁচামালকে ওজনের ভিত্তিতে বাছাই করা হয়। এ কাজের জন্য নিক্তি ব্যবহার করা হয়। ডিম, ফলমূল ও শাকসবজি এ পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়।

২. **সাইজ সর্টিং :** এক্ষেত্রে কাঁচামালকে তার আকারের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। এই বাছাইয়ের কাজে সাধারণত নির্দিষ্ট ছিদ্রযুক্ত স্ক্রিন ব্যবহার করা হয়। স্ক্রিন ধাতব বা সিনথেটিক দিয়ে ফাইবার নির্মিত হতে পারে। নিচে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো :

ক. কনসেনট্রিক ড্রাম স্ক্রিন

এ ক্ষেত্রে ছিদ্রযুক্ত ড্রামগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে যে সবচেয়ে বড় ছিদ্রযুক্ত ড্রামটি ভেতরে, তার চেয়ে ছোট ছিদ্রযুক্ত ড্রামটি বাইরে এবং সবচেয়ে ছোট ছিদ্রযুক্ত ড্রামটি সবচেয়ে বাইরের দিকে থাকে (চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে)। বাছাই করার সময় যখন কাঁচামালকে সবচেয়ে ভিতরের ড্রামে প্রবেশ করানো হয় তখন আকারে সবচেয়ে বড় বস্তুগুলো এর ভিতরে থাকে এবং গড়িয়ে সবচেয়ে দূরে পড়ে। তার চেয়ে ছোটগুলো মধ্যবর্তী ড্রামে যায় এবং সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ে। এমনিভাবে সবচেয়ে ছোটগুলো বাইরের ড্রামের ছিদ্র দিয়ে নিচে পড়ে। এভাবেই কাঁচামাল বিভিন্ন সাইজে পৃথক করা হয়।

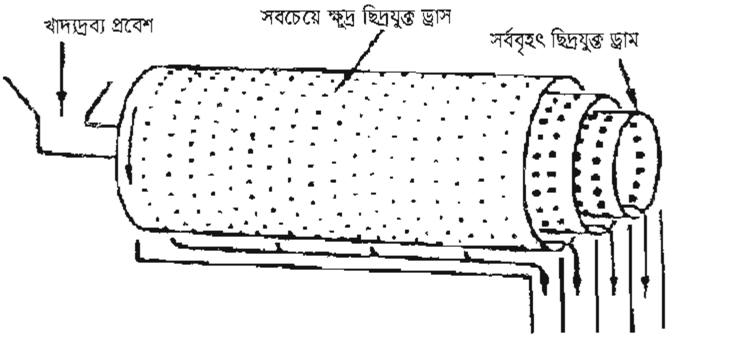

চিত্র : কনসেনট্রিক ড্রাম স্ক্রিন

খ. সিরিজ টাইপ কনজিকিউটিভ ড্রাম স্ক্রিন

এক্ষেত্রে সবচেয়ে ছোট ছিদ্রযুক্ত ড্রামটি প্রথমে এবং তার চেয়ে বড় ছিদ্রযুক্ত ড্রামটি তারপর এবং সবচেয়ে বড় ছিদ্রযুক্ত ড্রামটি সবচেয়ে দূরে পর পর গায়ে লাগানো থাকে। কাঁচামাল সবচেয়ে ছোট ছিদ্রযুক্ত ড্রামে প্রবেশ করালে ক্ষুদ্রতমগুলো এর ছিদ্র দিয়ে নিচে পড়ে। এমনিভাবে পর পর সাজানো ড্রামের ভিতর দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সাইজের কাঁচামাল বের হয় এবং সবচেয়ে বড়গুলো শেষের ড্রামের উপর দিয়ে দূরে পড়ে। এভাবে বিভিন্ন সাইজের কাঁচামালগুলো পৃথক করা হয়।

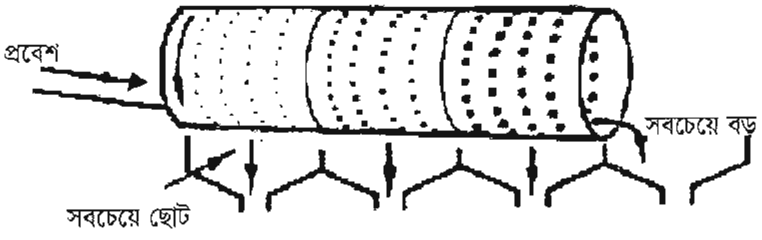

চিত্র : সিরিজ টাইপ কনজিকিউটিভ ড্রাম স্ক্রিন

গ. প্যারালাল টাইপ বা সমান্তরাল ড্রাম স্ক্রিন

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ছিদ্রযুক্ত ড্রাম উপরে, তার চেয়ে ছোটটি তার নিচে এবং এমনিভাবে সবচেয়ে ছোট ছিদ্রের ড্রামটি সবচেয়ে নিচে সাজানো থাকে। কাঁচামাল উপরের ড্রামে প্রবেশ করালে চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনিভাবে বিভিন্ন সাইজে পৃথক হয়ে যায়।

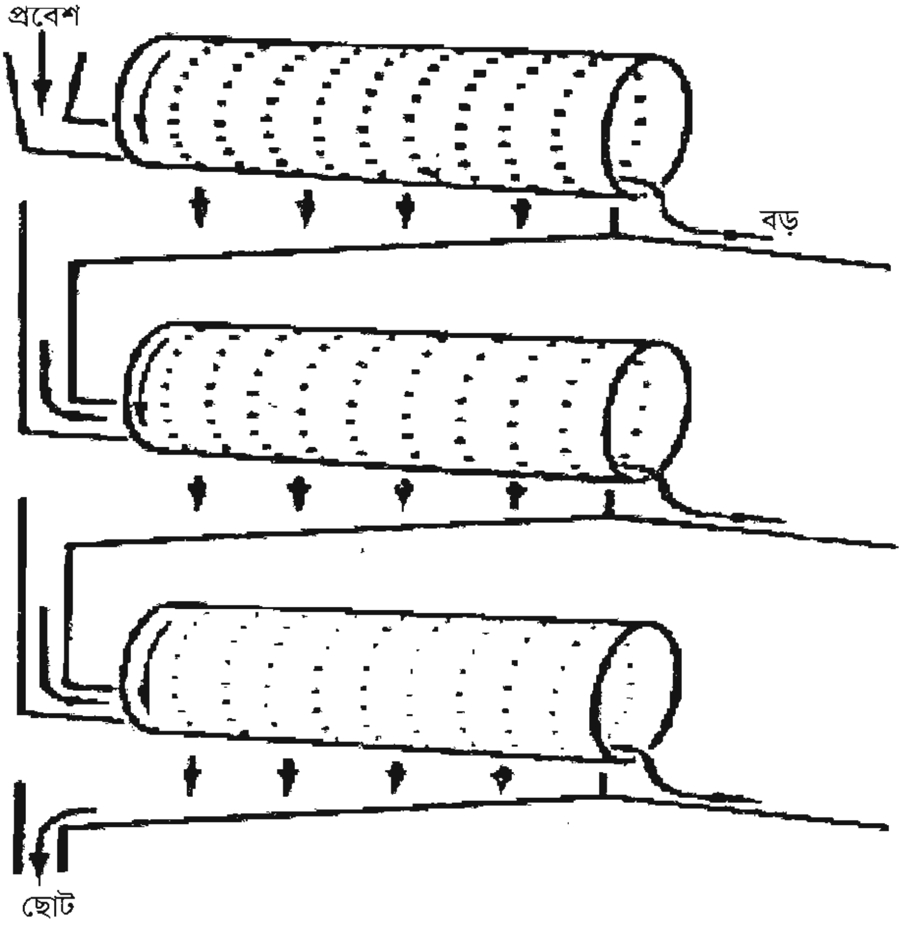

চিত্র : সমান্তরাল ড্রাম স্ক্রিন

৩. **আকৃতির ভিত্তিতে সর্টিং (Shape Sorting) :** কিছু কিছু কাঁচামাল আছে যেগুলো আকার বা ওজন ভিত্তিতে সর্টিং-এর সময় মিশে থাকা অপদ্রব্য পৃথক করা যায় না। যেমন- গম বীজের সাথে আগাছার বীজ মিশ্রিত থাকলে তার আকার ও ওজন একই হলে আগাছার বীজ এভাবে পৃথক করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে আকৃতির ভিত্তিতে সর্টিং করতে হয়। কারণ এই পদ্ধতিতে কাঁচামালের দৈর্ঘ্য ও ব্যাসের সমন্বয় করে সর্টিং করা হয়। যেমন- ডিস্ক সর্টার, সিলিন্ডার সর্টার ইত্যাদি।

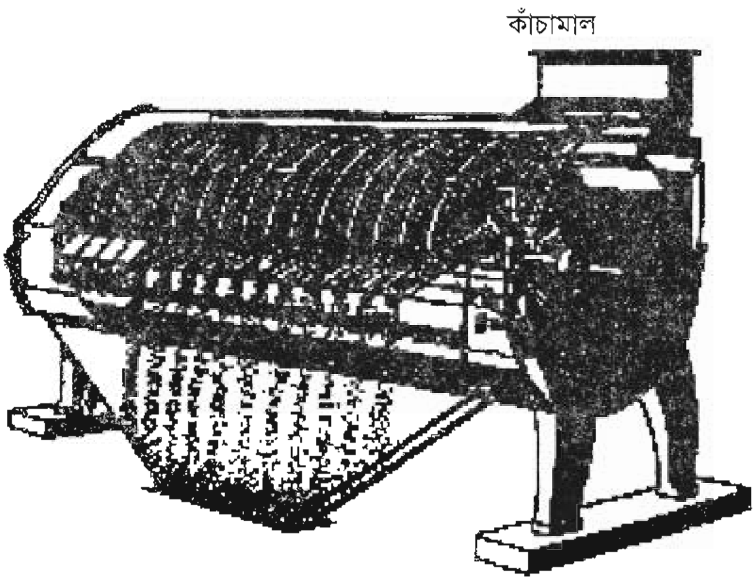

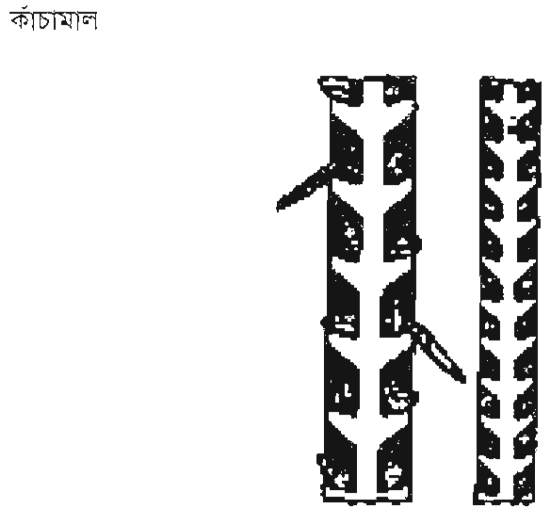

চিত্র : ডিস্ক সর্টার ও এর বিভিন্ন অংশ

কাঁচামাল সর্টিং বা বাছাইকরণে যান্ত্রিক কালার সর্টিং (Mechanical Colour Sorting)

এ প্রক্রিয়ায় কোনো নির্দিষ্ট রঙের ফলকে রংবিহীন ফল থেকে পৃথক করা হয়। এ কাজে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে যান্ত্রিক কালার সর্টার (Mechanical Colour Sorter) বলে।

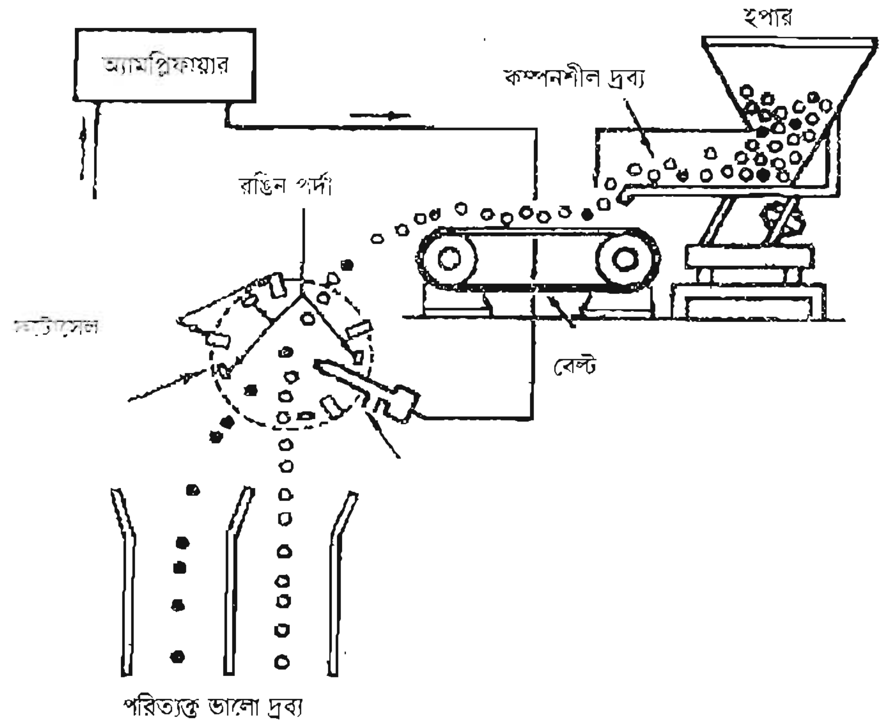

চিত্র : যান্ত্রিক কালার সর্টিং

বর্ণনা : হপার (Hopper) হতে যখন কোনো রঙিন গোলাকার দ্রব্য যেমন- ফল বা নাট, চলন্ত ফিতার ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসে এবং ফটোসেলের কাছে দিয়ে যায় তখন রঙিন বস্তুটি থেকে যে আলোকরশ্মি বের হয় তার জন্য ফটোসেলটি কার্যকরী হয় এবং তা থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ অ্যামপ্লিফায়ার-এর মাধ্যমে বর্ধিত হয়ে কমপ্রেসড এয়ার নজলের রেগুলেটরকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে নজলের মুখ খুলে যায় এবং বাতাস জেট আকারে বের হয়ে আসার কারণে রঙিন ফলের উপর চাপ পড়ে। এই চাপ প্রয়োগের ফলে রঙিন ফলটি একটু দূরে সরে যায় এবং একটা বাক্সে জমা হয়। আর যে সমস্ত ফল রঙিন নয় সেগুলো সরাসরি আর একটা বাক্সে জমা হয়। এভাবে রঙিন নয় এমন ফলের মিশ্রণ থেকে রঙিন ফল যান্ত্রিক কালার সর্টিং প্রক্রিয়ায় পৃথক করা যায়।

২.৭ কাঁচামাল গ্রেডিং বা শ্রেণিবিন্যাশকরণ

খাদ্যদ্রব্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য যেমন- কাঁচা, পাকা, নরম, শক্ত ইত্যাদি ধর্মের ওপর ভিত্তি করে কাঁচামালকে বিভিন্ন ভাগে পৃথক করার প্রণালিকে গ্রেডিং বা শ্রেণিবিন্যাশকরণ বলে।

গ্রেডিং-এর গুরুত্ব :

গ্রেডিং প্রধানত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে :

(১) সুষ্ঠুভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণের সুবিধার জন্য ।
(২) ক্রেতাসাধারণের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তার জন্য ।
(৩) ক্রেতাসাধারণের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য ।
(৪) খাদ্যনীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ।

গ্রেডিং-এর বৈশিষ্ট্য

কাঁচামাল প্রধানত নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে গ্রেডিং করা হয়ে থাকে :

১. আকার-আকৃতি (Shape and size) : ফলমূল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের সুবিধা এবং ক্রেতা সাধারণের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ।
২. পরিপক্বতা (Maturity) : ডিমের টাটকা অবস্থা, ফল পরিপক্বতার পর্যায় ।
৩. গঠন (Texture) : পাউরুটির ভিতরের গঠনগত বৈশিষ্ট্য, বিস্কুটের মচমচেভাব, ক্রিমের গাঢ়ত্ব ইত্যাদি ।
৪. স্বাদ ও গন্ধ (Flavour and Aroma) : জিহ্বা ও নাকের সাহায্যে গ্রহণযোগ্য টক, ঝাল, মিষ্টি ও লবণাক্ত স্বাদের অনুভূতি ।
৫. কাজ (Function) : কাঁচামাল ব্যবহারের উপযোগিতা, যেমন- ফলমূল ও শাকসবজি টিনজাতকরণ বা হিমায়িতকরণের বৈশিষ্ট্য, ময়দা কীভাবে কেক হবে এরূপ ধর্ম ইত্যাদি ।
৬. ত্রুটিহীন বা দোষমুক্ত অবস্থা (Freedom from blemish) : ডিমের কুসুম ঘোলাটে হওয়া, রক্তের দাগ থাকা বা খোসা ফাটা থাকা, ফলের গায়ে আঘাতের চিহ্ন থাকা, ডাবের গায়ে ছিদ্র থাকা ইত্যাদি ।
৭. রং (Colour) : প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রভাবান্বিত করা এবং ক্রেতাগণের গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয় করা ।
৮. অপদ্রব্য মুক্ত থাকা (Freedom from Contaminates) : ময়দার মধ্যে প্রাণীর লোম এবং কীটপতঙ্গের অঙ্গপ্রতঙ্গ, ফলের উপর ধুলাবালি কীটনাশক দ্রব্য, মাংসের মধ্যে জীবাণু এবং উপজাত দ্রব্য ইত্যাদি ।
৯. কাঁচামালের স্ট্যান্ডার্ড ও আইনের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিতকরণ ।

২.৮ ফলের পরিচিতি

ফল একটি সুস্বাদু খাবার । এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ থাকে, যা আমাদের শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় । প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় অবশ্যই ফল থাকতে হবে । এগুলো খাদ্যের পরিমাণ ও গুণগতমান বাড়ায় এবং ভিটামিন ও খনিজের অভাবজনিত রোগ থেকে শরীরকে রক্ষা করে । কাজেই ফলের উৎপাদন, প্রাপ্যতা এবং সংরক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।

আমাদের দেশে আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, আনারস, পেয়ারা, লিচু, কুল, লেবু, নারিকেল, বাতাবি লেবু, আমড়া, বেল, তাল, জলপাই, কামরাঙ্গা, জাম, আমলকি, চালতা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে । এছাড়াও বর্তমানে স্ট্রবেরি, কমলা, মাল্টা প্রভৃতি ফলের চাষও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে । যেহেতু ফল অতি

মাত্রায় পচনশীল এবং ঋতুভিত্তিক তাই আমাদের উচিত ফলের সুষ্ঠু বিতরণ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যাবস্থা গড়ে তোলা। এতে করে শুধু যে আমাদেরই প্রয়োজন মিটবে তাই নয় বরং উদ্বৃত্ত ফল রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

কিছু বিদেশি ফল : আপেল, আঙ্গুর, খেজুর, মালটা, কমলা, নাসপাতি ইত্যাদি।

২.৯ ফলের প্রকারভেদ

নিচে ছকের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম ফলের প্রকারভেদ দেখানো হলো :

ক. বেরি বা রসালো ফল

১. কালোজাম
২. লোগান বেরি
৩. রাসবেরি
৪. ব্লুবেরি
৫. ক্রানবেরি
৬. গুজবেরি
৭. স্ট্রবেরি

খ. সাইট্রাস ফল

১. কমলা
২. বাতাবি লেবু
৩. কাগজি লেবু
৪. ট্যাঙ্গারিন
৫. মাল্টা
৬. ম্যানডারিন

গ. ড্রুপস

১. এপ্রিকট
২. চেরি
৩. পিচ
৪. কুল
৫. আঙ্গুর
৬. টমেটো

ঘ. গ্রীষ্মকালীন ফল

১. আম
২. কাঁঠাল
৩. কলা
৪. আনারস
৫. সফেদা
৬. খেজুর
৭. তরমুজ
৮. পেঁপে
৯. পেয়ারা
১০. বেল

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও

১. নিচের কোনটি কাঁচামাল বাছাইকরণের ম্যানুয়াল পদ্ধতি?
ক. ওয়েট সর্টিং
খ. সাইজ সর্টিং
গ. প্লাবতা সর্টিং
ঘ. কোনোটি নয়

২. নিচের কোনটি কাঁচামাল বাছাইকরণের যান্ত্রিক পদ্ধতি?
ক. আকৃতির ভিত্তিতে সর্টিং
খ. ফটোমেট্রিক সর্টিং
গ. উপরের উভয়টি
ঘ. কোনোটি নয়

৩. কাঁচামাল গ্রেডিং-এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
ক. সুষ্ঠু প্রক্রিয়াজাতকরণ
খ. ক্রেতার স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা
গ. ক্রেতার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি
ঘ. উপরের সব কটি

৪. নিচের কোনটি রসালো ফল?
ক. কালো জাম
খ. স্ট্রবেরি
গ. উপরের উভয়টি
ঘ. কোনোটি নয়

৫. নিচের কোনটি সাইট্রাস ফল?
ক. কমলা
খ. বাতাবি লেবু
গ. কাগজি লেবু
ঘ. উপরের সব কটি

৬. নিচের কোনটি গ্রীষ্মকালীন ফল?

ক. আম
খ. কাঁঠাল
গ. আনারস
ঘ. উপরের সব কটি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সর্টিং বা বাছাইকরণ বলতে কী বোঝায়?
২. কাঁচামাল সর্টিং বা বাছাইকরণের প্রয়োজনীয়তা কী?
৩. কাঁচামাল সর্টিং বা বাছাইকরণের ম্যানুয়াল পদ্ধতি বর্ণনা দাও।
৪. কাঁচামাল বাছাইকরণের বিভিন্ন যান্ত্রিক পদ্ধতির নাম লিখ?
৫. কাঁচামাল গ্রেডিং-এর উদ্দেশ্য কী?
৬. ফলের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সর্টিং বলতে কী বোঝায়? সর্টিং করার সমান্তরাল ড্রাম স্ক্রিন পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
২. কাঁচামাল সর্টিং বা বাছাইকরণে যান্ত্রিক কালার সর্টিং পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
৩. গ্রেডিং কাকে বলে? কী কী বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে কাঁচামাল গ্রেডিং করা হয় উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়
দানাদার শস্য

৩.১ দানাদার শস্য (Food Grain)

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রচুর পরিমাণে দানাদার শস্য উৎপন্ন হয় এবং অঞ্চলভেদে কোনো না কোনো দানাদার শস্য সেই অঞ্চলের মানুষের প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা, যব, জোয়ার, চিনা ও কাউন বাংলাদেশে আবাদ হয়। ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য ফসল। এদেশে দানা ফসল হিসেবে ধানের পর গম ও ভুট্টার স্থান।

৩.২ দানাদার শস্যের বৈশিষ্ট্য

একটি শস্যের রাসায়নিক সংযুক্তি নির্ভর করে শস্যটির জাত, ভৌগোলিক ও আবহাওয়াগত অবস্থা এবং অন্যান্য নিয়ামকের উপর। সাধারণত শস্য ভালোভাবে পাকলে এবং ঠিকমতো শুকানো হলে তার জলীয় অংশের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০-১৪%। মাঠে থাকাকালীন শস্যের জলীয় অংশ যদি এর চেয়ে বেশি হয় তবে শস্যকে অবশ্যই শুকাতে হবে যাতে জলীয় অংশ ১২% এর নিচে নেমে আসে। তা না হলে শস্য মোল্ড দ্বারা আক্রান্ত হবে ও পচতে থাকবে। বেশি জলীয় অংশ বহনকারী দানাশস্যে অনেক সময় এমন কিছু মোল্ড জন্মায় যেগুলো টক্সিন উৎপন্ন করে এবং এ ধরনের শস্য বা শস্যজাত খাদ্য মানুষ বা অন্য প্রাণীর পেটে প্রবেশ করলে তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

দানাশস্য প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কার্বোহাইড্রেট বহন করে যা অধিকাংশ সহজপাচ্য শর্করা ও চিনিরূপে বিদ্যমান থাকে। দানাশস্য যখন মেশিনে ভাঙানো হয় তখন এগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে অপাচ্য আঁশ ও চর্বি দূরীভূত হয়।

কয়েকটি দানাশস্যের রাসায়নিক উপাদান :

শস্য	জলীয় অংশ	কার্বোহাইড্রেট	প্রোটিন	চর্বি	অপাচ্য আঁশ	কিলোক্যালরি (প্রতি ১০০ গ্রাম)
চাল	১১	৬৫	৮	২	৯	৩১০
গম	১১	৬৯	১৩	২	৩	৩৪০
ভুট্টা	১১	৭২	১০	৪	২	৩৫২
বার্লি	১৪	৬৩	১২	২	৬	৩২০
কাউন	১৩	৫৮	১০	৫	১০	৩১৭

৩.৩ ধান (Rice)

ধানের উৎপত্তিস্থল মূলত এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল। বর্তমানে সারা পৃথিবীতেই চালের ব্যবহার ব্যাপক। মানবজাতির অর্ধেকের বেশি প্রধান খাদ্য হিসেবে চালের ওপর নির্ভর করে।

ধান প্রধানত উষ্ণ আবহওয়া, আর্দ্র মাটি এবং সব সময় পানি জমে থাকে এমন মাটিতে সবচেয়ে ভালো জন্মে। সারা দুনিয়ায় যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয় তার প্রায় ৯০% জন্মে চীন, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, জাপান, থাইল্যান্ড, ইন্দোচীন, বার্মা এবং ফিলিপাইনে। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, ইতালি, মিশর এবং ব্রাজিলেও প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হয়। উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় পানি সেচের ব্যবস্থা, উন্নত জাতের বীজ, সময় ও পরিমাণমতো সার প্রয়োগ সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে চালের উৎপাদন বর্তমানে বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

ধান পাকার পরে তাতে জলীয় কণার পরিমাণ থাকে প্রায় ২৪%। সাধারণত এই অবস্থায় ধান সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু ২০-২৪% জলীয় কণাসহ ধান বা চাল সংরক্ষণ করা যায় না। কাজেই একে রোদে বা কৃত্রিম উপায়ে ড্রায়ারের মাধ্যমে শুকিয়ে এর জলীয় কণার পরিমাণ কমিয়ে ১২-১৩% ভাগে আনতে হয়। এজন্য বিরতিসহ ৩-৪ বার শুকাবার প্রয়োজন পড়ে। এ অবস্থায় ধান বা চাল নিরাপদে সংরক্ষণ করা যায়।

ধানের মরফোলজি এবং হিসটোলজি

ধনের উপরিভাগে একটি রক্ষাকারী আবরণ থাকে। একে বলা হয় পেরিকার্প (Pericarp)। এর কাজ হলো চালের এন্ডোস্পার্মকে রক্ষা করা। পেরিকার্প বা আবরণ প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত। একটিকে বলা হয় পেলেয়া (Palea) এবং অপরটিকে বলা হয় লেম্না (Lemna)। সাধারণত পেলেয়ার তুলনায় লেম্না আকারে একটু বড় হয়। ধানের রং সোনালি হওয়ার কারণ পেরিকার্প।

ধানের পেরিকার্প প্রধানত বাইরের এপিকার্প, মেসোকার্প এবং এন্ডোকার্প সমম্বয়ে গঠিত। এই স্তরগুলোকে আঁশালো এবং মিলিং করার সময় সবগুলো অপসারিত হয়।

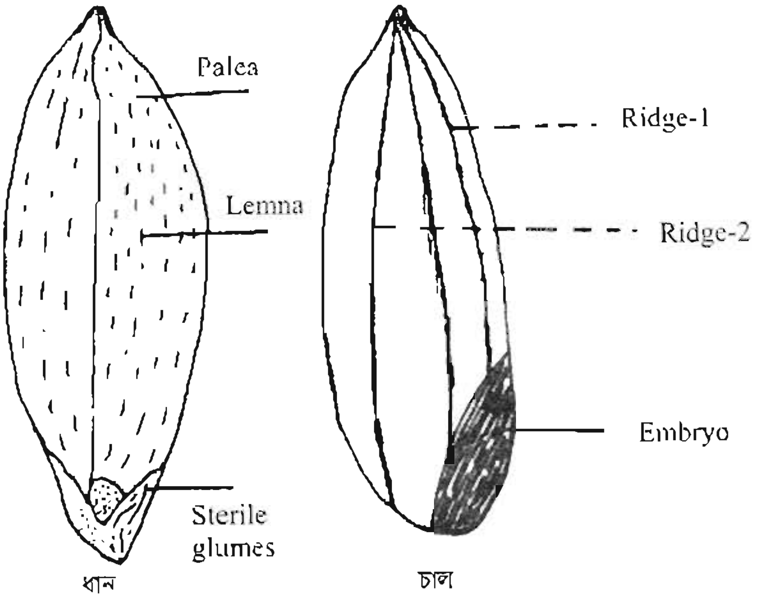

চিত্র : ধানের মরফোলজি

এপিকার্প সাধারণত তির্যকভাবে অবস্থানরত লম্বা আকৃতির কোষ দ্বারা গঠিত। এ সমস্ত কোষের কোষপ্রাচীর থাকে ঢেউ খেলানো। এই স্তরসমূহ চালের দানাকে প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করে।

পেরিকার্প-এর নিচেই থাকে এলিউরন (eleurone) বা কুড়াল স্তর। এই স্তর একস্তর কোষ দ্বারা গঠিত। তবে পৃষ্ঠদেশে দুইস্তর কোষ থাকে। এই স্তর প্রোটিন সমৃদ্ধ।

এলিউরন স্তরের নিচেই থাকে এন্ডোস্পার্ম স্তর। এই স্তরে তিন ধরনের কোষ থাকে। যেমন–

১. প্লেটের মতো প্রশস্ত কোষ,
২. লম্বা টিউবের মতো কোষ এবং
৩. খাট টিউবের মতো কোষ।

এ সমস্ত কোষের মধ্যে টিউবের মতো কোষ থাকে মাঝখানে বা মধ্যভাগে, লম্বা টিউবের মতো কোষ থাকে পিঠের দিকে ও পেটের দিকে এবং প্লেটের মতো কোষ থাকে পার্শ্বদিকে।

চালের ভ্রূণ থেকে প্রক্সিমাল এন্ড বা শেষ প্রান্তে এবং তা স্কুটেলাম স্তর দ্বারা এন্ডোস্পার্ম থেকে পৃথক অবস্থায় থাকে। চালের এই অংশ থাকে প্রোটিন এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ।

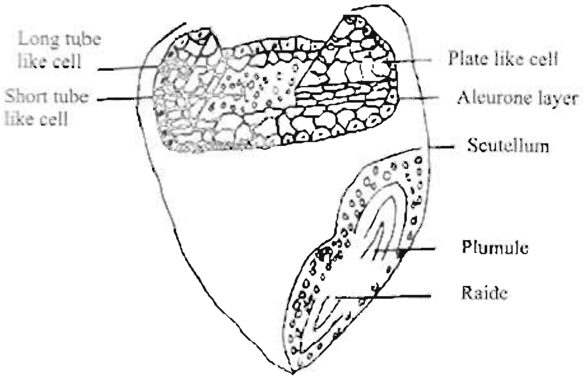

চিত্র : ধানের হিস্টোলজি

চালের রাসায়নিক গঠন

চালে উপস্থিত বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের শুকনো পদার্থভিত্তিক আসন্নমান (Dry matter based Proximate Value) নিচে দেখানো হলো-

উপাদান	ঢেঁকিতে ভাঙ্গানো চাল	মিলে ভাঙ্গানো চাল	তুষ
প্রোটিন	৮%, তবে ৬.৫-১৬% পর্যন্ত হতে পারে	৭.৬%	১৫.৫%
ফ্যাট	২%, তবে ১.৭-৩.৫% পর্যন্ত হতে পারে	০.৫%	২০.০%
আঁশ	১.২%, তবে ০.২-২.৬% পর্যন্ত হতে পারে	০.২%	১২.৫%
ছাই	১.২%	০.৫%	১২%
নাইট্রোজেন মুক্ত নির্যাস	৭৭.২%	৯১.৫%	৪৬.৬%

ভিটামিন (mg/gm)	কুঁড়াসহ চাল	মিলে ভাঙ্গানো চাল	কুঁড়াসহ তুষ
বি$_১$	২.৫	০.৩৫	২.৮
বি$_২$	০.৫৭	০.৩৩	৪.০
নিয়াসিন	৫১	১৩.৭	৪০.৮
পাইরিডক্সিন	১.৬	১.২	৩২.১
প্যানটোথিয়াসিক অ্যাসিড	৬.৬	৩.৮	৭১.৩
বায়োটিন	০.০৭	০.০২৫	০.৪৭
ইনোসিটল	১২২০	-	২৯৭০
কোলিন	১০৮০	৭১২	১২৮০

খনিজ লবণ (mg/gm)	কুঁড়াসহ চাল	মিলে ভাঙানো চাল
ক্যালসিয়াম	১৫	৪-৬
ফসফরাস	৩০০	৯০-১২০
আয়রন	৩-৩.৫	০.৫-০.২৫

অন্যান্য দানাদার শস্যের তুলনায় চালে প্রোটিনের পরিমাণ কম থাকে। চালে ক্যালসিয়াম-এর পরিমাণও কম থাকে। চালে যে ফসফরাস থাকে তার প্রায় ৭০% থাকে ফাইটিক অ্যাসিড হিসেবে। ফলে তা পুষ্টি উপাদান হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয় না। এই উপাদানসমূহ শস্যদানায় সর্বত্র ছিটিয়ে থাকে এবং তা সমভাবে বিন্যস্ত থাকে না।

রাসায়নিক উপাদানে প্রাপ্ত আসন্ন মান থেকে এটা দেখা যায় যে চালে উপস্থিত ফ্যাট, আঁশ এবং খনিজ লবণ শস্যদানার বহির্ভাগে অর্থাৎ কুঁড়ার স্তরে থাকে। অপরদিকে কার্বোহাইড্রেট বা নাইট্রোজেন মুক্ত নির্যাস- এর বেশির ভাগ থাকে এন্ডোস্পার্ম বা অভ্যন্তরভাগে। নিকোটিনিক অ্যাসিড, ভিটামিন বি$_১$ এবং বি$_২$ থাকে প্রধানত কুঁড়ার স্তরে।

চালে উপস্থিত স্টার্চ বা শ্বেতসার প্রধানত অ্যামাইলোজ ও অ্যামাইলো পেকটিন দ্বারা গঠিত। গ্লুকোজ অণু দ্বারা গঠিত সরল চেইনের মতো বহু অণুকে অ্যামাইলোজ এবং শাখা-প্রশাখার মতো গঠিত বহু অণুকে অ্যামাইলো পেকটিন বলে।

ফ্যাট

চালে সাধারণত ২.৫-৩% ফ্যাট থাকে। এর বেশিরভাগই থাকে কুঁড়ার স্তর এবং ভ্রূণে। এ থেকে সহজেই কুঁড়ার তেল বা (Bran Oil) নিষ্কাশন করা যায় এবং শোধনের পর খাবার তেল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এটি একটি উন্নতমানের ভোজ্যতেল। নিম্নলিখিত উপাদান থাকার কারণে এই তেলের উপযোগিতা এবং পুষ্টিমান উল্লেখযোগ্য।

উপাদানসমূহ

১. অসাবানীয় বস্তু (Unsaponified matter) বা যে সমস্ত বস্তুকে সাবানে পরিণত করা যায় না এমন বস্তুর পরিমাণ ৩-৫%।

২. মোম (Wax) এর পরিমাণ ৩-৬%।

৩. ফসফোলিপিড, যেমন- লেসিথিন, লাইসো-লেসিথিন এবং লাইপো প্রোটিন। এগুলো মেটাবলিজম বা বিপাকীয় কার্যসাধনে সাহায্য করে।

৪. নিউট্রাল লিপিড যেমন মনো, ডাই ও ট্রাইগ্লিসারাইড; এগুলো বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান। এতে প্রচুর পরিমাণ অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড থাকার কারণে এর পুষ্টিমান উল্লেখযোগ্য। এর পরিমাণ থাকে ৮০-৯০%।

৫. এতে অরাইজিনল (Orizinol) ও টকোফেরল থাকে যা এন্টি-অক্সিজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এর পরিমাণ ১-২%।

খনিজ উপাদান

চালে প্রধানত নিম্নলিখিত খনিজ উপাদানসমূহ থাকে–

খনিজ উপাদান (mg/100g)	কুঁড়াসহ চাল	মিলে ভাঙানো চাল	কুঁড়াসহ তুষ
অ্যালুমিনিয়াম (Al)	৩০	০.০৭	৫-৪০
ক্যালসিয়াম (Ca)	১০-১৮	৪-৬	৫৭-৭৮
ক্লোরিন (Cl)	-	২০-৩৮	১-৯৭
আয়রন (Fe)	৩-৩৪	০.৫-২০.৭	১৪-৩২
ম্যাগনেসিয়াম (Mg)	৪৭-১২০	২৩-৩৭	৯৮০-১২৩০
ফসফরাস (P)	১০৪-৩১৫	৮৮-১১৯	২৪৭৬-২৬৬৮
ফাইটো ফসফরাস (Phyto phosphorus)	২২০	৩৫-৫৫	২২৩১-২৬৩৭
পটাশিয়াম (K)	২৩৮	৬৮-১০১	১৭৭০-২২৭০
সিলিকন (Si)	৩২-২১২	১৮-১১	১২০০-১৬৩০
সোডিয়াম (Na)	২০	৭.২	৩৫-৪৬

চালে সোডিয়ামের পরিমাণ কম এবং পটাসিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে উচ্চ রক্তচাপ সম্পন্ন রোগীর ক্ষেত্রে চাল বা চালজাত খাদ্যদ্রব্য নিশ্চিন্তে ব্যবহার করা যায়।

ভিটামিন

চালে ভিটামিন এ, সি এবং ই-এর অভাব রয়েছে। আবার মিলে ভাঙানো চালে রিবোফ্লাভিন এবং থায়ামিন এর অভাব ঘটে।

চালে বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদানের অবস্থানভিত্তিক বণ্টন

চালে উপস্থিত উপাদানসমূহ দানার সর্বত্র সমভাবে বিরাজ করে না। বরং কোনো কোনো উপাদান চালের উপরিভাগে বেশি, কোনোটি আবার মধ্যভাগে বেশি এবং কোনো কোনোটি অভ্যন্তরভাগে বেশি অবস্থান করে।

উপাদানসমূহ এবং তাদের অবস্থান

প্রোটিন

১. চালের উপরিভাগে প্রোটিনের অবস্থান খুব কম থাকে।
২. মধ্যভাগ থেকে উপরিস্তর পর্যন্ত প্রোটিনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি।
৩. কেন্দ্রে প্রোটিনের পরিমাণ থাকে সবচেয়ে কম।

ফ্যাট

১. উপরিস্তরে ফ্যাটের পরিমাণ থাকে সবচেয়ে কম।
২. ফ্যাটের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে অঙ্কুর বা জার্মে।

৩. কুঁড়ায় ফ্যাট থাকে বেশি পরিমাণে।
৪. এন্ডোস্পার্মে থাকে সবচেয়ে কম।

চিনি

১. উপরিস্তরে চিনির পরিমাণ থাকে কম।
২. মধ্যমস্তরে চিনির পরিমাণ বেশি থাকে।
৩. এন্ডোস্পার্মে থাকে খুবই কম।

শর্করা

১. উপরিস্তরে থাকে কম এবং
২. এন্ডোস্পার্মে থাকে সবচেয়ে বেশি।

খনিজ উপাদানসমূহ

১. কুঁড়াসহ চালে খনিজ উপাদানের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এবং মিলে ভাঙানো চালে খনিজ উপাদানের পরিমাণ তুলনামূলক অনেক কম থাকে।

ভিটামিন

১. বি$_১$ এর পরিমাণ জার্ম এবং পেরিকার্পে সবচেয়ে বেশি।
২. বি$_২$ জার্মে সবচেয়ে বেশি এবং
৩. নিয়াসিন-এর পরিমাণ পেরিকার্প ও কুঁড়ায় সবচেয়ে বেশি।

এখানে উল্লেখ্য, মিলে ভাঙানো চালে পুষ্টিমান অনেক কমে যায়। কিন্তু এতে করে ফ্যাট অপসারণ হওয়ার কারণে চালের সংরক্ষণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। সাধারণত মিলিং-এর সময় চালের ৪% পলিশিং-এর মাধ্যমে অপসারিত করার কথা কিন্তু বাস্তবে পলিশ করা হয় ৮%। এটা করা হয় মূলত চালকে পরিষ্কার ও সরু করার জন্য। পুষ্টি মানের কথা বিবেচনা করে কোনোভাবেই অতিরিক্ত পলিশিং করা উচিত নয়।

ধান থেকে চাল উৎপাদন

ধান থেকে খোসা অপসারণের পর যে দানা পাওয়া যায় তাকে চাল বলা হয়। আমরা যে চাল খাই তা প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন–

(১) আতপ চাল
(২) সিদ্ধ চাল

(১) আতপ চাল

ধান সিদ্ধ না করে শুধু রোদে শুকিয়ে তা থেকে যে চাল তৈরি করা হয় তাকে আতপ চাল বলে। এ চাল দেখতে হয় সাদা এবং রান্না করলে এর ভাত হয় নরম, আঠাল ও ফাটাফাটা। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ আতপচাল খেতে পছন্দ করেন।

(২) সিদ্ধ চাল

ধান সিদ্ধ করে শুকাবার পর তা থেকে যে চাল উৎপন্ন হয় তাকে সিদ্ধ চাল বা (Parboiled Rice) বলা হয়। এ চাল দেখতে হালকা ঘোলাটে কিন্তু অর্ধস্বচ্ছ এবং পানি দিয়ে রান্না করলে এর ভাত হয় মসৃণ ও ঝরঝরে এবং খেতে লাগে সুস্বাদু।

পৃথিবীতে উৎপাদিত চালের প্রায় ২০% সিদ্ধ চাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এর বেশির ভাগই হয় ভারত, বার্মা, নেপাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে।

ধান সিদ্ধ করার সময় প্রথমে চালের স্টার্চ পানি শোষণ করে নেয় এবং ক্রমান্বয়ে তাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে স্টার্চের গঠনেরও পরিবর্তন হয় এবং একপর্যায়ে তা হয়ে যায় থকথকে ও পরিষ্কার। স্টার্চের থকথকে হয়ে যাওয়ার এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় জিলেটিনাইজেশন। সাধারণত কমপক্ষে ২৫% পানি ও ৬৫-৭৫° সে. তাপমাত্রার উপস্থিতিতে জিলেটিনাইজেশন হয়ে থাকে।

ধান সিদ্ধ করার সময় পানি এবং তাপ একই সাথে অথবা পৃথকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন–

(১) ধান ও পানি এক সাথে মিশিয়ে সিদ্ধ করা অথবা

(২) নির্দিষ্ট সময় ধরে পানিতে ধান ভিজিয়ে রাখার পর ঐ পানি ফেলে দিয়ে ভেজা ধান সিদ্ধ করা।

আমাদের দেশে কৃষকদের বসতবাড়িতে প্রধানত ২ নম্বর পদ্ধতিতে ধান সিদ্ধ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ধানে সাধারণত ৩৫% জলীয় কণা থাকে। এরপর তা শুকিয়ে ১৩-১৪% জলীয় কণায় পরিণত করে চাল তৈরি করা হয় বা সাময়িকভাবে গুদামজাত করা হয়। ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে ১ নং পদ্ধতিতে ধান সিদ্ধ করা হয়ে থাকে।

ধান সিদ্ধ করার পদ্ধতি (Methods of Parboiling)

(১) প্রচলিত পদ্ধতি (Traditional Process)

(২) হোম স্কেল প্রসেস (Home Scale Process)

(৩) কমার্শিয়াল স্কেল প্রসেস (Commertial Scale Process)

এখানে কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিক ধান সিদ্ধকরণ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো–

বানিজ্যিক পদ্ধতি

এ পদ্ধতির উদ্ভব হয় মায়ানমার অঞ্চলে। এক্ষেত্রে দুইভাবে ধান সিদ্ধ করা হয়ে থাকে। যেমন–

(১) এক সিদ্ধ প্রক্রিয়া এবং

(২) দুই সিদ্ধ প্রক্রিয়া।

প্রথম ক্ষেত্রে ভেজা ধানের মধ্যে মাত্র একবার বাষ্প প্রবেশ করানো হয়। এতে করে ধান অর্ধসিদ্ধ হয় ফলে চালের মাঝখানটা সাদা দেখায়। চালের এ অবস্থাকে বলা হয় সাদা পেটের চাল। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ভিজা

ধানের মধ্যে পরপর দু-বার বাষ্প চালনা করা হয়। এতে ধানের ভিতরের চাল সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় ফলে চালের দানা সাদা দেখায় না বরং পরিষ্কার দেখায়।

ধান ভিজিয়ে সিদ্ধ করার পদ্ধতি
ধান সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে ভিজানো হয়ে থাকে। যেমন-

(১) ধীর পদ্ধতি
এ পদ্ধতিতে সাধারণত সিমেন্টের তৈরি চৌবাচ্চার মধ্যে ধানকে ডুবিয়ে রাখা হয়। এভাবে ২-৩ দিন ভিজিয়ে রাখার পর পানি থেকে উঠিয়ে স্টিমিং কেটলির মধ্যে বাষ্প প্রবাহের মাধ্যমে ধান সিদ্ধ করা হতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না কেটলির উপরিভাগ দিয়ে স্টিম নির্গত হয়। এ কাজ সম্পন্ন হতে ১০-১৫ মিনিট সময় লাগে। অতঃপর সিদ্ধ করা ধান রোদে শুকানো হয়।

ধীর পদ্ধতিতে ধান ভিজার কারণে নিম্নলিখিত অসুবিধাসমূহ হতে পারে, যেমন-
(১) দীর্ঘ সময় ধরে ধান ভিজাবার ফলে খারাপ গন্ধ হতে পারে।
(২) একই পানি বারবার ব্যবহারের ফলে জীবাণুগত চোলাইকরণের কারণেও খারাপ গন্ধ হতে পারে। এই গন্ধ সহজে দূর করা যায় না। কাজেই ধান ভিজানোর জন্য নতুন পানি ব্যবহার করা উচিত।

ভিজা ধান সিদ্ধকরণ পদ্ধতি : চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :

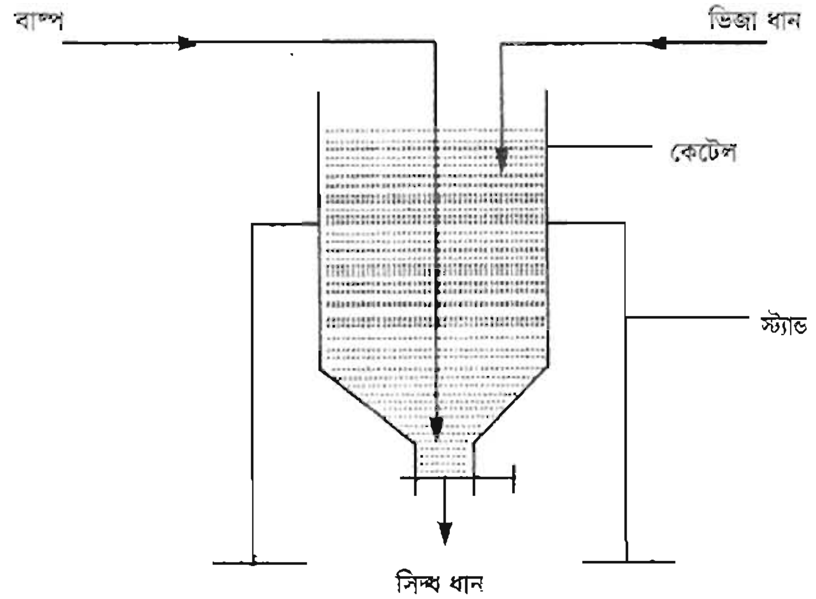

চিত্র : ভিজা ধান সিদ্ধকরণ পদ্ধতি

(২) দ্রুত পদ্ধতি

এ ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাড়ার জন্য ধানকে প্রথমে ১০-১৫ মিনিট ধরে উত্তপ্ত করার পর গরম অবস্থায় চৌবাচ্চার মধ্যে পানি দিয়ে ভিজানো হয়। এভাবে ধান দ্রুত পানি শুষে নেয় ফলে ১-২ ঘন্টার মধ্যেই ধান উপযুক্ত পরিমাণে ভিজে যায়। এরপর স্টিম কেটলির মাধ্যমে ধান সিদ্ধ করে শুকানো হয়।

ধান সিদ্ধ করার আধুনিক পদ্ধতি

এ ক্ষেত্রে স্টিলের তৈরি কেটলির মধ্যে ধান ভিজানো এবং সিদ্ধ করা হয়ে থাকে। সাধারণত স্টিম কেটলির ধারণ ক্ষমতা ৪-৫ টনের হয়। এরূপ পাশাপাশি একাধিক কেটলিতে একবারে অনেক ধান সিদ্ধ করা হয়। যেমনটি চিত্রে দেখানো হলো।

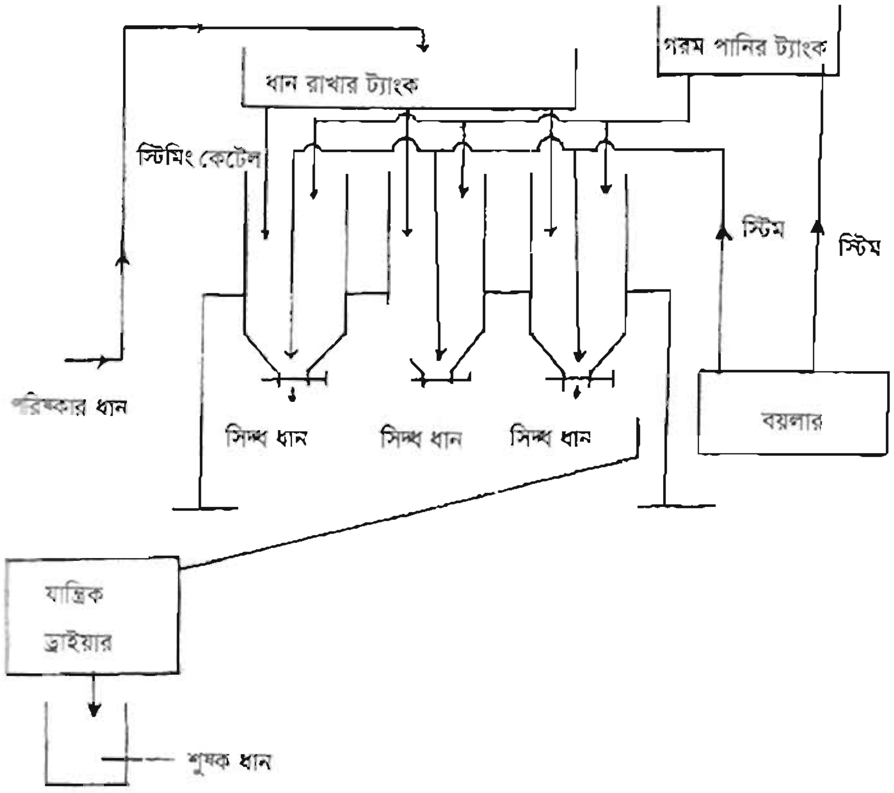

চিত্র : ধান সিদ্ধ করার আধুনিক পদ্ধতি

বর্ণনা

ধান পরিষ্কার করার পর তাকে প্রথমে চেইন বাসকেটের সাহায্যে একটি ধান রাখার ট্যাংকে উঠানো হয় এবং সেখান থেকে পরিমাণমতো ধান নিচের স্টিমিং ট্যাংকে ভরার পর তাতে ৯০° সে. তাপমাত্রার গরম পানি ঢালা হয়। ফলে ধানের তাপমাত্রা বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকম হয়। তাই ধানের তাপমাত্রা সমতায় আনার জন্য

স্টিমিং ট্যাংকের গরম পানি ২-৩ বার চক্রাকারে উপর-নিচ করা হয় (Recycle)। এভাবে ৩-৪ ঘন্টার মধ্যেই ধান উপযুক্ত পরিমাণে ভিজে যায়। এ সময় ধানের তাপমাত্রা থাকে ৮০-৯০° সে.।

এরপর পানি ফেলে দিয়ে একই ট্যাংকে ভিজা ধানের মধ্যে ৭৫-৮৫ পিএসআই চাপের স্টিম ২০-২৫ মিনিট ধরে চালনা করা হয় এবং সিদ্ধ ধানকে কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে যান্ত্রিক ড্রায়ারে অথবা রোদে শুকানো হয়।

ধান ভাঙানো (Rice Milling)

সুষ্ঠুরূপে ধান ভাঙানোর জন্য চালের আকার ও আকৃতি নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ কোনো কোনো মেশিনের রোলারের মধ্যবর্তী ক্লিয়ারেন্স চালের দৈর্ঘ্যের উপর এবং কোনো কোনো মেশিনের রোলারের ক্লিয়ারেন্স চালের পুরুত্বের উপর ভিত্তি করে করা হয়। যেমন মেটাল রোলারের ক্ষেত্রে চালের দৈর্ঘ্য এবং রাবার-মেটাল রোলারের ক্ষেত্রে চালের পুরুত্বের উপর ভিত্তি করে ধান ভাঙানো হয়।

ধান ভাঙানোর প্রবাহ চিত্র

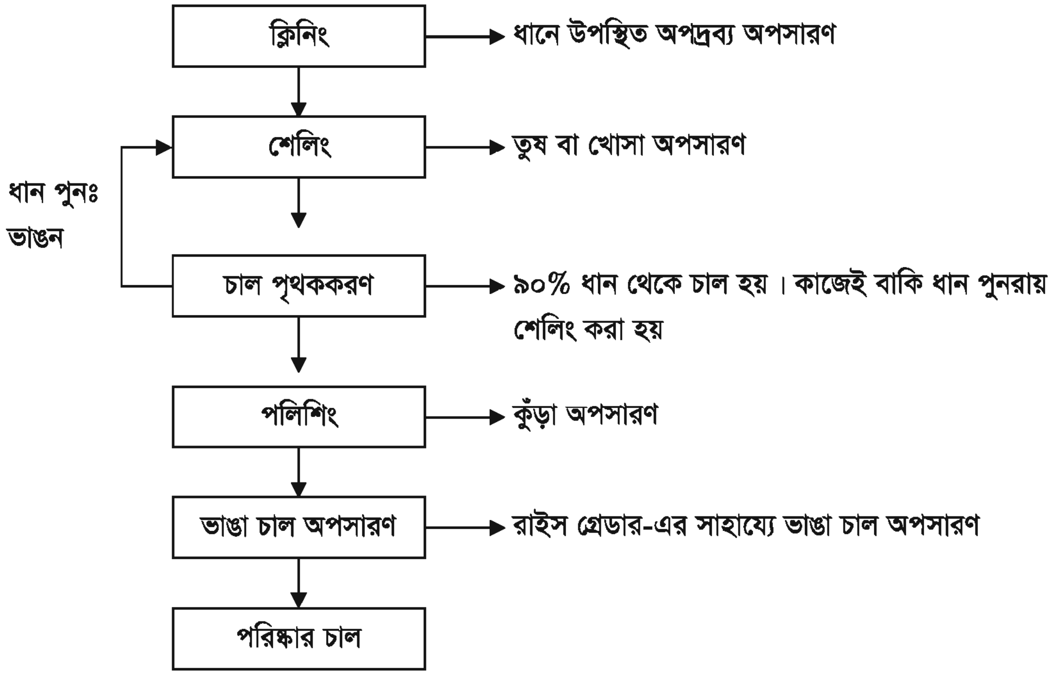

১. পরিষ্কারকরণ (Cleaning)

ধান পরিষ্কার করার জন্য বড় আকৃতির ঘূর্ণায়মান ড্রাম ব্যবহার করা হয়। এতে করে বড় আকারের খড়, কুটা অপসারিত হয়। এরপর ধানকে পরপর দুটি চালনির সাহায্যে চেলে ছোট এবং বড় আকারের ইট-পাথরের টুকরা এবং অন্যান্য অপদ্রব্য মুক্ত করা হয়। এছাড়া ধুলোবালি এবং তুষ বায়ু শোষণ প্রক্রিয়ায় পৃথক করা

হয়। ধান সরানোর জন্য বাতাসের গতি ৭ মিটার/সেকেন্ড এবং তুষ ও কুঁড়া সরানোর জন্য ৪ মিটার/সেকেন্ড-এর প্রয়োজন হয়।

২. **তুষ ছাড়ানো (Husking)**

৩. ধানের খোসা ছাড়ানোর প্রক্রিয়াকে বলা হয় হাস্কিং। এ কাজের জন্য প্রধানত রাবার রোলার হাস্কার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর ব্যবহার নিম্নরূপ–

রাবার রোলার হাস্কার (Rubber roller Husker)

এক্ষেত্রে একই ব্যাসের দুটি রাবার রোলার ভিন্ন ভিন্ন গতিতে ঘুরতে থাকে এবং দুইটি রোলারের মাঝখানে ধান ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে ঘর্ষণজনিত ক্রিয়ায় ধানের উপর থেকে তুষ আলাদা হয়। এ সমস্ত রোলারের স্থায়িত্ব সাধারণত ১০০ টন পর্যন্ত হয়ে থাকে। বর্তমানে পলিপ্রোপাইলিন রোলারও পাওয়া যায়। এর স্থায়িত্বকাল আরও বেশি। তবে এগুলো একটু দামি। এর প্রধান সুবিধা হলো–

(১) উচ্চমাত্রার হাস্কিং কর্মক্ষমতা (৮৫-৯০%)।
(২) নিম্ন পর্যায়ের চাল ভাঙন (প্রায় ১%)।
(৩) পলিশিং হয় না ফলে কুঁড়ারও ক্ষতি হয় না।
(৪) চাল ভাঙে না বলে উৎপাদন বাড়ে।
(৫) ধানের জলীয় কণার পরিমাণ বেশি হলে হাস্কিং করা যায় না।

ধানের মিলে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি :

ধানের মিলে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন-

(১) প্যাডি সেপারেটর
(২) পলিশার
(৩) রাইস গ্রেডার
(৪) হলার
(৫) রোটারি সেপারেটর
(৬) ডি-স্টোনার ইত্যাদি।

(১) প্যাডি সেপারেটর : ধান ভাঙানোর পর তা থেকে চাল, ধান এবং তুষ পৃথক করার কাজে এ যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি দুই ধরনের হতে পারে। যেমন-

ক) কম্পার্টমেন্ট টাইপ (Compartment type) খ) ডেক টাইপ (Deck type)

(২) পলিশার : এর কাজ হলো চাল থেকে কুঁড়া অপসারিত করা। সাধারণত প্রতিবার (Operation) ৩% পলিশিং হয়ে থাকে। পলিশ করা চাল দেখতে পরিষ্কার এবং কিছুটা সরু হয়।

(৩) রাইস গ্রেডার : এর কাজ হলো চালের মিশ্রণ থেকে ভাঙা চাল বা খুদ পৃথক করা।

(৪) হলার : এর সাহায্যে ধানের তুষ এবং কুড়া একই সাথে অপসারিত হয়।

(৫) রোটারি সিফ্টার : এ যন্ত্রের সাহায্যেও ভাঙা চাল পৃথক করা হয়।

(৬) ডি-স্টোনার : এর সাহায্যে চাল থেকে পাথরের টুকরো অপসারিত হয়।

চালের উপজাত দ্রব্য (By-Product of Rice)

উপজাত দ্রব্য হিসেবে চাল থেকে প্রধানত নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ পাওয়া যায়। যেমন-

১) তুষ : ২১ - ২৫%
২) কুড়া : ৪ - ৭%
৩) ভাঙা চাল : ৪ - ৮%

গম

পরিচিতি

গম একটি দানাদার শস্য। সারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ দানাদার শস্য উৎপন্ন হয় তার প্রায় ৩৩% গম। এর উৎপাদন প্রধানত নির্ভর করে-

১. বীজের বৈশিষ্ট্য
২. সারের ব্যবহার
৩. পানি সেচ
৪. আবহাওয়া এবং
৫. মাটির প্রকৃতির ওপর।

গম প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, কানাডা, ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া এবং আর্জেন্টিনায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশেও অনেক পরিমাণে গম উৎপন্ন হয়ে থাকে।

গমের প্রকারভেদ

বপন কালের উপর ভিত্তি করে গমকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন :

১. শীতকালীন গম (Winter Wheat)
২. বসন্তকালীন গম (Spring Wheat)
৩. ডিউরাম গম (Durum Wheat)

শীতকালীন গম : এই গম আমাদের দেশে জন্মে। শীতকালে আমাদের দেশে এই গম চাষ করা হয়। এর উৎপাদন হার কম এবং এতে প্রোটিনের পরিমাণ কম। প্রোটিনের পরিমাণ কম বলে একে নরম গম বা Soft Wheat বলে। সাধারণত বিস্কুট এবং কেক তৈরির জন্য এটি উপযোগী।

বসন্তকালীন গম : এই গম প্রধানত কানাডা এবং রাশিয়ায় বেশি উৎপন্ন হয়ে থাকে। এসব দেশের বসন্তকালের শুরুতেই বপন করা হয় এবং এতে অল্প দিনেই ফসল পাওয়া যায়। এতে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে তবে উৎপাদনের পরিমাণ কম। এটি রুটি তৈরির জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

ডিউরাম গম : সাধারণত এই গম রাশিয়া, আমেরিকায় এবং কানাডায় প্রচুর পরিমাণে চাষ করা হয়। এসব দেশের শুষ্ক অঞ্চলে এ গম ভালো জন্মে। এ গম দেখতে হলুদাভ। এতে প্রচুর বিটা ক্যারোটিন থাকে এবং প্রেটিনের পরিমাণও থাকে অনেক বেশি। তাই একে হার্ড হুইট বলা হয়। একে ম্যাকারনি হুইট বলা হয়, কারণ এর দ্বারা ম্যাকারনি জাতীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এছাড়া এ থেকে ময়দা, সুজি, সেমাই এবং বিভিন্ন ধরনের এক্সট্রুডেট প্রোডাক্ট যেমন– কৃত্রিম মাংস প্রস্তুত করা হয়।

গমের গঠন

গমের দানা সাধারণত চারটি স্তরে গঠিত। যেমন–

১. ব্রান (Bran) বা উপরের আবরণ
২. এলিউরন (Aleurone)
৩. এন্ডোস্পার্ম (Endosperm)
৪. ভ্রূণ (Germ)

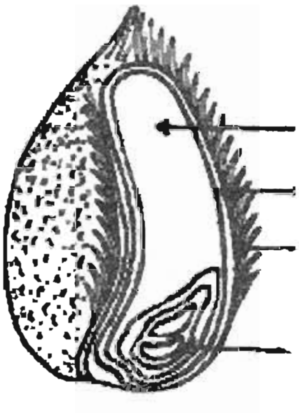

চিত্র : গমের গঠন

এছাড়া গমের একটি প্রধান গাঠনিক বৈশিষ্ট্য হলো এতে একটা ভাঁজ বা crease থাকে। দেখলে মনে হয় যেন একটা পুরু শিট (Sheet) কে দুই ভাজ করে জোড়া দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের গঠন আর অন্য কোনো শস্য দানায় দেখা যায় না। এই ভাঁজ থাকার কারণে পলিশিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপরের আবরণ বা ব্রানকে সহজে পৃথক করা যায় না। কাজেই জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই কাজটি করা হয়ে থাকে। কারণ রুটি ও বিস্কুট তৈরি করার জন্য সাদা ময়দা দরকার হয়।

গমের উপাদান :

জলীয় কণা	১৪%
প্রোটিন	৯-১৪%
ফ্যাট	২-২.৫%
দ্রবণীয় কার্বোহাইড্রেট	৬৩-৬৭%
আঁশ	২.০%
খনিজ	১.৫%

ভ্রূণে এককভাবে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকে (২০-৩০%)। বেশির ভাগ ফ্যাটও সেখানেই থাকে। খনিজ পদার্থ ও আঁশ প্রধানত উপরের আবরণ বা ব্রান লেয়ারে থাকে।

অনেক সময় আলাদাভাবে ভ্রূণ সংগ্রহ করা হয় এবং তা দিয়ে স্পেশাল জার্ম ব্রেড প্রস্তুত করা হয়। গমের ভ্রূণের উপাদান শতকরা হারে নিচে দেখানো হলো :

জলীয় কণা	৯.২%
প্রোটিন	২৮.৯%
আঁশ	২.১%
ফ্যাট	৯.৭%
খনিজ লবণ	৪.১%
কার্বোহাইড্রেট	৪৬.০%

আটা বা ময়দার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক মানসম্পন্ন দ্রব্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। যেমন- আটা, ময়দা, সুজি ইত্যাদি। এ সমস্ত দ্রব্যের বিভিন্নতা বিচার করা হয় গমের গুড়ার আকৃতির ওপর (Particle Size)। তাছাড়াও প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরনের গম একসাথে মিশিয়েও নানা ধরনের আটা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। কাজেই আটার গাঠনিক উপাদানে বিভিন্নতা দেখা যায়। বিভিন্ন ভাবে আহরিত গমের আটার উপাদান সমূহ নিচের সারণীতে দেখানো হলো:

গমের আটার গাঠনিক উপাদান :

গাঠনিক উপাদান শতকরা হারে	সাদা আটা ৭২% আহরিত	সাদা আটা ৮০% আহরিত	সম্পূর্ণ গমের আটা ৯৫% আহরিত
জলীয় কণা	১৩-১৫.৫	১৩-১৫	১৩-১৩.৫
স্টার্চ	৬৫-৭০	৬৪-৬৯	৬৩-৬৭
প্রোটিন	৮-১৩	৯-১৪	১০-১৪
আঁশ	০.২	০.২-০.৩৫	১.৬-২.১
ফ্যাট	০.৮-১.৫	১.০-১.৬	১.৬-২.২
চিনি	১.৫-২.০	১.৫-২.০	২.০-৩.০
খনিজ	০.৩-০.৬	০.৬-০.৮	১.৪-১.৬

এন্ডোস্পার্ম ও ব্রানের গাঠনিক উপাদান :

উপাদান	এন্ডোস্পার্ম %	ব্রান %
জলীয় কণা	১৪	১৩.২
প্রোটিন	৯.৬	১৪.৪
ফ্যাট	১.৪	৪.৭
ছাই	০.৭	৬.৩ (খনিজ উপাদান)
কার্বোহাইড্রেট	৭৪.৩	৬১.৪

স্টার্চ	৭১.০	৮.৬
হেমি সেলুলোজ	১.৮	২৬.২
চিনি	১.১	৪.৬
সেলুলোজ	০.২	২১.৪
মোট কার্বোহাইড্রেট	৭৪.১	৬০.৮
মোট আহরণ	৯৯.৮	৯৯.৪

ব্রান

গমের উপরের পাতলা আবরণকে ব্রান বলে। এটা সহজে অপসারণ করা যায় না। এজন্য বিশেষ ধরনের মিলিং প্রয়োজন হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে খনিজ উপাদান ও সেলুলোজ থাকে। আটায় ব্রানের পরিমাণ যত বেশি থাকে তার রং তত হলদে বা বাদামি হয়।

এন্ডোস্পার্ম

ব্রান অপসারণ করার পর যে সাদা অংশ পাওয়া যায় তাকে এন্ডোস্পার্ম বলে। এন্ডোস্পার্ম থেকে যে ফ্লাওয়ার তৈরি করা হয় তাকে ময়দা বলে। এতে ব্রানের কোনো অংশ থাকে না বলে এর রং সাদা হয়।

ফ্যাট

গমে উপস্থিত ফ্যাট সাধারণত জার্ম ও ব্রানে অবস্থান করে। এন্ডোস্পার্মে এ ফ্যাটের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম থাকে।

প্রোটিন

গমে সাধারণত ৬-২০% প্রোটিন পাওয়া যায়। এই প্রোটিনের পরিমাণ নির্ভর করে চাষাবাদে ব্যবহৃত সার, পানি, মাটির প্রকৃতি ও বৃষ্টিপাতের ওপর। গম কাটার পূর্বে বৃষ্টি হলে প্রোটিনের পরিমাণ কমে যায়।

গমে উপস্থিত প্রোটিনকে গ্লুটেন বলে। পানির সংস্পর্শে এই গ্লুটেন স্থিতিস্থাপক বস্তুতে পরিণত হয়। ফলে পাউরুটি প্রস্তুতকালে তা ফুলে উঠে এবং তার আকার-আকৃতি ঠিক থাকে। এরূপ প্রোটিন আর কোনো দানাদার শস্যে দেখতে পাওয়া যায় না। প্রোটিনের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে গমের ময়দা বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

গমের গুণগত বৈশিষ্ট্য (Quality of Wheat)

গমের গুণগত বৈশিষ্ট্য সাধারণত নির্ভর করে তার পুষ্টি সাধন (Growth), ভাঙানোর পদ্ধতি (Milling) এবং বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুতিতে এর ব্যবহারের ওপর। তবে প্রধানত তা নির্ভরশীল-

১. প্রাকৃতির বিবর্তন ও পরিকল্পিত প্রজনন পদ্ধতি এবং
২. পরিবেশগত বিভিন্ন উপাদান, যেমন- মাটির উর্বরতা, সেচ ব্যবস্থা, সার, বৃষ্টির পরিমাণ ও জাতের ওপর।

এছাড়া কিছু অপ্রধান কারণেও গমের গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রভাবান্বিত বা পরিবর্তিত হতে পারে, যেমন :

ক) গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা

খ) স্থানান্তর ও নাড়াচাড়াকরণ এবং

গ) পৃথক করা যায় না এমন কিছু বিষাক্ত অপদ্রব্যের উপস্থিতি ।

গম থেকে আটা বা ময়দা উৎপাদন (Milling of Wheat)

গম থেকে খোসা এবং ভ্রূণ অপসারিত করার পর তার অভ্যন্তরীণ শাঁসকে গুঁড়া করে সূক্ষ্ম কণায় পরিণত করার পদ্ধতিকে মিলিং এবং উৎপন্ন দ্রব্যকে ফ্লাওয়ার বা ময়দা বলা হয় । গম গুঁড়া করার পর ভাঙানোর এই কাজ প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে । যেমন :

(১) প্রচলিত পদ্ধতি (Traditional method)

(২) আধুনিক মিলিং পদ্ধতি (Modern Milling method)

১. **প্রচলিত পদ্ধতি :** এ পদ্ধতিতে খোসাসহ সম্পূর্ণ গমকে দুটি পাথরের তৈরি চাকির সাহায্যে গুঁড়া করে হোল হুইট পাউডার বা আটা প্রস্তুত করা হয় । এই আটায় সবধরনের পুষ্টি উপাদানই বিদ্যমান থাকে । এ থেকে পাউরুটি, কেক, বিস্কুট কোনোটিই ভালো হয় না । তবে সাধারণ স্যাঁকা রুটি বা চাপাতি ভালো হয় এবং খেতেও সুস্বাদু হয় ।

২. **আধুনিক মিলিং পদ্ধতি :** এ পদ্ধতিতে গম ভাঙানোর কাজটি প্রধানত ৩টি ধাপে করা হয়ে থাকে । যেমন :

(১) পরিষ্কারকরণ এবং ধৌতকরণ (Cleaning and washing)

(২) উপযুক্ত পরিমাণে পানি সিক্তকরণ (Conditioning with water)

(৩) ধাপে ধাপে গম ভাঙানো (Breaking of grain in different stages)

১) পরিষ্কারকরণ এবং ধৌতকরণ

অপদ্রব্য হিসেবে গমে প্রধানত ধুলোবালি, কাদা, গাছ পাতার অংশ, নুড়ি পাথর, লোহার ক্ষুদ্র টুকরা ইত্যাদি থাকতে পারে । এ ছাড়া গমের ভাঙা অংশ, পোকামাকড়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও বিষ্ঠা থাকতে পারে । এ সমস্ত অপদ্রব্যের মধ্যে যেগুলো গমের চেয়ে অনেক বড় এবং ছোট কেবল সেগুলো চালনির সাহায্যে চেলে অপসারিত করা যায় । যে সকল অপদ্রব্য আকারে গমের সমান সেগুলো কিছুতেই চালনির সাহায্যে অপসারিত করা যায় না । কাজেই নিম্নলিখিত মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অপদ্রব্য দূর করা হয়ে থাকে । যেমন-

(ক) আকার এবং আয়তন- বিভিন্ন পরিমাপের চালনি ব্যবহার করে অপদ্রব্য পৃথক করা যায় ।

(খ) আকৃতি (Shape) : ডিস্ক সেপারেটরের সাহায্যে ।

(গ) আপেক্ষিক গুরুত্ব বা ঘনত্ব : পানি দ্বারা ধোয়ার সময় হালকা দ্রব্য ভেসে উঠে এবং ভারী দ্রব্য ডুবে যায় । গম ভেসে উঠে এবং উপর থেকে তা সরিয়ে নেওয়া হয় ।

(ঘ) বাতাসের প্রবাহ : হালকা দ্রব্য যেমন- ধুলোবালি, গাছের পাতার অংশ ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের সাহায্যে অপসারিত করা যায় ।

(ঙ) চুম্বকীয় পদার্থ : যেমন- লোহার টুকরা সাধারণত অপসারণ করা হয় ম্যাগনেটিক স্ক্রিনের সাহায্যে। এই স্ক্রিনের মধ্য দিয়ে গম চালার সময় তাতে উপস্থিত লোহা বা লোহার টুকরা স্ক্রিনের গায়ে লেগে থাকে। এভাবেই লোহা বা লোহার টুকরা পৃথক করে গম পরিষ্কার করা হয়ে থাকে।

২) পানি সিক্তকরণ

গম পরিষ্কার করার পর তাতে কিছু পানি মিশ্রিত করে ২৪-৭২ ঘণ্টা বিনের মধ্যে রাখা হয় অথবা পানি মিশ্রিত গমকে কন্ডিশনার নামক যন্ত্রে ৪৯° সে. তাপমাত্রায় ৩০ থেকে ৯০ মিনিট রাখার পর ভাঙানোর জন্য ক্রাশিং রোলারে পাঠানো হয়। এ সময় গম একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি (১৫-১৭%) শোষণ করে ফলে গমের খোসা নরম হয় এবং সহজে তা অপসারণ করা যায়। তাছাড়া এন্ডোস্পার্মকে আকাঙ্ক্ষিত আকারে গুঁড়া করা যায় এবং প্রাপ্ত গুঁড়ার বিভিন্ন ভগ্নাংশ চালনির সাহায্যে চেলে সহজে ও নির্ভুলভাবে পৃথক করা যায়।

৩) ধাপে ধাপে গম ভাঙানো

প্রবাহ চিত্র :

ভাঙন (Breaking)

↓

চালনি দিয়ে চালন (Seiving)

↓

সাইজ (Reduction)

↓

পিউরিফিকেশন (Purification)

১. **ভাঙানো :** এক্ষেত্রে প্রথম অপারেশনেই পানি সিক্ত গমকে দুটি খাঁজকাটা, ঘূর্ণায়মান রোলারের মাঝে প্রবেশ করানো হয়। এই রোলার দুটির গতি একটির চেয়ে অপরটির একটু বেশি থাকার কারণে তাদের মধ্যে ঘর্ষণজনিত যে বল কাজ করে তাতে সহজেই গম ভেঙে টুকরা হয়ে যায়। এরপর গমের এই ভাঙা অংশকে চালনি দিয়ে চেলে আকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। বড় আকৃতির কণাগুলো পুনরায় ভাঙার জন্য ক্রাশিং রোলারে পাঠানো হয়। এমনি করে কয়েকবার ভাঙার পর গমের খোসা পৃথক হয়ে যায় এবং চালনি দিয়ে চেলে তা আলাদা করা হয়।

২. **চালনি দ্বারা চালা (Seiving) :** খোসা ছাড়ানোর সময় প্রতি ভাঙনে কিছু শাঁস সূক্ষ্ম ময়দায় পরিণত হয় এবং চালনি দিয়ে চেলে তা পৃথক করা হয়। চেলে পৃথক করার এ পদ্ধতিকে সিভিং (Seiving) বলে।

৩. **সূক্ষ্ম ভাঙানো (Size Reduction) :** ময়দা চালার সময় বড় আকৃতির যে সমস্ত শাঁসের কণা পাওয়া যায় তা মধ্যম চূর্ণকারী মসৃণ রোলারের সাহায্যে আরও সূক্ষ্মভাবে গুঁড়া করা হয়। একটি বড় মিলে এ জন্য ৮-১০ জোড়া রিডাকশন রোলার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৪. **পিউরিফিকেশন :** এরপর প্রাপ্ত ময়দার কণাকে বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে ভাসন্ত অবস্থায় রেখে বিভিন্ন আকৃতি ও ঘনত্বের নানা ধরনের ময়দায় পৃথক করা হয়। ময়দাকে বিভিন্ন আকৃতির সূক্ষ্ম কণায় পৃথক

করার এই পদ্ধতিকে পিউরিফিকেশন বলা হয়। এর ফলে ভিন্ন প্রকৃতির নানা রকমের ময়দা প্রতিটি রিডাকশন রোলার থেকে পাওয়া যায়।

৩.৪ ময়দার শ্রেণিবিভাগ :

ময়দার শ্রেণিবিভাগ নির্ভর করে মূলত গমের শ্রেণিবিভাগের উপর। উৎপাদনমাত্রা, আবহাওয়া, কীটপতঙ্গ ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং রাসায়নিক উপাদান ইত্যাদির ভিত্তিতে কয়েক প্রকার গম পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। গমকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয় : শক্ত ও নরম। শক্ত গমে তুলনামূলকভাবে বেশি প্রোটিন থাকে এবং উত্তম ধরনের ময়দা উৎপন্ন হয় যা থেকে স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন খামির পাওয়া যায় এবং উৎপন্ন পাউরুটির মানও হয় উন্নত। অপরপক্ষে নরম গমে প্রোটিন তথা গ্লুটেন কম থাকে এবং ময়দা হয় দুর্বল প্রকৃতির এবং এ ময়দা কেক তৈরির জন্য ভালো।

৩.৫ গম থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্য :

আধুনিক বিশ্বে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতির বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে গমের ব্যাপক ব্যবহার। গম থেকে উৎপাদিত কিছু দ্রব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. আটা
২. ময়দা
৩. সুজি
৪. সুজি আটা
৫. খোসা
৬. জার্ম
৭. হাই-প্রোটিন ফ্লাওয়ার
৮. লো-প্রোটিন ফ্লাওয়ার

পাউরুটি প্রস্তুতিকরণে ময়দার বিভিন্ন উপাদান

পাউরুটি প্রস্তুতকালে ময়দায় যেসব উপাদান উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন তা হলো :

১. প্রোটিন (৭-৮%)
২. লিপিড
৩. কার্বোহাইড্রেট
৪. সুগার
৫. এনজাইম

পাউরুটি প্রস্তুতিকরণে ময়দায় উপস্থিত বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকা

প্রোটিন

১. ময়দার প্রোটিনকে বলা হয় গ্লুটেন। ময়দায় উপস্থিত গ্লাইয়াডিন ও গ্লুটেনিন মিলে হয় গ্লুটেন। পানির উপস্থিতিতে গ্লুটেন আঠালো ও স্থিতিস্থাপক হয়।
২. প্রোটিনের পরিমাণ বাড়লে ময়দার পানি ধারণ ক্ষমতা ও গ্যাস ধারণ ক্ষমতা বাড়ে।

৩. ময়দার খামির প্রস্তুতির সময় খামিরের শক্তি ও গ্যাস ধারণ ক্ষমতা বহুলাংশে নির্ভর করে তাতে উপস্থিত প্রোটিনের গুণগত বৈশিষ্ট্যের উপর।
৪. প্রোটিনের পরিমাণ বাড়লে রুটির আয়তনও বাড়ে। একই জাতের গমের ময়দার প্রোটিন ১% বাড়লে রুটির আয়তন বাড়ে ৪০-৭০ মি. লি.।

লিপিড : গমের ময়দায় সাধারণত ১-২% লিপিড থাকে। লিপিডের পরিমাণের ওপর খামিরের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে নির্ভরশীল। পোলার লিপিড রুটির আয়তন বাড়ায়, কিন্তু নন পোলার লিপিড রুটির আয়তন কমায়।

কার্বোহাইড্রেট : ময়দায় ৭০-৮০% স্টার্চ বা কার্বোহাইড্রেট থাকে। এছাড়া ডেক্সট্রিন, সুগার এবং পেনটোজেনও থাকে। স্টার্চ গঠন করে রুটির গাঠনিক কাঠামো। অন্যদিকে রুটি সেঁকার সময় প্রোটিন, লিপিড ও স্টার্চ মিলে একটি কমপ্লেক্স কাঠামো গঠন করে এবং গ্যাস বাড়িয়ে তোলে রুটির আয়তন। ডেক্সট্রিন রুটির উপরিভাগে (Crust) সোনালি রং উৎপন্ন করে। রুটির অভ্যন্তরভাগে সৃষ্ট ফাঁপা গাঠনিক কাঠামো (Crumb structure) তৈরি হয় গ্লুটেনের জন্য।

সুগার : ডেক্সট্রোজ ও ফ্রুকটোজ প্রধানত রুটি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত ইস্ট-এর খাদ্য হিসেবে কাজে লাগে।

এনজাইম : ময়দায় প্রধানত অ্যামাইলেজ ও প্রোটিয়েজ নামক দুটি এনজাইম থাকে এদের মাঝে অ্যামাইলেজ স্টার্চকে ভেঙে মল্টোজে পরিণত করে, যা প্রধানত ইস্ট-এর খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রোটিয়েজ সাধারণত অল্প পরিমাণে থাকে। এর পরিমাণ বেশি হলে খামিরের মান কমে যায়।

পাউরুটি প্রস্তুতিতে বিভিন্ন ঐচ্ছিক উপাদানসমূহ ও এগুলোর ভূমিকা

ক) দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য
খ) হাইড্রোজিনেটেড ফ্যাট (Shortening agent)
গ) জারক দ্রব্য (Oxidants)
ঘ) ছত্রাক ও রোপ প্রতিরোধক (Mold and Rope Inhibitors)
ঙ) এনজাইম বিকল্প দ্রব্য (Enzyme supplements)
চ) খামির উপযুক্ত বা যোগ্যকারক (Dough Conditioners)
ছ) চিনি (Sugar)

ক) দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য

এগুলো সাধারণত রুটির পুষ্টিমান বৃদ্ধি করে। এছাড়া এদের উপস্থিতিতে নিম্নলিখিত সুবিধা পাওয়া যায়-

১. রুটি নরম হয় এবং অভ্যন্তরভাগ সাদা হয়।
২. সুন্দর গন্ধ এবং খেতে সুস্বাদু হয়।
৩. রুটির উপরিভাগের রং আকর্ষণীয় হয়।
৪. সাধারণত রুটিতে ৩% ননিবিহীন দুধ ব্যবহার করা হয়।

খ) হাইড্রোজিনেটেড ফ্যাট (Shortening agent)

হাইড্রোজিনেটেড ফ্যাট হিসেবে ডালডা ব্যবহার করা হয়। এতে নিম্নলিখিত সুবিধা পাওয়া যায়–

১. আয়তনে বাড়ে, এতে করে গ্যাস ধারণক্ষমতা বেড়ে যায়।
২. অভ্যন্তর ভাগের গাঠনিক বৈশিষ্ট্য উন্নত হয়।
৩. জলীয় কণার স্থানান্তর বাধাগ্রস্ত হয়।
৪. দীর্ঘ সময়েও রুটির অভ্যন্তর ভাগ নরম থাকে।
৫. সহজে ফালি করা যায়।
৬. রুটি প্রস্তুতিতে সাধারণত ৩% ফ্যাট ব্যবহার করা হয়।

গ) জারক দ্রব্য (Oxidants)

খামির প্রস্তুতিতে জারক দ্রব্য হিসেবে তাতে খুব অল্প পরিমাণে পটাশিয়াম ব্রোমেট, এসকরবিক অ্যাসিড অথবা অ্যাজোডাই কার্বোনিমাইড যোগ করা হয়ে থাকে। এতে করে গ্লুটেনের গঠন দ্রুত ও দৃঢ় হয়, ফলে রুটির গ্যাস ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং রুটি আয়তনে বাড়ে।

ঘ) ছত্রাক ও রোপ প্রতিরোধক (Mold and Rope Inhibitors)

রোপ এক ধরনের ছত্রাক যা রুটি বিস্কুট বেশি দিন মজুদ থাকলে দেখা যায়। ছত্রাক প্রতিরোধের জন্য প্রধানত ক্যালসিয়াম এবং সোডিয়াম প্রোপায়োনেট অথবা অ্যাসিড ক্যালসিয়াম ফসফেট অথবা উভয়েই একসাথে ব্যবহার করা যায়। এতে করে রুটির সেলফ লাইফ ৪-৫ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়। তাছাড়া অন্যান্য দ্রব্য যেমন- ভিনেগার বা ল্যাকটিক অ্যাসিড (০.৩%) যোগ করা যেতে পারে।

ঙ) এনজাইম বিকল্প দ্রব্য (Enzyme supplements)

এনজাইমের বিকল্প হিসেবে নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ ব্যবহার করা যায়-

১. মল্ট ফ্লাওয়ার
২. ফাংগাল অ্যামাইলেজ
৩. ব্যাকটেরিয়াল অ্যামাইলেজ

চ) খামির উপযুক্ত বা যোগ্যকারক (Dough Conditioners)

এ সমস্ত দ্রব্যকে সারফেক্ট্যান্ট বলে। এগুলো লম্বা চেইনযুক্ত পলিহাইড্রিক অ্যালকোহল এবং ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। এরা লিপিড এবং প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত হয়ে হাইড্রোফিলি প্রোটিন এবং লাইপোফিলিক লিপিডে পরিণত হয়। এতে করে রুটির আয়তন বৃদ্ধি পায়, পানি গ্রহণ করার ক্ষমতা বাড়ে, শেলফ লাইফ বাড়ে এবং রুটির অভ্যন্তর ভাগের গঠন সুন্দর ও উন্নত হয়। খামির কন্ডিশনার হিসেবে ক্যালসিয়াম অথবা সোডিয়াম স্টেরয়েন-২, ল্যাকটিলেট এবং মনো ও ডাই গ্লিসারাইড-এর এস্টারসমূহ যোগ করা হয়ে থাকে।

ছ) চিনি (Sugar)

রুটি প্রস্তুতিতে সাধারণত ৪-৮% চিনি যোগ করা হয়। এতে করে রুটির স্বাদ ও মিষ্টি গন্ধ বাড়ে। এছাড়া চিনি খাবার হিসেবে ইস্টের বৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করে। চিনি রুটির শেলফ লাইফ বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে।

পাউরুটি প্রস্তুতকরণে কতগুলো মৌলিক এবং আবশ্যিক পদক্ষেপ অবশ্য করণীয়। সেগুলো হলো–

১. মিক্সিং (Mixing)
২. চোলাইকরণ (Fermentation)
৩. সেঁকা (Baking)

মিক্সিং (Mixing)

ময়দার সাথে পানি যোগ করার পর তা যন্ত্রের সাথে খুব ভালো করে মেশালে যে আঠালো সমসত্ত্ব ও স্থিতিস্থাপক বস্তুর সৃষ্টি হয় তাকে খামির (dough) বলে। মিশ্রণ যত ভালো হবে সেই খামিরের গ্যাস ধারণ করার ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পাবে। কারণ পরিপূর্ণভাবে গ্লুটেন গঠিত হওয়ার জন্য ময়দায় উপস্থিত গ্লাইয়াডিন ও গ্লুটেনিনের একান্ত সংস্পর্শের প্রয়োজন হয়। গ্লুটেন ঠিকমতো গঠিত না হলে গ্যাস ধারণক্ষমতা কমে যায়।

এছাড়া মিক্সিং-এর সময় খামিরের মাঝে অক্সিজেন প্রবেশ করার কারণে চোলাইকরণ ভালো হয়।

চোলাইকরণ (Fermentation)

খামিরের সাথে ইস্ট যোগ করার কারণে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। ফলে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো হয়ে থাকে।

ভৌত পরিবর্তন

১. খামির ফুলে ওঠে অর্থাৎ রুটির আয়তন বেড়ে যায়।
২. খামিরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।
৩. ইস্ট সেলের সংখ্যা বাড়ে।
৪. জলীয় কণার পরিমাণ বাড়ে।

রাসায়নিক পরিবর্তন

১. খামিরের pH কমে যায় (৫.৫-৪.৭)।
২. এসিটিক অ্যাসিড ও ল্যাকটিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়।
৩. অ্যামাইলেজের প্রভাবে মল্টোজ উৎপন্ন হয় এবং ইস্টের প্রভাবে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের সৃষ্টি হয়।

চোলাইকরণের সময় মূলত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে-

১. ইস্ট-এর পরিমাণের ওপর
২. খামিরের প্রকৃতির ওপর
৩. তাপমাত্রার ওপর
৪. খামিরে উপস্থিত চিনির ওপর

সেঁকা (Baking)
খামিরে তাপ প্রয়োগের ফলে নিম্নলিখিত পরিবর্তনসমূহ হয়ে থাকে-

১. প্রথমে একটু আয়তনে বাড়ে।
২. প্রোটিন ঘনীভূত হয়।
৩. স্টার্চ জেলির আকার ধারণ করে।
৪. ইস্ট সেল মারা যায়।
৫. গ্যাস উৎপাদন থেমে যায়।
৬. জলীয় কণা কমে যাওয়ার ফলে রুটি শক্ত হয়।

৩.৬ রুটি প্রস্তুতিতে ইস্ট-এর কাজ :

রুটি প্রস্তুতিতে ইস্ট সেলের তিনটি প্রধান ভূমিকা আছে, যেমন–

১. কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুতির মাধ্যমে রুটির আয়তন বৃদ্ধি করা
২. অ্যালকোহল এবং এস্টার সৃষ্টির মাধ্যমে রুটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মিষ্টি গন্ধ উৎপাদন করা।
৩. খামিরের বিকাশ সাধন করা।

রুটি প্রস্তুতিতে সাধারণত ২-৩% ইস্ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৩.৭ রুটি প্রস্তুতিতে লবণের কাজ :

রুটি প্রস্তুতিতে সাধারণত ১-২% চিকন দানাদার লবণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এতে করে রুটির স্বাদ বাড়ে। এছাড়া লবণের প্রভাবে

১. ইস্টের চোলাইকরণ নিয়ন্ত্রিত হয়।
২. গ্লুটেনের গঠন দৃঢ় হয়।
৩. প্রোটিয়েজের কার্যকারিতা স্থায়ী হয়।

রুটি প্রস্তুতির বিভিন্ন ধাপ :
সরল খামির পদ্ধতি (Straight dough system)
প্রবাহ চিত্র :

চালনি দ্বারা চালা (Seiving)
↓
ওজনকরণ (Weighing)
↓
দ্রবণ প্রস্তুতকরণ (Preperation of Solution)
↓
পানির তাপমাত্রা নির্ধারণ (Adjustment of water temperature)
↓
খামির মিশ্রিতকরণ (Mixing)
↓

চোলাইকরণ (Fermentation)
↓
গ্যাস পুনর্গঠিতকরণ (Knock Back)
↓
খামিরের আকার ও আকৃতি দান (Dough Make Up)
↓
প্যানে খামির ভর্তিকরণ (Panning)
↓
প্রুভিং (Proving)
↓
বেকিং (Baking)
↓
কুলিং (Cooling)
↓
প্যাকেজিং (Packaging)

রুটির স্টেলিং (Staling of Bread)

রুটি তৈরির সাথে সাথে তার অভ্যন্তরভাগ (Crumb) থাকে ভিজা এবং স্পঞ্জি এবং সেই সাথে উপরিভাগ (Crust) থাকে সুগন্ধময় শুষ্ক এবং মচমচে। কিন্তু রুটি রেখে দিলে ২-৩ দিনের মাঝেই তাতে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এ সমস্ত পরিবর্তনকে ব্রেড স্টেলিং বলা হয়। নিচে এর বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. রুটির উপরিভাগে মচমচে ভাব একেবারেই থাকে না। বরং তা হয়ে যায় নরম এবং চামড়ার ন্যায় নমনীয়।
২. আসল মিষ্টি গন্ধ আর থাকে না, খারাপ গন্ধের সৃষ্টি হয় এবং খেতে স্বাদ লাগে না। এসবই হয় অভ্যন্তর ভাগের জলীয় কণা শোষণের কারণে। রুটি জলীয় কণা প্রতিরোধক ফিল্ম দ্বারা প্যাকেট করলে স্টেলিং আরও দ্রুত হয়। এ ক্ষেত্রে উপরিভাগের জলীয় কণা শুকাতে পারে না।
৩. রুটির অভ্যন্তর ভাগ শক্ত, অনমনীয় ও ভঙ্গুর হয়। জলীয় কণা হারানোর কারণে এমন হয়।
৪. গন্ধের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।

এসব পরিবর্তন রোধ করার জন্য রুটিকে ০° সে. তাপমাত্রায় রাখা হয়।

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. ধানের উৎপত্তি কোথায় হয়েছে?

ক) উত্তর আমেরিকায় খ) অস্ট্রেলিয়ায়
গ) ইউরোপে ঘ) এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে

২. ধান পাকার পর তাতে জলীয় কণার পরিমাণ কত?

ক) ১-৪% খ) ৩০-৩৫%
গ) ৪০-৮০% ঘ) ২০-২৪%

৩. চাল সংরক্ষণ করার জন্য তাতে সর্বোচ্চ কী পরিমাণ জলীয় কণা থাকা প্রয়োজন?

ক) ১৮% খ) ১৫%
গ) ১২% ঘ) ৮%

৪. চালের স্টার্চ প্রধানত কী দ্বারা গঠিত?

ক) অ্যামাইলোজ খ) অ্যামাইলোপেকটিন
গ) উভয়ই ঘ) কোনোটিই নয়

৫. টোকোফেরল কী?

ক) এন্টি অক্সিডেন্ট খ) ফ্রি র‍্যাডিকেল
গ) দেহের জন্য ক্ষতিকর ঘ) অক্সিজেনমূলক

৬. মিলে ভাঙানো চালে অ্যালুমিনিয়াম- এর পরিমাণ কত?

ক) ০.০৮ খ) ০.০৭
গ) ০.০৮৭ ঘ) ০.০৯

৭. কুঁড়াসহ চালে–

ক) খনিজের পরিমাণ বেশি থাকে খ) খনিজের পরিমাণ কম থাকে
গ) খনিজ থাকেই না ঘ) কোনোটিই নয়

৮. চালে ভিটামিন বি$_2$ এর পরিমাণ কোথায় বেশি থাকে?

ক) পেরিকার্পে খ) এন্ডোস্পার্মে
গ) কুঁড়ায় ঘ) ভ্রূণে

৯. কোনটিকে নরম গম বা soft wheat বলে?

ক) শীতকালীন গমকে
খ) বসন্তকালীন গমকে
গ) ডিউরাম গমকে
ঘ) কোনোটিই নয়

১০. কৃত্রিম মাংস কোনটি থেকে প্রস্তুত করা হয়?

ক) শীতকালীন গম থেকে
খ) বসন্তকালীন গম থেকে
গ) ডিউরাম গম থেকে
ঘ) গমের মিশ্রণ থেকে

১১. গমের দানা কয়টি স্তরে গঠিত?

ক) ৩টি
খ) ৪টি
গ) ৬টি
ঘ) ২টি

১২. শুকনো গমে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কত?

ক) ৩০%
খ) ১২%
গ) ১৪%
ঘ) ১৬%

১৩. গমের উপরের পাতলা আবরণকে কী বলে?

ক) লেয়ার
খ) এন্ডোস্পার্ম
গ) ব্রান
ঘ) জার্ম

১৪. আটায় ব্রানের পরিমাণ বেশি থাকলে কী হয়?

ক) আটার রং হলদে হয়
খ) আটার রং কালচে হয়
গ) আটার রং লালচে হয়
ঘ) আটার রং সাদা হয়

১৫. গমে প্রোটিনের পরিমাণ কত?

ক) ৩-৯০%
খ) ৪০-৭০%
গ) ৬-২০%
ঘ) ৫-২৫%

১৬. গমে উপস্থিত প্রোটিনের নাম কী?

ক) জেলাটিন
খ) ক্যারামেল
গ) গ্লুটেন
ঘ) কোনোটিই নয়

১৭. ময়দার প্রোটিনকে কী বলা হয়?

ক) লাইসিন
খ) গ্লুটেন
গ) মিথিওনিন
ঘ) কোনোটি নয়

১৮. ময়দায় ১% প্রোটিন বাড়লে রুটির আয়তন কত মি.লি. বাড়ে?

ক) ২০-৪০ খ) ৫০-১০০
গ) ৬৭-৯৮ ঘ) ৪০-৭০

১৯. ময়দায় স্টার্চের পরিমাণ কত?

ক) ৭০-৮০% খ) ৫-১৪%
গ) ৫৬-৯০% ঘ) কোনোটি নয়

২০. চোলাইকরণের জন্য দায়ী কী?

ক) অক্সিজেন খ) ব্যাকটেরিয়া
গ) ইস্ট ঘ) সব কটি

২১. রুটি তৈরিতে কী পরিমাণ লবণ ব্যবহার করা হয়?

ক) ৩-৪% খ) ৫-৮%
গ) ১-২% ঘ) ১০-২৩%

২২. রুটি তৈরিতে নিচের কোনটি ব্যবহার করা হয়?

ক) ননিবিহীন গুঁড়ো দুধ খ) ননিযুক্ত গুঁড়ো দুধ
গ) উপরের দুটোই ঘ) কোনোটি নয়

২৩. রুটি তৈরিতে কী পরিমাণে ভিনেগার বা ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়?

ক) ০.৪% খ) ০.২%
গ) ০.১% ঘ) ০.৩%

২৪. রুটি তৈরিতে কি পরিমাণে চিনি ব্যবহার করা হয়?

ক) ৫-৬% খ) ৪-৮%
গ) ১-২% ঘ) ০.৩%

২৫. ময়দায় প্রোটিনের পরিমাণ কত?

ক) ৭-৮% খ) ৮-৯%
গ) ১১-১৬% ঘ) ২-৩%

২৬. পাউরুটিতে হাইড্রোজিনেটেড ফ্যাট হিসেবে কী ব্যবহার করা হয়?

ক) ঘি খ) ডালডা
গ) মার্জারিন ঘ) ব্রোমিনেটেড ভেজিটেবল অয়েল

২৭. পটাশিয়াম ব্রোমেট কী?

ক) জারক দ্রব্য খ) বিজারক দ্রব্য

গ) ছত্রাক প্রতিরোধক ঘ) মোল্ড প্রতিরোধক

২৮. গমের ময়দায় লিপিডের পরিমাণ কত?

ক) ৪-৫% খ) ৮-৯%

গ) ১-২% ঘ) ৩-৪%

২৯. ময়দায় স্টার্চের পরিমাণ কত?

ক) ৫-৬% খ) ৪০-৫০%

গ) ৭০-৮০% ঘ) ৫-৪০%

৩০. গ্লুটেন ঠিকমতো গঠিত না হলে কী হয়?

ক) রং লাল হয়

খ) রং বাদামি হয়

গ) গ্যাস ধারণ করার ক্ষমতা বেড়ে যায়

ঘ) গ্যাস ধারণ করার ক্ষমতা কমে যায়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দানাদার শস্য বলতে কী বোঝায়?

২. ধানের জাতগত পরিচয় প্রদান কর।

৩. পেরিকার্প বলতে কী বোঝায়?

৪. চালে উপস্থিত বিভিন্ন খনিজ উপাদানের নাম লিখ।

৫. ধান ভাঙার প্রবাহ চিত্রটি লিখ।

৬. চালে উপস্থিত প্রোটিন ও ফ্যাটের অবস্থান বর্ণনা কর।

৭. ধানের মিলে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির নাম লিখ।

৮. চালে উপস্থিত বিভিন্ন উপজাত দ্রব্যের নাম লিখ।

৯. গমের উৎপাদন প্রধানত কিসের ওপর নির্ভর করে?

১০. গম কত প্রকার?

১১. গমের উপাদানসমূহ লিপিবদ্ধ কর।

১২. ব্রান কি?

১৩. এন্ডোস্পার্ম বলতে কী বোঝায়?

১৪. গমের প্রোটিনের বিশেষত্ব কী?

১৫. গমের গুণগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

১৬. গম থেকে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর নাম লিখ।

১৭. ময়দার উপাদানগুলো কী কী?
১৮. পাউরুটি প্রস্তুতিতে ঐচ্ছিক উপাদানসমূহ কী কী?
১৯. পাউরুটি তৈরির ধাপগুলো কী কী?
২০. চোলাইকরণের সময়কাল কিসের উপর নির্ভর করে?
২১. ইস্ট সেলের ভূমিকা কী?
২২. রুটি তৈরিতে লবণের ভূমিকা লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ধানের পরিচিতি আলোচনা কর।
২. ধানের মরফোলজি এবং হিসটোলজি চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।
৩. চালে অবস্থিত বিভিন্ন উপাদানের অবস্থান ভিত্তিক বণ্টন আলোচনা কর।
৪. ধানের মিলে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
৫. গমের প্রকারভেদ বিশদভাবে বৈশিষ্ট্যসহ বর্ণনা কর।
৬. চিত্রসহ গমের গঠন বর্ণনা কর।
৭. পাউরুটি প্রস্তুতিতে ঐচ্ছিক উপাদানসমূহের ভূমিকা কী?
৮. পাউরুটি প্রস্তুতিতে ময়দায় বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদানের নাম লিখ।
৯. চোলাইকরণের ফলে রুটিতে কী পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়?
১০. খামিরে তাপ প্রয়োগের ফলে কী কী পরিবর্তন হয়?
১১. রুটি তৈরির ধাপসমূহ প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা কর।
১২. রুটির স্টেলিং বলতে কী বোঝ?

চতুর্থ অধ্যায়
বেকারি ও কনফেকশনারি দ্রব্য

৪.১ বেকারি ও কনফেকশনারি পণ্যের নাম :
নিচে কনফেকশনারি ও বেকারি পণ্যের তালিকা দেওয়া হলো–

কনফেকশনারি পণ্য

১. চকলেট
২. টফি
৩. চুইং গাম
৪. চকোপেস্ট
৫. ক্যান্ডি
৬. ক্যান্ডি বার
৭. জেলি ক্যান্ডি
৮. ললিপপ
৯. মিনটস
১০. ক্র্যাকাজ
১১. ফাজ
১২. সুইস মিল্ক ট্যাবলেট
১৩. মার্শমালো
১৪. লিকারিস ইত্যাদি ।

বেকারি পণ্য

১. বিস্কুট
২. পাউরুটি
৩. কেক
৪. কুকিস
৫. মাফিন
৬. পুডিং
৭. পেস্ট্রি
৮. রোল
৯. ডৌনাটস
১০. চানাচুর ইত্যাদি ।

৪.২ বিস্কুট তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদান :
১. ময়দা
২. চিনি
৩. ফ্যাট
৪. পানি

৪.৩ বিস্কুট তৈরির ঐচ্ছিক উপাদানসমূহ :
১. গ্যাস উৎপাদনকারী দ্রব্য
২. গুঁড়া দুধ
৩. কো-কো পাউডার

৪.৪ উপাদানসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের ব্যবহার :
নিচে বিস্কুট তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের ভৌত এবং রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো-

ময়দা

১. বিস্কুট তৈরির জন্য সাধারণত নরম গমের ময়দা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ৭০-৭২% আহরণকৃত ময়দা বিশেষভাবে উপযোগী।

২. ময়দায় অ্যাশ বা ছাই-এর পরিমাণ ০.৪৫-০.৫৫% হলে ভালো হয়।

৩. প্রোটিনের পরিমাণ–
ক. মিষ্টি বিস্কুট-এর জন্য ৭-৮%
খ. অল্প মিষ্টি বিস্কুট-এর জন্য ৮-৯%
গ. নোনতা বিস্কুট-এর জন্য ৯-১১%

৪. কেল্ট জোনস কালার ৩-৪%

৫. জলীয় কণার পরিমাণ ১৫% এর বেশি নয়

৬. সেডিমেন্টেশান ভ্যালু
ক. মিষ্টি বিস্কুট-এর জন্য ২০ এর কম
খ. অল্প মিষ্টি বিস্কুট-এর জন্য ২০-৪০
গ. নোনতা বিস্কুট-এর জন্য ৪০-এর উপর

চিনি

ক. দানাদার চিনি ৬-৩০ মেশ	(Mesh Number)
খ. কাস্টর চিনি ৩০-৮০ মেশ	”
গ. গুঁড়া চিনি ৮০-১২০ মেশ	”
ঘ. আইসিং চিনি ১২০ এর বেশি	”

এছাড়া মধু, গ্লুকোজ, মল্টোজ, গোলডেস সিরাপ, ইনভার্ট সিরাপ, গ্লুকোজ সিরাপ ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

ফ্যাট

১. বিস্কুটের খামির নরম ও সহজে বেলা যায় এমন করার জন্য ফ্যাট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাছাড়া ফ্যাট বিস্কুটকে সুস্বাদু করে।
২. ফ্যাটের ওয়ার্কিং তাপমাত্রা ৩৮-৪০° সে. এর মাঝে হওয়া উচিত।
৩. ফ্যাট দানাবিহীন পেস্টের ন্যায় হওয়া উচিত।

লবণ : চিকন দানার বিশুদ্ধ লবণ হলে ভালো হয়।

পানি : মৃদু পানি উত্তম।

গ্যাস উৎপাদনকারী রাসায়নিক দ্রব্য

অম্লীয় দ্রব্য + ক্ষারীয় দ্রব্য → $CO_2 + H_2O$ + লবণ

↓ (অম্লীয় দ্রব্য) ↘ (ক্ষারীয় দ্রব্য)

অ্যাসিড ক্যালসিয়াম ফসফেট — সোডিয়াম বাই কার্বোনেট ($NaHCO_3$)

ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট

টারটারিক অ্যাসিড

সাইট্রিক অ্যাসিড

এ.এস.পি.পি

সি.ও.টি

ক্রিম অব টারটার ইত্যাদি

এছাড়া অ্যামোনিয়াম বাই কার্বোনেট এবং অ্যামোনিয়াম কার্বোনেটও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো ব্যবহারের বড় সুবিধা হলো এক্ষেত্রে কোনো প্রকার অবশেষ থাকে না।

১. $NH_4HCO_3 \xrightarrow{\text{তাপ}} NH_3 + H_2O + CO_2$

২. $(NH_4)_2CO_3 \xrightarrow{\text{তাপ}} 2NH_3 + H_2O + CO_2$

গুঁড়া দুধ : সুস্বাদু ও মিষ্টি গন্ধ তৈরি করে। পুষ্টিমান উন্নয়ন করে।

ইমালসিফাইয়ার : ফ্যাট এবং পানির ইমালশন করার জন্য G.M.S গ্লিসারল মনো-স্টিয়ারেট এবং সয়া লেসিথিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সুগন্ধি দ্রব্য : সুগন্ধি হিসেবে নিম্নলিখিত দ্রব্য ব্যবহার করা যায়,

১. কো-কো পাউডার
২. ভেনিলা ফ্লেভার
৩. মিল্ক ফ্লেভার
৪. মিশ্র মশলার ফ্লেভার
৫. বাটার ফ্লেভার
৬. কো- কো ফ্লেভার

এন্টি-অক্সিডেন্ট

ফ্যাট যাতে র‌্যানসিড না হয় সেজন্য এন্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে BHA, BHT, PG ফ্যাটের সাথে ০.১% হিসেবে যোগ করা হয়। তেল বা চর্বি রেখে দিলে কিছুদিন পর তাতে খারাপ গন্ধের সৃষ্টি হয় এবং খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে। তেলের এই পরিবর্তনকে রেনসিডিটি বলে। এ প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত কারণে দ্রুততর হয় :

১. অক্সিজেনের উপস্থিতির পরিমাণ
২. লিপিডের অসম্পৃক্ততা
৩. প্রো-অক্সিডেন্টের উপস্থিতি
৪. তামা, আলো ও তাপমাত্রার প্রভাব।

স্টার্চ

ভুট্টার স্টার্চ ২০% পর্যন্ত যোগ করা হয়ে থাকে। এতে করে ময়দা তরল হয় এবং বিস্কুট খেতে মচমচে হয়।

৪.৫ বিস্কুট তৈরির বিভিন্ন ধাপ :

আমাদের দেশে বিস্কুট প্রস্তুত মেশিনারি ও ইট নির্মিত উভয় প্রকার চুলাতেই হয়ে থাকে। আজকাল দেশে মেশিনারিতে আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতমানের বিস্কুট প্রস্তুত করা হচ্ছে। নিচে বিস্কুট তৈরির সাধারণ ফর্মুলা এবং পদ্ধতি বর্ণিত হলো :

উপাদান	পরিমাণ
গমের ময়দা	৩২০ গ্রাম
চিনি (পাউডার)	১৫০ গ্রাম
দুধ (পাউডার)	৫ গ্রাম
অথবা তরল দুধ	১৫ মি.লি.
ঘি	১০ গ্রাম
ডিম	২ টি
খাবার লবণ	২ গ্রাম
বেকিং পাউডার	৩ গ্রাম
ভেনিলা	০.৫ মি.লি.
অরেঞ্জ অয়েল	২.৪ মি.লি.

প্রস্তুত প্রণালি :

ময়দা,লবণ, দুধ ও বেকিং পাউডারের মিশ্রণ প্রস্তুতকরণ

↓

ভেনিলা, অরেঞ্জ অয়েল, ডিম, ঘি মিশ্রণ

↓

প্রস্তুতকরণ (২ মিনিট)

↓

খামির ১৫ মিনিট রেখে দিতে হবে

↓
ঘূর্ণায়মান যন্ত্র দ্বারা চাপ প্রয়োগ (৩ মি.মি পুরুত্ব)
↓
নির্দিষ্ট সাইজে বিস্কুট কর্তন
↓
ট্রেতে বিস্কুট স্থাপন (১৫ মিনিট)
↓
ডিম, দুধ বা চর্বির প্রলেপ প্রদান
↓
হালকা বাদামি বর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাপ প্রদান (২০৪° সে. ১০ মিনিট)
↓
কক্ষ তাপমাত্রায় শীতলীকরণ
↓
প্যাকেজিং

৪.৬ মিষ্টি বিস্কুটের প্রস্তুতপ্রণালি

উপকরণ	পরিমাণ (গ্রাম)
ময়দা	৫০০
চিনির পাউডার	১৬০
ফ্যাট	১২৫
ননী ছাড়া গুঁড়া দুধ	১০
গ্লুকোজ সিরাপ	১০
লবণ	৫
অ্যামোনিয়াম বাই কার্বোনেট	৫
সোডিয়াম বাই কার্বোনেট	১
বেকিং পাউডার	৫
অ্যাসিড ক্যালসিয়াম ফসফেট (ACP)	৫
ভেনিলা ফ্লেভার	৫
বাটার ফ্লেভার	৫
পানি	৫০
লেসিথিন	২
সোডিয়াম মেটা ফসফেট (SMP)	১
কালার	প্রয়োজনমতো

প্রস্তুত প্রণালি

১. ফ্যাট ভালো করে ফেটে তাতে চিনির পাউডার, গুঁড়া দুধ, গ্লুকোজ সিরাপ, ফ্লেভার, লেসিথিন ধীরে ধীরে যোগ করে হভার্ড মিক্সারের সাহায্যে তিন মিনিট ধরে মেশানো হয়। এই কাজটি চামচের মাধ্যমে করা যেতে পারে।
২. এরপর লবণ, অ্যামেনিয়াম বাই কার্বোনেট, সোডিয়াম বাই কার্বোনেট পানিতে গুলে উপরের মিশ্রণের (১ নং ধাপ) সাথে যোগ করে পুনরায় তিন মিনিট ধরে মেশানো হয়।
৩. ACP, SMP পানিতে গুলে ক্রিমের সাথে যোগ করা হয়।
৪. এরপর ময়দা এবং বেকিং পাউডার একসাথে চালনির সাহায্যে পর পর তিনবার চেলে উপরের মিশ্রণের (২ নং ধাপ) সাথে যোগ করে ভালোভাবে মেশানো হয় যতক্ষণ পর্যন্ত খামির তুলার মতো নরম না হয়।
৫. এরপর খামির দিয়ে ২ মি.মি. পুরু শিট প্রস্তুত করা হয় এবং তা কেটে অথবা ছাঁচের সাহায্যে বিস্কুটের আকার ধারণ করার পর ট্রের উপর রেখে ওভেনে ২০৪° সে. তাপমাত্রায় ৬-৭ মিনিট বেক করার পর ঠান্ডা করা হয়।

প্যাকেজিং : বর্তমানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লেমিনেটেড অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দ্বারা প্যাকেট করা হয়।

৪.৭ স্পঞ্জ ও খামির পদ্ধতিতে নোনতা বিস্কুট প্রস্তুতকরণ

নোনতা বিস্কুটের উপকরণ :

উপকরণ	**পরিমাণ (গ্রাম)**
ময়দা	১০০
ফ্যাট	১০
চিনি	৫
লবণ	৬
HCO_3	০.৪
$(NH_3)_2CO_3$	০.২
ফ্লেভার	০.১

এক্ষেত্রে নির্ধারিত ময়দার ৭০% এর সাথে ইস্ট এবং পানি মিশিয়ে তিন মিনিট মেশানোর পর চোলাইকরণের জন্য ১২-১৮ ঘণ্টা রেখে দেওয়া হয়। এরপর বাকি ময়দায় লবণ এবং ফ্যাট ঐ চোলাইকৃত খামিরের সাথে পুনরায় মেশানো হয়। এই মিশ্রিত খামিরকে স্পঞ্জ এবং এই পদ্ধতিকে স্পঞ্জ এবং খামির পদ্ধতি বলে।

এই খামির থেকে বিস্কুট তৈরি করে পূর্বের ন্যায় বেকিং, কুলিং এবং প্যাকেজিং করা হয়।

৪.৮ কেক প্রস্তুতকরণ

চিনি ও ময়দার অনুপাতের ওপর ভিত্তি করে কেককে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. উচ্চ আনুপাতিক কেক (High Ratio Cake) : এই জাতীয় কেকে ময়দার চেয়ে চিনির পরিমাণ বেশি থাকে। অর্থাৎ ময়দা ১০০ ভাগ হলে চিনি থাকে ১১৫-১৬০ ভাগ।

২. নিম্ন আনুপাতিক কেক (Low Ration Cake) : এক্ষেত্রে চিনির পরিমাণ ময়দার সমান অথবা তার চেয়ে কম থাকে।
৩. মূল্যবান কেক (Rich Cake) : এক্ষেত্রে ফ্যাটের পরিমাণ থাকে ৭০%।
৪. কম ফ্যাটের কেক (Lean Cake) : এক্ষেত্রে ফ্যাটের পরিমাণ থাকে ৩০-৫০%।

কেকের প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. ময়দা
২. ডিম
৩. চিনি
৪. ফ্যাট
৫. পানি এবং
৬. স্টার্চ

ঐচ্ছিক উপকরণ

১. বেকিং পাউডার
২. দুধ
৩. ফল
৪. নাটস (বাদাম)
৫. কালার
৬. ইমপ্রুভার
৭. ফ্লেভার ইত্যাদি।

এ সমস্ত উপাদানের ভিতর ময়দা, ডিম ও দুধকে বলা হয় গাঠনিক উপাদান (Structure Bilders), চিনি, ফ্যাট এবং বেকিং পাউডারকে বলা হয় কোমলকারক (Tendiriser) এবং ডিম, দুধ ও পানিকে বলা হয় আর্দ্রকারক (moisteners)।

ময়দা

কেকের নরম ময়দা বা কম গ্লুটেনসমৃদ্ধ ময়দা বিশেষ উপযোগী। এতে প্রোটিনের পরিমাণ থাকা দরকার ৭-৮%।

চিনি

১. গ্লুটেনকে নরম করে।
২. কেককে মিষ্টি করে।
৩. দীর্ঘ সময় ধরে সিক্ত রাখে।
৪. ক্রিম মিক্সিং-এর সময় বাতাস গ্রহণে সহায়তা করে।

সাধারণত চিকন দানার (৩০-৮০ মেশ) সুগার ব্যবহার করা হয়।

ডিম

১. গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।
২. আর্দ্রতা রক্ষা করে।
৩. বাতাস গ্রহণ করে।
৪. প্রোটিনের পরিমাণ বাড়ায়।
৫. ফ্যাটকে ধরে রাখে।
৬. কেকের রং এবং ফ্লেভার বৃদ্ধি করে।

ফ্যাট

১. কেককে নরম করে।
২. সুস্বাদু করে।
৩. বাতাস গ্রহণ করে।
৪. স্বাদ ও গন্ধ বৃদ্ধি করে।
৫. আর্দ্রতা বজায় রাখে।

স্টার্চ : ভুট্টার স্টার্চ ময়দাকে তরল রাখে।

পানি

১. গ্লুটেন গঠন করে।
২. ডিম, দুধ ও ফ্যাট দ্বারা প্রস্তুত বাটারের গাঢ়ত্ব ঠিক রাখে।

লবণ

১. স্বাদ বৃদ্ধি করে।
২. গ্লুটেন গঠনে সহায়তা করে।

দুধ

১. গাঠনিক কাঠামো তৈরি করে।
২. আর্দ্রতা বজায় রাখে।
৩. প্রোটিনের মান বৃদ্ধি করে।
৪. রং ও গন্ধ বাড়ায়।

ফল : ফল কেকের স্বাদ ও গন্ধ বাড়ায়। নিম্নলিখিত ফলসমূহ বা ফলের মোরব্বা ফ্রুটস কেকে যোগ করা যেতে পারে।

১. কিশমিশ
২. খেজুর
৩. ফলের বা চালকুমড়ার মোরব্বা
৪. চিনা বাদাম
৫. পেস্তা
৬. ফলের খোসার মোরব্বা।

সুগারবাটার পদ্ধতিতে কেক প্রস্তুতকরণ :

সুগারবাটার পদ্ধতি : এক্ষেত্রে ফ্যাট ও চিনির পাউডার একসাথে ভালো করে ফেটে প্রথমে ক্রিম প্রস্তুত করা হয় এবং প্রাপ্ত ক্রিমের সাথে অন্যান্য উপাদান একে একে অল্প অল্প করে মিশিয়ে যে খামির পাওয়া যায় তাকে সুগার বাটার বা ক্রিম বাটার বলা হয় এবং এ পদ্ধতিটিকে সুগার বাটার পদ্ধতি বলা হয়।

উপকরণ

নাম	উচ্চ চিনি কেক	উচ্চ তরল কেক	উচ্চ চিনি, উচ্চ তরল কেক
ময়দা	১০০	১০০	১০০
ফ্যাট	৬০	৬০	৬০
চিনি	১০০	৬০	১৩০
ডিম	৭৫	৯০	৯০
দুধ	৩৫	৪০	৬০
বেকিং পাউডার	১.২৫	১.২৫	১.২৫
ফ্লেভার	০.২	০.২	০.২
ফুড কালার	প্রয়োজনমতো	প্রয়োজনমতো	প্রয়োজনমতো

প্রস্তুত প্রণালি

১. বেকিং পাউডার এবং ময়দা ভালো করে চালনি দ্বারা চেলে মেশানো হয়।
২. ফ্যাট এবং চিনির ক্রিম প্রস্তুত করতে হবে। ক্রিম তৈরির সময় ফ্যাটের মাঝে অল্প অল্প করে চিনি যোগ করে ক্রিম বানাতে হবে।
৩. বিটারের মাধ্যমে ডিম পৃথকভাবে ফেটে নিতে হবে। ডিমের সাদা অংশ দ্বারা ঘন এবং হলুদ অংশ দ্বারা পাতলা বাটার গঠিত হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ ডিমেও ব্যবহার করা যায়। এ সময় ডিমের সাথে ফ্লেভার এবং কালার যোগ করতে হবে।
৪. এবার ফেটা ডিম অল্প অল্প করে ক্রিম বা বাটারের সাথে মেশাতে হবে।
৫. বাটারের সাথে আস্তে আস্তে ৩/৪ ভাগ ময়দা মিশ্রিত করতে হয় যতক্ষণ না স্থায়ী খামির গঠিত হয়। এক্ষেত্রে মিশ্রণ ধীর গতিতে করতে হবে, যাতে কম পরিমাণে গ্লুটেন গঠিত হয় এবং মিশ্রণ না ভাঙে এবং ছাড়া ছাড়া না হয়ে যায়।
৬. যদি ফল এবং বাদাম থাকে তবে তা এক মিনিটের মাঝে দ্রুত মেশাতে হবে।
৭. পরিমাণমতো বাটার ভাগ করে ফ্যাট মিশানো পাত্রে পরিষ্কার কাগজের উপর ঢেলে দিতে হবে এবং তৎক্ষণাৎ ওভেনে বেক করতে হবে। কাজটি দ্রুত না করলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বের হয়ে যাবে এবং কেক ঠিকমতো ফুলবে না।
৮. বেকিং মাত্রা নির্ভর করে
ক. কেকের মূল্যমানের ওপর
খ. আকার এবং অম্লত্বের ওপর
গ. বাটারে উপস্থিত জলীয় কণার পরিমাণের ওপর।

দামি কেক অথবা উচ্চ আনুপাতিক কেক সাধারণত বেক করা হয় ১৬০-১৭০° সে. তাপমাত্রায় ২০-৬০ মিনিট। নিম্ন আনুপাতিক কেক বেক করা হয় ১৯০-২০৪° সে. তাপমাত্রায় ২৫-৩০ মিনিট। কেকের মাঝে কাঠি প্রবেশ করালে যদি তাতে বাটার না লাগে তাহলে বুঝতে হবে কেক ঠিকমতো বেক হয়েছে।

৪.৯ পাউরুটি প্রস্তুতপ্রণালি

পাউরুটি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

ক. ময়দা, খ. পানি, গ. ইস্ট, ঘ. লবণ

ঐচ্ছিক উপাদান

ক. চিনি

খ. চর্বি ও তেল

গ. মল্ট ময়দা (Malt Flour)

ঘ. গুঁড়া দুধ (Milk Flour)

ঙ. জারক, যেমন পটাশিয়াম ব্রোমেট অথবা পটাশিয়াম আয়োডেট

চ. মিনারেল ইস্ট ফিড (mineral yeast feed), যেমন অ্যামোনিয়াম বাই-সালফেট, এসিড ক্যালসিয়াম সালফেট

ছ. ওয়াটার কন্ডিশনার (water conditioner), ক্যালসিয়াম ফসফেট

জ. মোল্ড ও রোপ প্রতিরোধক (anti-mold & anti-rope agents), মোল্ড প্রতিরোধক- সোডিয়াম বা ক্যালসিয়াম প্রোপায়োনেট

রোগ প্রতিরোধক : অ্যাসিটিক অ্যাসিড, অ্যাসিড ক্যালসিয়াম ফসফেট (এসিপি), ক্যালসিয়াম ডাই-অ্যাসিটেট, জি.এম.এস (গ্লিসারল মনো-স্টিয়ারেট)

উপকরণ	পরিমাণ
ময়দা	১০০ কেজি
পানি	পরিমাণমতো
ইস্ট (*Saccharomycetes cerevisiae*)	২-৫ কেজি
লবণ	১ কেজি
চিনি	২-৮ কেজি
গুঁড়া দুধ	২ কেজি
অথবা তরল দুধ	১০ কেজি
ডিম	২০-৪০ টি
সয়াবিন তেল	২ কেজি
পটাশিয়াম ব্রোমেট বা পটাশিয়াম অ্যায়োডেট	১০০ গ্রাম
সোডিয়াম বা ক্যালসিয়াম প্রোপায়োনেট	১০০ গ্রাম
অ্যাসিটিক অ্যাসিড	৫০০ মি.লি.-১ লিটার

প্রস্তুত প্রণালি

১. **চালুনিতে ছাঁকা :** চালুনিতে নিম্নোক্ত কারণে ময়দা ছাঁকা হয়
   - অবাঞ্ছিত পদার্থ দূর করতে।
   - ময়দায় বায়ু প্রবাহিত করতে।

২. **ওজন নেওয়া :** সব উপাদানসমূহ আলাদা আলাদাভাবে মেপে নেওয়া হয়।

৩. **মেশানো :** একটা মিক্সিং মেশিনে/পাত্রে সবগুলো উপাদান ভালোভাবে মেশানো হয়। মিশ্রণটি বেশি শক্তও হবে না, আবার বেশি পাতলাও হবে না। মেশানোর অনুমোদিত সময় হচ্ছে ৩ মিনিট।

৪. **ফারমেন্টেশন :** মিশ্রণ (dough) ফারমেন্টেশন চেম্বারে ২৮-২৯° সে. তাপমাত্রায় ২ ঘণ্টা রাখা হয়। এ সময় বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, চিনির উপর ইস্টের ক্রিয়া অর্থাৎ

$$\text{চিনি} \xrightarrow[\text{(জাইমেস)}]{\text{ইস্ট}} \text{কার্বন-ডাই-অক্সাইড } (CO_2) + \text{অ্যালকোহল}$$

এই CO_2 উৎপন্ন হওয়াতে মিশ্রণটি ফুলে ওঠে।

৫. **নক-ব্যাক :** ফুলে ওঠা মিশ্রণের উপর বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ (হাত দিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে) করতে হয় যাতে মিশ্রণ থেকে CO_2 দূরীভূত হয়। চাপ প্রয়োগ করতে হয় কয়েকবার।

৬. **মধ্যবর্তীকালীন প্রুফ :** নক-ব্যাকের পর প্রায় ২৫ মিনিট কাল এভাবে রেখে দিতে হয়।

৭. **মল্ডিং :** আবার গ্যাস (CO_2) চাপ প্রয়োগে বের করা হয় এবং পাকানো হয়। প্রেসার বোর্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতে হয়। তারপর মোল্ডের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাপে রাখতে হয়।

৮. **চূড়ান্ত প্রুফ :** মোল্ডে ভর্তি করার পর ৩২° সে. তাপমাত্রায় এবং ৮০% আর্দ্রতায় প্রায় ৫৫ মিনিট রাখতে হয়। এ সময়ে মিশ্রণ টুকরাগুলো পরিপূর্ণ পাউরুটির আকার ধারণ করে।

৯. **বেকিং :** চুল্লিতে ২৩২° সে. তাপমাত্রায় ২৫ মিনিট রাখা হয়। এ সময়ে পাউরুটি তৈরি সম্পন্ন হয়। বেশ কিছু পরিবর্তন এ ধাপে সম্পন্ন হয়। তাপমাত্রা ৫৪° সে.-এর উপর থাকায় ইস্টের কার্যকলাপ নষ্ট হয়ে যায় এবং তাপমাত্রা ৭৭° সে.-এর উপর থাকায় (α- এমাইলেজ ও β- এমাইলেজ) এনজাইমের কার্যকলাপ নষ্ট হয়ে যায়।

১০. **ঠান্ডা করা :** কক্ষ তাপমাত্রায় পাউরুটি ঠান্ডা করা হয়।

১১. **টুকরাকরণ :** চাকু বা ছুরি দিয়ে ছোট ছোট টুকরা করা হয়।

১২. **মোড়কে ভর্তিকরণ :** টুকরা করা পাউরুটি পলিথিনের কাগজের মোড়কে ভর্তি করে সিল করা হয়।

৪.১০ চকলেট টফি (লজেন্স টাইপ) উৎপাদন প্রক্রিয়া

উপকরণ	পরিমাণ
চিনি	৭০০ গ্রাম
তরল গ্লুকোজ	৫০০ গ্রাম
সাইট্রিক অ্যাসিড	১০ গ্রাম
কালার	প্রয়োজনমতো
ফ্লেভার (লেমন, পাইন অ্যাপল, অরেঞ্জ, ম্যাংগো)	২-৩ মিলিলিটার
পানি	২৮০ মিলিলিটার

প্রস্তুতপ্রণালী

ক. চিনি ও পানি একত্রে মেশাতে হয়।

খ. উপরোক্ত মিশ্রণ কিছুক্ষণ ফুটার পর তরল গ্লুকোজ যোগ করতে হয়।

গ. মিশ্রণ ফুটতে ফুটতে যখন তাপমাত্রা ১৬০° সে. হবে তখন স্টেইন লেস স্টিলের তৈরি টেবিলে ঢালতে হয়। এ সময় কাপের পানিতে দু-এক ফোঁটা নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে মিশ্রণ সম্পূর্ণ জমে যাচ্ছে।

ঘ. এরপর ফ্লেভার, কালার ও সাইট্রিক অ্যাসিড যোগ করা হয় এবং খুব ভালোভাবে ঢেলে মেশাতে হয়।

ঙ. টফি কাটার দিয়ে চকলেট টফি কাটতে হয়।

চ. আলাদা আলাদাভাবে চকলেট টফি কাগজে মোড়াতে হয়।

ছ. প্রয়োজনীয় সংখ্যায় বা ওজনে প্যাকিং করতে হয়।

চকলেট টফি (লজেন্স টাইপ) তৈরির পদ্ধতি ছকের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো।

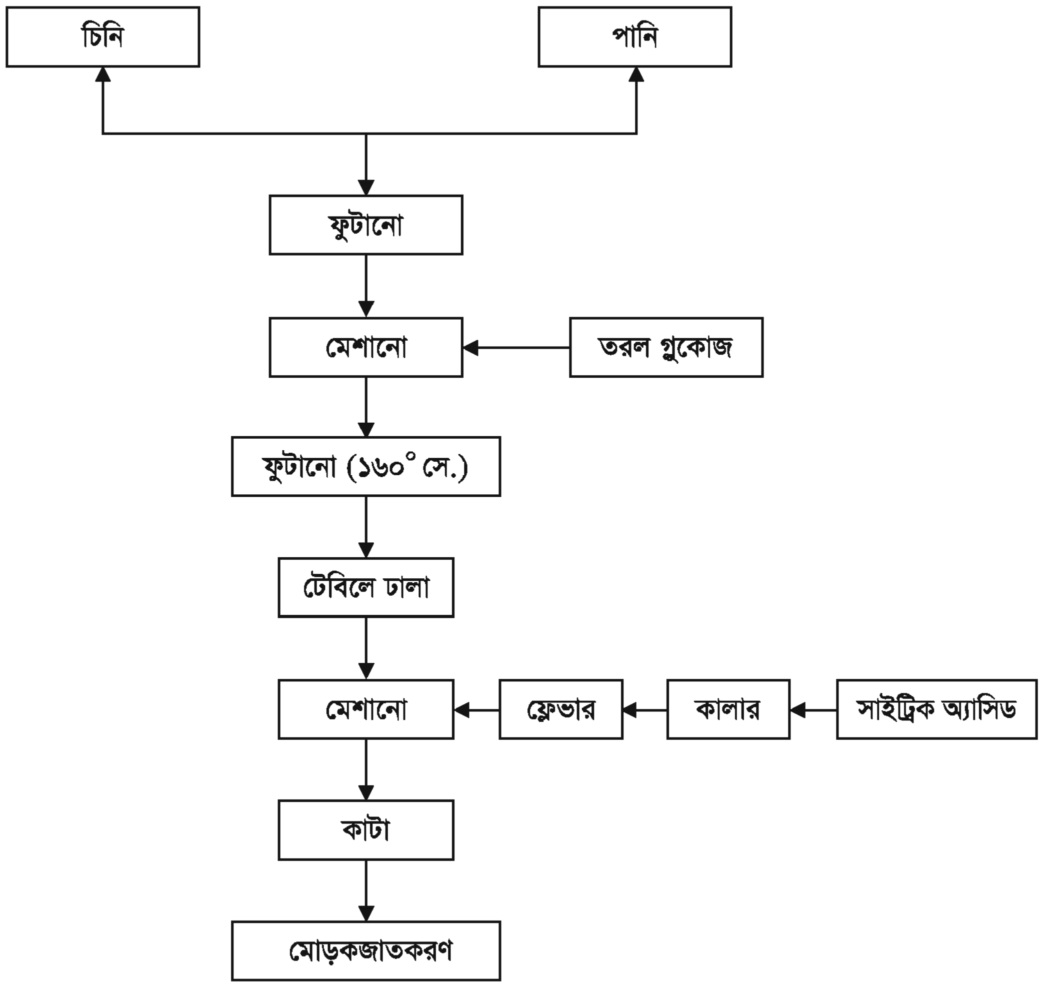

প্রবাহ চিত্র : চকলেট টফি তৈরি

৪.১১ ক্যান্ডি উৎপাদন প্রক্রিয়া

ক্যান্ডি প্রস্তুতকরণে সাধারণত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, যথা- সিরাপের টিএসএস অপরিবর্তনীয় রেখে এবং সিরাপের টিএসএস পরিবর্তন করে।

সিরাপের টিএসএস অপরিবর্তনীয় রেখে ক্যান্ডি প্রস্তুতকরণের ধাপ-

১. **নির্বাচন :** পরিপক্ব, সতেজ ও অণুজীব বা অসুখমুক্ত ফল ও সবজি বেছে নেওয়া হয়।

২. **ধৌতকরণ :** পরিষ্কার পানিতে ভালোভাবে ধোয়ে নিতে হয়।

৩. **খোসা ছাড়ানো ও প্রস্তুতকরণ :** ফল বা সবজির বাইরের আবরণ অপসারণ করা হয় এবং ১/৪–১/২ ইঞ্চি পরিমাণে ছোট ছোট টুকরায় কাটা হয়।

৪. **সালফার ও লবণ প্রয়োগ :** ১/২ মিলিগ্রাম কেএমএস ১ লিটার পানিতে গুলিয়ে নিতে হয় এবং এতে ২% লবণ যোগ করা হয়। এই দ্রবণে ফলের টুকরাগুলো প্রায় ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয় এবং তারপর দ্রবণ থেকে ফলগুলো বের করে নেওয়া হয়।

৫. **ব্লাঞ্চিং :** টুকরাগুলো ফুটন্ত পানিতে প্রায় ১০ মিনিট এমনভাবে রাখা হয় যাতে টুকরাগুলো কিছুটা নরম হয়। এরপর এদেরকে ঠান্ডা পানিতে রাখা হয়।

৬. **বিচ্ছিদ্রকরণ :** কাঁটা চামচ দিয়ে চারদিকে সমানভাবে ছিদ্র করা হয়।

৭. **চিনির দ্রবণ প্রস্তুতকরণ :** পানিতে চিনি ও সাইট্রিক অ্যাসিড যোগ করে গুলিয়ে ৬৫% টিএসএস-এর দ্রবণ তৈরি করা হয়। বেশি টকযুক্ত ফলে অ্যাসিড যোগ করার প্রয়োজন নেই। অনুপাত হচ্ছে- চিনি ৬৫%; অ্যাসিড ০.২৫%; পানি ৩৪.৭৫%।

৮. **সিরাপে ডুবানো :** টুকরাগুলো চিনির দ্রবণে ডুবানো হয় এবং অল্পসময় তাপ দেওয়া হয়। তারপর এক রাত দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা হয়। এ সময়ে দ্রবণ থেকে চিনি আস্তে আস্তে ফলের মধ্যে অভিস্রবণ পদ্ধতিতে প্রবেশ করতে থাকে এবং ফলের ভেতর থেকে পানি বের হয়ে দ্রবণের ঘনত্বকে কমিয়ে দেয়। এরপর দ্রবণ থেকে ফলের টুকরাগুলো বের করে রাখা হয় এবং দ্রবণকে তাপ দিয়ে ৬৫% টিএসএস পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। ফলের টুকরাগুলো আবার এতে ডুবিয়ে রেখে আরও এক রাত রাখা হয়। পরে দেখা যাবে, দ্রবণের ঘনত্ব আবার কিছুটা কমেছে। ফলের টুকরাগুলো আবার বের করা হয় এবং দ্রবণকে তাপ দিয়ে দ্রবণের ঘনমাত্রা ৬৫% আনা হয়। তারপর আবার ফলের টুকরোগুলো এতে ডুবিয়ে রাখা হয়। পরের দিন ফলের টুকরাগুলো দ্রবণ থেকে বের করে এনে ট্রেতে সাজানো হয় এবং ড্রায়ারের মধ্যে রাখা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না ভালোমতো শুষ্ক হয় ততক্ষণ পর্যন্ত টুকরাগুলো ড্রায়ারের মধ্যে থাকে। সাধারণত বিশুষ্কীকরণ সম্পূর্ণ হতে প্রায় ১০-১২ ঘণ্টা সময় লাগে। ২য় বা ৩য় দিনে দ্রবণ কম পড়লে ৬৫% এর দ্রবণ আগের নিয়মে বানিয়ে এতে যোগ করা যেতে পারে।

প্যাকেজিং: ড্রায়ারে শুষ্ককৃত টুকরাগুলো বের করে পলিথিন ব্যাগে সিল করে রাখতে হয়। পলিথিন ব্যাগের পরিবর্তে কাচের বোতলেও রাখা যেতে পারে।

সিরাপের টিএসএস পরিবর্তন করে ক্যান্ডি প্রস্তুতকরণ :
প্রথমোক্ত পদ্ধতির প্রায় সব কটি ধাপই ঠিক থাকে। এখানে শুধু চিনির দ্রবণের ক্ষেত্রে প্রথমে কম টিএসএস বজায় রাখা হয় এবং আস্তে আস্তে দ্রবণের টিএসএস বাড়ানো হয়। যেমন প্রথম দিনে দ্রবণের টিএসএস ২০%-এ রাখা হয়। দ্বিতীয় দিন টিএসএস ৪০% পর্যন্ত বাড়ানো হয় এবং তৃতীয় দিন টিএসএস ৬৫% করা হয়।

বিঃ দ্রঃ যদি রিফ্র্যাক্টোমিটার না থাকে তবে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ২য় ও ৩য় দিনে চিনির দ্রবণের ঘনমাত্রা চোখের আন্দাজে ১ম দিনের মতো রাখতে হয়।

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি বেকারি পণ্য?
ক. বিস্কুট — খ. পাউরুটি
গ. কেক — ঘ. উপরের সব কটি

২. বিস্কুট প্রস্তুতির জন্য কোন ময়দা ভালো?
ক. ৪০-৭০% আহরণকৃত — খ. ৮০-৮৫% আহরণকৃত
গ. ৫০-৭০% আহরণকৃত — ঘ. ৭০-৭২% আহরণকৃত

৩. মিষ্টি বিস্কুটের জন্য ময়দায় প্রয়োজনীয় প্রোটিনের পরিমাণ কত?
ক. ৮-৯% — খ. ৭-৮%
গ. ৫-৬% — ঘ. ৩-৪%

৪. ফ্যাটের ওয়ার্কিং তাপমাত্রা কত হওয়া উচিত?
ক. ৪০-৪৮° সে. — খ. ৩৮-৪০° সে.
গ. ৩০-৭০° সে. — ঘ. ৫০-৬০° সে.

৫. বিস্কুট প্রস্তুতির জন্য কেমন পানি উত্তম?
ক. মৃদু পানি — খ. ক্ষারীয় পানি
গ. অম্লীয় পানি — ঘ. মিষ্টি পানি

৬. কেক কত প্রকার?
ক. ১ — খ. ২
গ. ৪ — ঘ. ৬

৭. বিস্কুট কত প্রকার?
ক. ১ — খ. ২
গ. ৩ — ঘ. ৪

৮. কেক তৈরির জন্য কোন ধরনের চিনি ব্যবহার করা হয়?
ক. ৪০-৮৫ মেশ — খ. ৩০-৮০ মেশ
গ. ৬৭-৯০ মেশ — ঘ. কোনোটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বেকারি ও কনফেকশনারি পণ্যের নাম লিখ।
২. বিস্কুট তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কী কী?
৩. বিস্কুট তৈরির ঐচ্ছিক উপাদানসমূহ কী কী?
৪. চিনির বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
৫. বিস্কুট তৈরিতে কী সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে?
৬. কেক কত প্রকার?
৭. কেকের প্রয়োজনীয় উপাদান কী কী?
৮. কেকের ঐচ্ছিক উপাদানসমূহ কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পাউরুটির প্রস্তুতপ্রণালি বর্ণনা কর।
২. লজেন্স প্রস্তুতপ্রণালি বর্ণনা কর।
৩. ক্যান্ডি প্রস্তুতপ্রণালি বর্ণনা কর।
৪. বিস্কুট তৈরিতে ব্যবহৃত ময়দার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।
৫. গ্যাস উৎপাদনকারী রাসায়নিক দ্রব্য সম্পর্কে লিখ।
৬. বিস্কুট তৈরির বিভিন্ন ধাপ প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা কর।
৭. মিষ্টি বিস্কুটের উপাদান ও প্রস্তুতপ্রণালি বর্ণনা কর।
৮. নোনতা বিস্কুটের উপাদানসমূহ কী কী?
৯. সুগারবাটার পদ্ধতিতে কেকের প্রস্তুতপ্রণালি বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়
তেলবীজ

৫.১ উদ্ভিজ্জ তেল :

নানা রকম উদ্ভিজ্জ বীজ থেকে যে তেল পাওয়া যায় তাকে উদ্ভিজ্জ তেল বা ভেজিটেবল অয়েল বলে। যেমন–

১. বাবাসু তেল (Babasu Oil)
২. নারকেল তেল (Coconut Oil)
৩. তুলাবীজের তেল (Cotton seed Oil)
৪. ভুট্টার তেল (Corn Oil)
৫. চিনাবাদামের তেল (Ground Nut Oil)
৬. সূর্যমুখী ফুলের তেল (Sunflower Oil)
৭. সয়াবিন তেল (Soybean Oil)
৮. সরিষার তেল (Rape seed Oil)
৯. ধানের কুঁড়ার তেল (Rice Bran Oil)
১০. তিলের তেল (Sesame Oil)
১১. জলপাই তেল (Olive Oil)
১২. পাম তেল (Palm Oil)

৫.২ প্রাণিজ তেল

১. মাছের তেল
২. বাটার
৩. লার্ড
৪. ট্যাল্লো ইত্যাদি।

৫.৩ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত তেলের উৎস এবং ব্যবহার

বাবাসু তেল

ব্রাজিলে বাবাসু পাম নামে এক ধরনের গাছ আছে। এর বীজ থেকে যে তেল উৎপন্ন হয় তাকে বাবাসু তেল বলে। এই তেল অনেকটা নারকেল তেলের মত। কিন্তু এর গলনাঙ্ক কম এবং অনেক বেশি অসম্পৃক্ত। এর বীজ থেকে ৬৩-৬৮% তেল পাওয়া যায়। এটা খাওয়ার যোগ্য।

নারকেল তেল

পাকা নারকেলের শুষ্ক শাঁস থেকে যে তেল উৎপন্ন হয় তাকে নারকেল তেল বলে। নারকেল গাছ প্রধানত উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এর শুষ্ক শাঁসে ৬০-৬৮% তেল পাওয়া যায়। এই তেল প্রধানত রান্নার কাজে এবং বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়। যেমন–

১. মার্জারিন
২. সাবান
৩. প্রসাধন দ্রব্য এবং
৪. কৃত্রিম ডিটারজেন্ট।

এই তেলে প্রচুর পরিমাণে লরিক অ্যাসিড আছে। এর গলনাঙ্ক ২৬° সে.।

তুলাবীজের তেল

তুলাবীজে ১৫-২৫% তেল পাওয়া যায়। তবে খোসা ছাড়ানো অবস্থায় ৩০-৩৮% তেল থাকে। এর একটি তীব্র গন্ধ আছে এবং এটি দেখতে লাল রঙের মতো দেখায়। পরিশোধিত তেলের রং হয় হালকা হলুদ। তুলাবীজের তেল থেকে সাধারণত ডালডা, মার্জারিন, রান্নার ফ্যাট ও উইনটারাইজার করার পর সালাদের তেল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এতে প্রচুর পরিমাণে লিনোলেইক অ্যাসিড থাকে।

চিনাবাদামের তেল

এই তেলকে অ্যারাচিস তেল বা পিনাট তেলও বলে। এর শাঁসে ৫০% তেল থাকে। এই তেল দেখতে হালকা হলুদ দেখায়। এই তেল থেকে বহুল পরিমাণে মার্জারিন ও বেকারি ডালডা প্রস্তুত করা হয়। তাছাড়া এটি একটি উত্তম ফ্রাইং তেল হিসেবে স্বীকৃত। এতে প্রচুর অলেইক অ্যাসিড, লিনোলেইক অ্যাসিড ও ফারমিটিক অ্যাসিড থাকে।

সয়াবিন তেল

অশোধিত সয়াবিন তেলে প্রচুর পরিমাণে ফসপোলিপিড ও লেসিথিন থাকে, যা ইমালসিফাইং এজেন্ট হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই তেল থেকে প্রধানত মার্জারিন ও কম্পাউন্ড কুকিং ফ্যাট প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এটি একটি উৎকৃষ্ট খাবার তেল। সয়াবিনে ১৫-১৮% তেল থাকে।

সরিষার তেল

এই তেল দেখতে হলুদ দেখায় এবং এই তেলের একটি বিশেষ গন্ধ আছে। প্রধানত সালাদ অয়েল হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এতে ইউরিসিক অ্যাসিড থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশে রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়।

জলপাই তেল

জলপাই থেকে এ তেল পাওয়া যায়। এ তেলের গুণাগুণ বৈশিষ্ট্য খুবই ভালো। আমাদের দেশে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এ তেল ব্যবহৃত হয়। উন্নত দেশে রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়।

সূর্যমুখী ফুলের তেল

এই তেল রাশিয়ায় প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়ে থাকে। এর বীজে ৪০% তেল থাকে। এ থেকে মার্জারিন ও কুকিং ফ্যাট প্রস্তুত করা হয়। তরল তেল সালাদ অয়েল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই তেল দেখতে হালকা হলুদ এবং এর একটি ভালো গন্ধ আছে। এতে উচ্চমাত্রায় অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে।

তিলের তেল

তিলবীজ থেকে তেল পাওয়া যায়। বীজে ৩৮-৪০% তেল থাকে। এ তেল অত্যাবশ্যকীয় লিনোলিক অ্যাসিডের পরিমাণ প্রায় ৫০%। আমাদের দেশে সাধারণত রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়।

পাম তেল

পামবীজের নির্যাস থেকে এ তেল পাওয়া যায়। শিল্পকারখানার তেল হিসেবে বহুল পরিচিত। এছাড়া কিছু উন্নয়নশীল দেশে ভোজ্যতেল হিসেবে ব্যবহার হয়।

মাছের তেল

এই তেল প্রধানত সামুদ্রিক মাছ থেকে আহরণ করা হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই থাকে।

বাটার বা মাখন

মাখন প্রধানত গরু-মহিষের দুধ থেকে প্রস্তুত করা হয়। এটি দেখতে সামান্য হলুদ কারণ এতে ক্যারোটিন এবং আরও কিছু পিগমেন্ট থাকে। ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা চোলাইকরণের মাধ্যমেই ননি থেকে বাটারের উৎপত্তি হয়।

ট্যাল্লো

এটা খাবার তেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি প্রথানত গরুর চর্বি থেকে প্রস্তুত করা হয়। দেখতে হালকা হলুদ। এ থেকে মার্জারিন প্রস্তুত করা হয়।

৫.৪ তেলের পুষ্টিমান

খাবার তেল এবং চর্বি প্রধানত গৃহে এবং শিল্পকারখানায় কুকিং, ফ্রাইং এবং বেকিং-এর কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মানুষের খাবারে তেল, চর্বি এবং কার্বোহাইড্রেট শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। তেল, চর্বি, মাখন, ঘি যে আমরা শুধুই দৃশ্যমান খাবার হিসেবে খাই তা নয় বরং অদৃশ্য খাবার হিসেবে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, দানাদার শস্য এবং অন্যান্য সব খাবার হিসেবেও কম-বেশি খেয়ে থাকি।

রসায়নিক অবস্থান

তেল, চর্বি প্রধানত এক ইউনিট গ্লিসারিন এবং তিন ইউনিট ফ্যাটি অ্যাসিড সমন্বয়ে গঠিত একটি ট্রাইগ্লিসারাইড। এতে সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত উভয় প্রকার ফ্যাটি অ্যাসিড থাকতে পারে। সাধারণত তেলে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড এবং চর্বি তে সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। যেমন–

সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড

১. বিউটাইরিক অ্যাসিড
২. ক্যাপ্রিক অ্যাসিড
৩. লরিক অ্যাসিড
৪. পামিটিক অ্যাসিড

৫. স্টিয়ারিক অ্যাসিড
৬. অ্যারাচিডিক অ্যাসিড

অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড

১. ক্যাপ্রলেইক অ্যাসিড
২. ল্যারোলেইক অ্যাসিড
৩. অলেইক অ্যাসিড

সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের তুলনায় বেশি স্থায়ী হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় এরা কঠিন। যেমন- প্রানিজ চর্বি, ডালডা ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড

কিছু অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড আছে যাদের অভাবে দেহের সঠিক বৃদ্ধি হয় না। এদেরকে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড বলে। যেমন-

১. লেনোলেইক অ্যাসিড
২. লেনোলেনিক অ্যাসিড
৩. অ্যারাচিডনিক অ্যাসিড

প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিডের উৎস

১. লেনোলেইক অ্যাসিড : কর্ন, সানফ্লাওয়ার, সয়াবিন তেল।
২. লেনোলেনিক অ্যাসিড : তিসির তেল এবং মাছের তেল।
৩. এ্যারাচিডনিক অ্যাসিড : বাদাম তেল এবং মাছের তেল।

৫.৫ তেলের কটুত্ব নিবারণের পদ্ধতি

তেল বা চর্বি রেখে দিলে কিছুদিনের মধ্যেই তাতে এক ধরনের খারাপ গন্ধের সৃষ্টি হয়। একে তেলের কটুত্ব বা র‍্যান্সিডিটি বলা হয়। তেলের এই কটুত্ব নিবারণের জন্য কিছু দ্রব্য তেল বা চর্বির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এদের এন্টি-অক্সিডেন্ট বলে। যেমন-

১. বিউটাইলেটেড হাইড্রোক্সি টলুইন (BHT)
২. বিউটাইলেটেড হাইড্রোক্সি অ্যানিসল (BHA)
৩. প্রোপাইল গ্যালেট (PG)
৪. ভিটামিন
৫. সাইট্রিক অ্যাসিড ইত্যাদি।

খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহৃত এন্টি-অক্সিডেন্টের অনুমোদিত মাত্রা হলো ০.০১-০.০২%

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি প্রাণিজ তেল?
ক. বাবাসু তেল
খ. পাম তেল
গ. ট্যাল্লো
ঘ. কোনোটিই নয়

২. বাবাসু পাম গাছ কোন দেশে পাওয়া যায়?
ক. আর্জেন্টিনা
খ. ইতালি
গ. রাশিয়া
ঘ. ব্রাজিল

৩. নারকেলের তেলের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
ক. রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়
খ. প্রসাধন দ্রব্য প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়
গ. কৃত্রিম ডিটারজেন্ট প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়
ঘ. সব কয়টি ।

৪. নারকেল তেলের গলনাঙ্ক কত ডিগ্রি সেলসিয়াস?
ক. ২০
খ. ৩০
গ. ২৬
ঘ. ৩৬

৫. সরিষার তেলে কী থাকে?
ক. সরবিক অ্যাসিড
খ. সাইট্রিক অ্যাসিড
গ. অ্যারাসিক অ্যাসিড
ঘ. নাইট্রিক অ্যাসিড

৬. মাছের তেলে কী থাকে?
ক. ভিটামিন ডি
খ. ভিটামিন ই
গ. ভিটামিন বি$_২$
ঘ. ভিটামিন সি

৭. ট্যাল্লো কী থেকে প্রস্তুত করা হয়?
ক. গরুর চর্বি
খ. মাছের চর্বি
গ. শূকরের চর্বি
ঘ. বাবাসু তেল

৮. নিচের কোনটি সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড?
ক. ক্যাপ্রলেইক অ্যাসিড
খ. ল্যারোলেইক অ্যাসিড
গ. অলেইক অ্যাসিড
ঘ. অ্যারাচিডিক অ্যাসিড

৯. প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড কয়টি?

ক. ৩ খ. ৪
গ. ৫ ঘ. ৬

১০. খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহৃত এন্টি-অক্সিডেন্টের অনুমোদিত মাত্রা কত?

ক. ২-৩% খ. ০.২-০.৪%
গ. ০.০১-০.০২% ঘ. ০.৩-০.৬%

১১. সূর্যমুখী তেলের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?

ক. মারজারিন প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয় খ. কুকিং ফ্যাট প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়
গ. উভয়টি ঘ. কোনোটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিজ্জ তেলের নাম লিখ।
২. বিভিন্ন ধরনের প্রাণিজ তেলের নাম লিখ।
৩. প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড বলতে কী বোঝ?
৪. তেলের কটুত্ব বা র‌্যান্সিডিটি কী? এটি নিবারণের উপায় লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কয়েকটি ভোজ্যতেলের উৎস এবং ব্যবহার লিখ।
২. ভোজ্যতেলের রাসায়নিক অবস্থান বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়
তেলবীজ জাত দ্রব্য

৬.১ তেল হতে উৎপন্ন দ্রব্য

চিনাবাদাম, সয়াবিন এবং তিলের ময়দা যোগ করে ভুট্টার এবং গমের ময়দার প্রোটিনের পরিমাণ বাড়িয়ে তা থেকে নানা প্রকার উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার প্রস্তুত করা যায়। যেমন–

ইন ক্যাপারিন

ভুট্টার ময়দা	৫০%
তিলের ময়দা	৩৫%
তুলাবীজের ময়দা	৯%
লিফ মিল ময়দা	৩%
টোরুলা ইস্ট	৩%

এই মিশ্র ময়দার প্রোটিনের পরিমাণ ২৫%, এই ময়দা আমেরিকা এবং পানামায় ব্যবহার করা হয়।

ভেজিটেবল প্রোটিন মিক্সার

ভুট্টার ময়দা	৪৭%
তিলের ময়দা	২০%
সয়াবিন-এর ময়দা	১৮%

এই মিশ্র ময়দার প্রোটিনের পরিমাণ ৩৭.৮%, এই ময়দাও মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবহার করা হয়।

লাবিনা

গমের ময়দা	৬০%
ভুট্টার ময়দা	২০%
তিলের ময়দা	১০%
ননিবিহীন গুঁড়া দুধ	১০%

এই মিশ্র ময়দার প্রোটিনের পরিমাণ ১৮%, এই ময়দাও মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবহার করা হয়।

উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার

চিনাবাদামের ময়দা	৪০%
সয়াবিন-এর ময়দা	৪০%
তিলের ময়দা	২০%
এই মিশ্র ময়দার প্রোটিনের পরিমাণ	৩৫%

৬.২ ডালডা প্রস্তুতপ্রণালি

আমরা জানি উদ্ভিজ্জ তেলে অতিমাত্রায় অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। এ সমস্ত অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডকে হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা আংশিক বা পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত করলে তেল ক্রমান্বয়ে কঠিন ফ্যাটে রূপান্তরিত হয় এবং ধীরে ধীরে ভিন্ন গলনাঙ্কের (Melting Point) বিভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হয়। বর্তমানে নিম্নলিখিত ভৌত অবস্থাসমূহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একই তেল থেকে বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম ঘি, বাটার, বাটার অয়েল এবং বেকারি ফ্যাট প্রস্তুত করা হয়। ভৌত অবস্থাগুলো হলো–

১. তাপমাত্রা
২. গ্যাস প্রবাহের চাপ
৩. প্রভাবকের ধরন
৪. প্রভাবকের পরিমাণ এবং
৫. আলোড়ন (Agitation)

ডালডা প্রস্তুতির প্রবাহ চিত্র :

পরিমাণমতো তেল (বিক্রিয়ক পাত্রের ভিতর ঢালতে হবে)
↓
উত্তাপ (৯৩° সে.)
↓
প্রভাবক যোগকরণ (২-৪% নিকেল পাউডার)
↓
তাপন এবং মিশ্রণ (প্যাডেলের সাহায্যে যতক্ষণ তাপমাত্রা ১২১-১৩৫° সে. না হয়)
↓
নির্দিষ্ট চাপের (৫০-৬০ পিএসআই) হাইড্রোজেন গ্যাস যোগকরণ (পাত্রের তলদেশ দিয়ে)
↓
রিফ্রাকটিভ ইনডেক্স পরিমাপন
↓
মিক্সিং ও হাইড্রোজেন গ্যাস এর প্রবাহ বন্ধকরণ
↓
৯৩° সে. তাপমাত্রায় ঠান্ডাকরণ
↓
ফিল্টারিং
↓
প্যাকেজিং

তেল এবং হাইড্রোজেন গ্যাসে উপস্থিত দূষিত বস্তু যেমন সালফার যৌগ, পানি, সাবান এবং কার্বন মনো-অক্সাইডের প্রভাবে নিকেল প্রভাবকের কার্যকারিতা হ্রাস পায় এবং ৪/৫ বার ব্যবহারের পর আর ব্যবহার উপযোগী থাকে না।

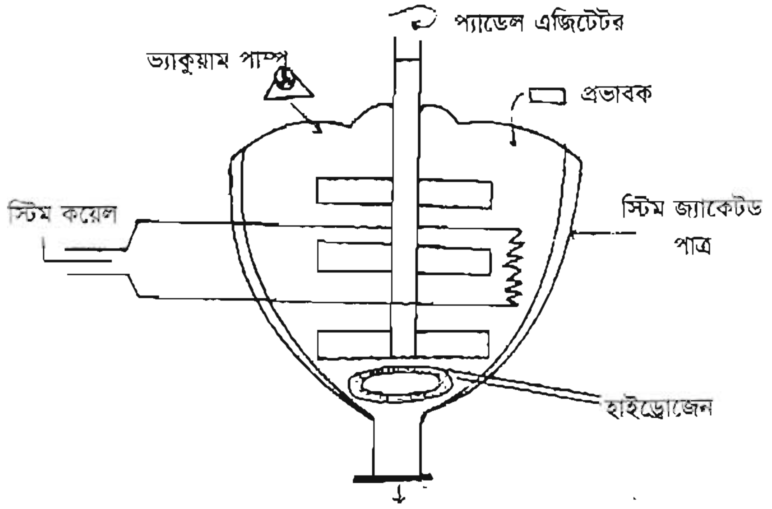

চিত্র : ডালডা প্রস্তুতপ্রণালি

ডালডা প্রস্তুতির জন্য যে কোনো ধরনের রিফাইনড উদ্ভিজ্জ তেল ব্যবহার করা যায়। তবে এ কাজের জন্য সাধারণত বাদাম তেল, সয়াবিনের তেল ও তুলাবীজের তেল বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৬.৩ মার্জারিন প্রস্তুতপ্রণালি

১৫% পানির সাথে ৮৫% ফ্যাটের সমসত্ব মিশ্রণকে (Emulsion) মার্জারিন বলে। এটা এক ধরনের মাখন জাতীয় দ্রব্য। বর্তমানে হাইড্রোজিনেটেড ফ্যাট থেকে মাখন প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

এতে অতিরিক্ত দ্রব্য হিসেবে ০.১-০.৫% লেসিথিন, মনো-গ্লিসারাইড (০.২-০.৫%), সোডিয়াম বেনজোয়েট ০.১%, লবণ ২.৫%, সাইট্রিক অ্যাসিড, ভিটামিন এ, BHA এবং ফ্লেভার যোগ করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সংমিশ্রিত হাইড্রোজিনেটেড ফ্যাট ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

প্রস্তুতপ্রণালি

তেলে দ্রবণীয় এমন সব কটি উপাদান ফ্যাটের সাথে মিশিয়ে গলানো হয় এবং গলিত অবস্থায় ৪৫° সে. তাপমাত্রায় রাখা হয়। অন্যদিকে পানিতে দ্রবণীয় উপাদানসমূহকে ৮০° সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত পানিতে গুলিয়ে নিয়ে গলিত ফ্যাটের সাথে যোগ করা হয় এবং মিশ্রণটিকে উত্তমরূপে ঝাঁকানো হয়, যেন দ্রবণটি ভালো করে সমসত্ব হয়। এরূপ প্রাপ্ত বস্তুটিকে ভোটেটর নামক যন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রেরণ করা হয় এবং ১০-১৫° সে. তাপমাত্রায় রাখা হয়। এর ফলে মাখন জমে যায় এবং প্যাকেট করতে সুবিধা হয়। মার্জারিন নরম আকারেও প্রস্তুত করা যায়। এটি মাখনের চেয়ে দামে সস্তা কিন্তু পুষ্টিমান মাখনের চেয়ে বেশি।

সালাদের তেল প্রস্তুতকরণ

যে সমস্ত তেলকে ৫০° সে. তাপমাত্রায় অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য রেফ্রিজারেটরে রাখলেও তরল অবস্থায় থাকে তাদের বলা হয় সালাদের তেল বা Salad Oil। যেমন– তিলের তেল, জলপাইয়ের তেল, ভুট্টার তেল ইত্যাদি।

বাদাম তেল এবং তুলাবীজের তেলকে সালাদ অয়েল বলা যায় না। এদের Winterised করতে হয়। এসব তেলকে খুব ধীরে ধীরে ঠান্ডা করার পর তাতে সৃষ্ট দানা ছেঁকে পৃথক করা হয়। তেলকে এভাবে ছেঁকে পরিষ্কার করার পদ্ধতিকে Winterisation বলা হয়।

প্রস্তুতপ্রণালি

তেলকে প্রথমে ২৪° সে. তাপমাত্রায় রেখে ঠান্ডা করার পর তাকে ১৩° সে. তাপমাত্রায় ৬-৮ ঘণ্টা রাখা হয়, তারপর ৭° সে. তাপমাত্রায় ১২-১৮ ঘন্টা রাখার পর তাতে খুব সতর্কতার সাথে লিফ ফিল্টারের সাহায্যে চিলিং রুমে ছাঁকার পর পরিষ্কার তরল সালাদের তেল পাওয়া যায়।

৬.৪ মেয়নেজ (Maynnaise) প্রস্তুতপ্রণালি ঃ

এটা এক ধরনের অর্ধকঠিন তরল পদার্থ। এতে থাকে ৭০-৮০% উদ্ভিজ্জ তেল, ডিমের কুসুম, সিরকা, লবণ, খেজুর, লেবুর রস, চিনি এবং প্রচুর পরিমাণে আবদ্ধ বা শোষিত বাতাস (Occluded air)। এটা দুধের মতো পানিতে তেলের সমসত্ত্ব মিশ্রণ বা ইমালশন।

উপাদান :

উদ্ভিজ্জ তেল	৮০%
ডিমের কুসুম	৭%
ভিনেগার	৯.৪%
চিনি	১.৫%
লবণ	১.৫%
গুঁড়া সরিষা	০.৫%
সাদা গোল মরিচ	০.১%
	১০০%

প্রস্তুতপ্রণালি

১. মিক্সারের সাহায্যে ডিমের কুসুম ভালো করে ফেটে নিতে হবে।
২. অর্ধেক পরিমাণ ভিনেগারের সাথে সমস্ত শুকনা উপাদান মিশিয়ে ডিমের কুসুমের সাথে যোগ করতে হবে।
৩. এবার অল্প অল্প করে তেল যোগ করে মিক্সারের মাধ্যমে ফেটাতে হবে।
৪. এ সমস্ত তেল যোগ করা হয়ে গেলে বাকি ভিনেগার যোগ করে ৫ মিনিট ধরে মিশাতে হবে।
৫. প্রাপ্ত ক্রিমের মতো দ্রব্যই মেয়নেজ।

৬.৫ বেকারি ফ্যাট

বিভিন্ন রকমের বেকারি দ্রব্য যেমন– ব্রেড, বিস্কুট, ক্রিম ইত্যাদি প্রস্তুত করতে যে ধরনের ডালডা বা হাইড্রোজিনেটেড ফ্যাট ব্যবহার করা হয় তাকে বেকারি ফ্যাট বলে। এদের বৈশিষ্ট্য হলো–

১. দানা মিহি এবং মসৃণ হবে।
২. অবশ্যই নরম হতে (Fluffy) হবে।
৩. সমসত্ত্ব হতে হবে।

নিম্নলিখিত পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে হাইড্রোজিনেশন প্রক্রিয়ায় ডালডা প্রস্তুতপ্রণালীর মতো করেই বেকারি ফ্যাট প্রস্তুত করা সম্ভব।

১. নিম্ন তাপমাত্রা ১০০° সে.।
২. উচ্চচাপ ৬০ পি.এস.আই।
৩. কম পরিমাণের প্রভাবক।
৪. কম ক্রিয়াশীল প্রভাবক (পূর্বে ব্যবহৃত প্রভাবক পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে)।
৫. তেল হিসেবে তুলাবীজের তেল, পাম অয়েল, মাছের তেল, ট্যাল্লো ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।
৬. হাইড্রোজিনেশন করার পর প্রাপ্ত ফ্যাটকে ক্রিমের মতো করার জন্য ভোটেটর ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে তাপমাত্রা থাকে ১৫-১৮° সে.। ফ্যাটের ক্রিমনেস বা ননির মতো অবস্থা বজায় রাখার জন্য ভোটেটরে নাইট্রোজেন চালনা করা হয়ে থাকে।

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন সমসত্ত্ব মিশ্রণকে মার্জারিন বলে?

ক. ১৫% পানির সাথে ৮৫% ফ্যাট
খ. ১০% পানির সাথে ৭৫% ফ্যাট
গ. ৩০% পানির সাথে ৭০% ফ্যাট
ঘ. কোনোটিই নয়

২. কোনটি বেকারি ফ্যাটের বৈশিষ্ট্য

ক. দানা মিহি ও মসৃণ হতে হবে
খ. সমসত্ত্ব হতে হবে
গ. নরম হতে হবে
ঘ. উপরের সব কটি

৩. নিচের কোনটি মেয়নেজ তৈরির উপাদান

ক. উদ্ভিজ তেল
খ. ডিমের কুসুম
গ. ভিনেগার
ঘ. উপরের সব কটি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কয়েকটি তেলবীজজাত দ্রব্যের নাম লিখ।
২. ইনক্যাপারিনার কম্পোজিশন লিখ।
৩. বেকারি ফ্যাটের ভৌত অবস্থাগুলো কী কী?
৪. মেয়নেজের উপকরণগুলোর নাম লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ডালডার প্রস্তুতপ্রণালি প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।
২. মার্জারিন প্রস্তুতপ্রণালি ব্যাখ্যা কর।
৩. সালাদের তেল কীভাবে প্রস্তুত করা হয় লিখ।
৪. মেয়নেজের প্রস্তুতপ্রণালি বর্ণনা কর।
৫. বেকারি ফ্যাট বলতে কী বুঝ? কীভাবে বেকারি ফ্যাটের বৈশিষ্ট্য অর্জন করা যায়?

সপ্তম অধ্যায়
ডাল

৭.১ ডালের পরিচিতি
ডাল এক ধরনের দানাদার খাদ্যশস্য। ডালকে গরিবের মাংস বলা হয়ে থাকে। কারণ মাংসের মতো ডালে বেশি পরিমাণ প্রোটিন থাকে অথচ মাংস অপেক্ষা ডালের দাম কম। ধান ও গমের চেয়ে যে কোনো ডালে প্রোটিনের পরিমাণ অনেক বেশি। ভাতের সাথে ডাল মিশিয়ে খেলে প্রোটিনের মান বাড়ে। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৫ লাখ ৩০ হাজার মে. টন ডাল উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে প্রধানত মসুর, মুগ, ছোলা, মটর, কলাই, অড়হর, খেসারি ইত্যাদি ডাল পাওয়া যায়।

৭.২ ডালের বৈশিষ্ট্য
এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ লবণ পাওয়া যায়। ১০০ গ্রাম শুকনো ডালে ২০-৩০ গ্রাম প্রোটিন থাকে। ডাল এবং অন্যান্য দানাদার শস্য একত্রে মিশ্রিত করলে এদের সমষ্টিগত পুষ্টিমান প্রায় মাংস বা মাছের সমান হয়। একই ডালের প্রোটিনে সব ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে না। আবার ভিন্ন ভিন্ন ডালে ভিন্ন ভিন্ন রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে।

৭.৩ ডালের বিভিন্ন উপাদান
প্রোটিন
ডালের প্রোটিনের পরিমাণ প্রায় ১৮-২৫%। এর মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ বিদ্যমান থাকে-

গ্লোবিউলিন	৬৬%
অ্যালবুমিন	১৪%
গ্লুটেনিন	৪.৮%
প্রোলামিন	২.৩%

ডালে সাধারণত মিথিওনিন এবং ট্রিপটোফ্যানের অভাব থাকে কিন্তু ডাল লাইসিন এবং থ্রিওনিন সমৃদ্ধ।

কার্বোহাইড্রেট
ডালে কার্বোহাইড্রেট থাকে ৬০-৬৫%। এর মাঝে স্টার্চ- এর পরিমাণ ৪৭-৫৩% এবং চিনি থাকে ৭.৮%।

লিপিড
ডালে লিপিডের পরিমাণ তুলনামূলক কম। এর পরিমাণ প্রায় ১-৬%।

খনিজ লবণ
ডালে খনিজ লবণের পরিমাণ ২.৫-৪%।

ডালের খোসা বা ভুসিতে সিলিকার পরিমাণ খুব বেশি নয়। ক্রুড ফাইবার থেকে ১৬% এবং প্রোটিনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য। কাজেই ডালের খোসা গরু-ছাগলের খাদ্য হিসেবে কাজে লাগে।

ভিটামিন

ডালে প্রায় সব ধরনের প্রয়োজনীয় ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে। এদের পরিমাণ নিম্নরূপ-

ভিটামিন এ	১৫০.০ মি. গ্রা./ ১০০ গ্রাম
থায়ামিন বা ভিটামিন বি$_{১}$	৫০০ মি. গ্রা./ ১০০ গ্রাম
রিবোফ্লাভিন বা ভিটামিন বি$_{২}$	১৫০ মি. গ্রা./ ১০০ গ্রাম
নিয়াসিন বা ভিটামিন বি$_{৩}$	২.৩ মি. গ্রা./ ১০০ গ্রাম
ভিটামিন সি	খুবই কম

অঙ্কুরোদগমের পর ডালে ভিটামিন সি-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

মিনারেল

দেহের জন্য প্রয়োজনীয় বেশ কিছু মিনারেল-এর সরবরাহ ডাল থেকে পাওয়া যেতে পারে। যেমন–

ক্যালসিয়াম	১০০-২০০ মি. গ্রা./ ১০০ গ্রাম
ফসফরাস	৪২০-৬২০ মি. গ্রা./ ১০০ গ্রাম
লৌহ	৬-১০ মি. গ্রা./ ১০০ গ্রাম

এই পুষ্টি উপাদানগুলো দেহের বৃদ্ধি, রক্ষণাবেক্ষণ, দেহের নিয়ন্ত্রণ, রক্তশূন্যতা, বেরিবেরি ও স্নায়ুতন্ত্রের দুর্বলতা প্রতিরোধে সহায়তা করে।

৭.৪ ডালে উপস্থিত বিভিন্ন পুষ্টিবিরোধী উপাদান

ডালে উপস্থিত বিভিন্ন পুষ্টিবিরোধী উপাদানসহ নিচে প্রদান করা হল-

১.	ট্রিপসিন প্রতিরোধক	সয়াবিন
২.	গয়টেরোজেনিক ফ্যাকটর	শিমের বিচি
৩.	হেমাগ্লুটেনিন	সয়াবিন
৪.	ল্যাথাইরাস উপাদান	খেসারির ডাল

এর সব উপাদানই তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে অকার্যকর করা যেতে পারে। খেসারির ডাল ৮-১০ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর সেই পানি ফেলে দিলে ডাল বিষমুক্ত হয়।

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ১০০ গ্রাম শুকনো ডালে প্রোটিনের পরিমাণ কত গ্রাম?

ক. ৩-৪ খ. ৩০-৪০

গ. ২০-৩০ ঘ. ৫০-৬০

২. ডালে কোন প্রোটিনটির অভাব থাকে?

ক. মেথিওনিন খ. লাইসিন

গ. থ্রিওনিন ঘ. কোনোটিই নয়

৩. ডালে চিনির পরিমাণ কত?

ক. ৪.৫% খ. ১২%

গ. ৭.৮% ঘ. চিনি থাকে না

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ডালের পরিচিতি লিখ।

২. ডালের বৈশিষ্ট্য কী?

৩. ডালে উপস্থিত পুষ্টিবিরোধী উপাদানের বর্ণনা দাও।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ডালে উপস্থিত পুষ্টি উপাদানের বর্ণনা দাও।

অষ্টম অধ্যায়
খাদ্য ভেজালকরণ

৮.১ ভেজালকরণ (Adulteration) :

খাদ্য ব্যবসায় ভেজালকরণ একটি সাধারণ প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া প্রধানত মানুষকে ঠকিয়ে বেশি টাকা উপার্জনের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অল্প দামের, নিম্ন মানের এমনকি ক্ষতিকর কিছু বস্তু খাবারের সাথে যোগ করে খাদ্যকে ভেজালকরণ করা হয়ে থাকে। কাজেই মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বাস্থ্য আইন বা Food laws কার্যকরী করা হয়েছে।

৮.২ ভেজালকৃত খাদ্যের বৈশিষ্ট্য :

নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো কোনো খাদ্যদ্রব্যে বিদ্যমান থাকলে সেই খাবারকে ভেজাল খাবার বলা যাবে :

১. যদি ব্যবসায়ী কর্তৃক বিক্রিত কোনো খাদ্যের প্রকৃতি ও গুণগত মান যেমন ঘোষণা করা হয়েছে ক্রেতা সাধারণের কাছে তেমন আকারে বিক্রি করা না হয়।
২. যদি কোনো খাদ্যে এমন কোনো দ্রব্য যোগ করা হয় অথবা এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যে তার কারণে ঐ খাদ্যের প্রকৃতি ও গুণাগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৩. যদি কোনো খাদ্যের একটি অংশ বা সম্পূর্ণ অংশের পরিবর্তে এমন কোনো সস্তা দ্রব্য যোগ করা হয় যাতে ঐ খাদ্যের প্রকৃতি ও গুণগতমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৪. যদি কোনো খাদ্যের মূল উপাদান বা অংশবিশেষ বের করে দেওয়া হয় যাতে ঐ খাদ্যের প্রকৃতি ও গুণাগুণ বদলে যায়।
৫. যদি কোনো খাদ্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি করা ও গুদামজাত করা হয় যার ফলে ঐ খাদ্য দূষিত হয় এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়।
৬. যদি কোনো খাদ্যে অন্য কোনো বস্তুর পচা অংশ, অপ্রয়োজনীয় অংশ, পোকামাকড়ের কোনো অংশ থাকার কারণে অথবা অন্য কোনোভাবে মানুষের খাবার অযোগ্য হয়।
৭. যদি কোনো খাদ্য রোগাক্রান্ত কোনো জীবজন্তু হতে সংগৃহীত হয়।
৮. যদি কোনো খাদ্য কোনো বিষাক্ত বস্তু অথবা অন্য কোনো উপাদান থাকার কারণে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়।
৯. যদি কনটেইনার বা প্যাকেজিং দ্রব্য কোনো ক্ষতিকর বস্তু দিয়ে তৈরি হয় যার জন্য খাবার নষ্ট হয় এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়।
১০. যদি কোনো খাদ্যে নির্ধারিত তালিকার বাইরে কোনো রং বা তা যে পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে তার চেয়ে বেশি থাকে।
১১. যদি কোনো খাদ্যে নিষিদ্ধ কোনো প্রিজারভেটিভ বা ব্যবহারযোগ্য প্রিজারভেটিভ মাত্রাতিরিক্ত থাকে।
১২. যদি কোনো খাদ্যের বৈশিষ্ট্য বা বিশুদ্ধতা নির্ধারিত মানের কম থাকে বা বেশি থাকে।

৮.৩ খাদ্যে ব্যবহৃত ভেজাল উপাদান

সাধারণত যে সমস্ত উপাদান ব্যবহার করে খাদ্যদ্রব্য ভেজাল করা হয় সেগুলোকে ভেজাল উপাদান বলে। নিম্নে বিভিন্ন ভেজাল উপাদানের ব্যবহার দেওয়া হলো :

খাদ্য	ভেজাল উপাদান
দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবার	
১. তরল দুধ	১. পানির সংযোগ অথবা পানি বা ফ্যাট এর অপসারণ এবং পরিশোধিত তেল এর ব্যবহারে ননিশূন্য গুঁড়া দুধ হতে তরল দুধ প্রস্তুতকরণ।
২. মিল্ক পাউডার	২. স্টার্চ, ডেক্সট্রিনের সংযোগ।
৩. ক্রিম	৩. অন্য জাতীয় ফ্যাটের সংযোগ।
৪. বাটার	৪. হাইড্রোজিনেটেড ফ্যাটস।
অয়েল এন্ড ফ্যাটস	
১. বনস্পতি তেল	১. প্রাণিজ চর্বি এবং উচ্চ গলনাঙ্কের ফ্যাট বা পাম
২. ভেজিটেবল অয়েল	২. খনিজ তেল এবং খাবার অযোগ্য সস্তা তেল।
মসলা	
১. গুঁড়া হলুদ	১. হলুদ কোলটার রং সংযুক্ত স্টার্চ বা ট্যালকম পাউডার
২. চিলি পাউডার	২. লাল কোলটার রং সংযুক্ত স্টার্চ।
দানাদার শস্য	
১. গম এবং চাল	১. পাথরের টুকরা।
২. ময়দা	২. টেপিওকার ময়দা

৩. ঢেঁকি ছাঁটা চালের রং সাধারণত লাল হয়। চালে রং মিশিয়ে তা ঢেঁকি ছাঁটা চাল বলে বিক্রি হয়।

ডাল	
১. বুটের ডাল	১. খেসারি ডাল
২. বুটের বেসন	২. খেসারির বেসন
মিষ্টিদ্রব্য এবং তরল পানীয়	
১. মধু	১. ইনভার্ট সুগার সিরাপ
২. সফট ড্রিংক	২. স্যাকারিন

মাছ-মাংসে ভেজাল

১. খাসির মাংস পানিতে ভিজিয়ে বা ডুবিয়ে রাখলে মাংস ১০% পানি শোষণ করে। এতে প্রতি কেজিতে ওজন ১০০-২০০ গ্রাম বৃদ্ধি পায় ও মাংস টাটকা দেখায়।
২. মুরগিকে যদি পাথর মিশ্রিত খাদ্য খাওয়ানো হয় তবে ওজন ৫০-১০০ গ্রাম বৃদ্ধি পায়।
৩. সাধারণত বাসি মাছের আঁইশ ও ফুলকা ফ্যাকাশে দেখায়। মাছ টাটকা দেখানোর জন্য বিক্রেতারা ফুলকায় লাল রং ব্যবহার করে। প্রধানত কার্প জাতীয় মাছে রং দেওয়া হয়।

এছাড়া ফরমালিন ব্যবহার করে মাছকে দীর্ঘদিন পচনমুক্ত রাখা যায়। ব্যবহৃত ফরমালিন মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

ফলে ভেজাল

যেসব ফল কেটে দোকানিরা দোকানে রাখে সেসব ফল দেখে ক্রেতারা আকৃষ্ট হয়। ফল কেনার পর অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, দোকানি যে ফল কেটে সাজিয়ে রেখেছিল, কেনা ফল তার থেকে কম পাকা বা কম মিষ্টি। আসলে বিক্রেতারা ফলে হলুদ বা কমলা রং মিশিয়ে রাখে বা ফল স্যাকারিনে ডুবিয়ে রাখে। সে জন্য ফল পাকা দেখায় ও খেলে মিষ্টি মনে হয়।

এছাড়া বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে ফলকে সতেজ ও টাটকা রাখা যায়। যেমন- জিব্রেলিক অ্যাসিড দ্রবণে আনারস ডুবিয়ে নিলে সেই আনারস অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকে। এছাড়া ফরমালিন দ্রবণে ফল ভিজিয়ে রেখে বিক্রির প্রবণতাও দেখা যায়।

৮.৪ মিস ব্র্যান্ডিং

ব্যবসায়িকভাবে সফল কোনো দ্রব্যের ব্যবসায়িক নির্দেশনা যেমন- নাম, বোতল বা প্যাকেটে ব্যবহৃত লেবেল, বোতল বা প্যাকেটের আকৃতি, রং, ছাপার অক্ষর, বিশেষ কোনো চিহ্ন, ছবি ইত্যাদি নকল করে নিজস্ব কোনো দ্রব্য বানিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য হুবহু ঐ একইভাবে বাজারজাত করাকে মিস ব্র্যান্ডিং বলে। এটা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন ভেজাল জাতীয় উপাদান দুগ্ধজাতীয় খাদ্যে ব্যবহৃত হয়?

ক. হাইড্রোজিনেটেড ফ্যাট খ. ডেক্সট্রিন
গ. উভয়টি ঘ. কোনোটিই নয়

২. কোন ভেজাল জাতীয় উপাদান মিষ্টি জাতীয় দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়?

ক. ইনভার্ট সুগার খ. স্যাকারিন
গ. উভয়টি ঘ. কোনোটিই নয়

৩. কোন ভেজাল জাতীয় উপাদান দানা জাতীয় শস্যে ব্যবহৃত হয়?

ক. পাথরের টুকরা খ. টেপিওকার ময়দা
গ. উভয়টি ঘ. কোনোটিই নয়

৪. কোন ভেজাল জাতীয় উপাদান ফলে ব্যবহৃত হয়?

ক. স্যাকারিন খ. বিভিন্ন ধরনের রং
গ. উভয়টি ঘ. কোনোটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. খাদ্যে ভেজালকরণ বলতে কী বোঝ?
২. মিস ব্র্যান্ডিং বলতে কী বোঝ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভেজালকৃত খাদ্যের বৈশিষ্ট্য লিখ।
২. খাদ্যে ব্যবহৃত ভেজাল উপাদানের বর্ণনা দাও।

নবম অধ্যায়
খাদ্যে ব্যবহৃত সংযোজনীয় দ্রব্য

৯.১ সংজ্ঞা
খাদ্য প্রস্তুতির সময় মূল খাবার ব্যতীত অন্য যে সমস্ত দ্রব্য খাদ্যের রং, গাঢ়ত্ব, আয়তন, স্বাদ, গন্ধ, খাদ্যমান, ঔষধি সংযোজন সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাদের ফুড অ্যাডিটিভস (Food Additives) বা খাদ্যে ব্যবহৃত সংযোজনীয় দ্রব্য বলে।

৯.২ GRAS
আন্তর্জাতিকভাবে নিরাপদ ফুড অ্যাডিটিভস (Food Additives) এর একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে যা GRAS list নামে পরিচিত। GRAS অর্থ Generally Recognized As Safe। এই লিস্টে অন্তর্ভুক্ত পদার্থসমূহ প্রয়োজনবোধে যে কোনো খাদ্যে সংযোজনীয় দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৯.৩ খাদ্যে সংযোজনীয় দ্রব্যের (Food Additives) প্রকারভেদ
ফুড অ্যাডিটিভস (Food Additives) প্রধানত দু'প্রকার

১) আকস্মিকভাবে যোগকৃত (Incidental Additives)

২) ইচ্ছাকৃতভাবে যোগকৃত (Intensional Additives)

যে সমস্ত অ্যাডিটিভস (Additives) ঘটনাচক্রে অজান্তে খাদ্য প্রস্তুতির সময় যোগ হয়ে যায় সেগুলোকে ইনসিডেন্টাল অ্যাডিটিভস (Incidental Additives) বলে। যেমন- পেস্টিসাইড ইত্যাদি।

যে সমস্ত অ্যাডিটিভস ইচ্ছাকৃতভাবে খাদ্য প্রস্তুতির সময় যোগ হয়ে যায় সেগুলোকে ইনটেশনাল অ্যাডিটিভস (Intensional Additives) বলে। যেমন- স্পাইসিস, থিকেনারস, কালারিং এজেন্ট ইত্যাদি।

৯.৪ মিষ্টকারী দ্রব্য (Sweetener) :
খাদ্যদ্রব্যকে মিষ্টি করতে মিষ্টকারী ব্যবহার হয়। মিষ্টকারী সাধারণত দুই প্রকার হয়ে থাকে-

১) পুষ্টিকর মিষ্টকারী (Nutritive Sweetener)

২) অপুষ্টিকর মিষ্টকারী (Nonnutritive Sweetener)

নিউট্রিটিভ সুইটেনার (Nutritive Sweetener) হিসাবে বিভিন্ন ধরনের চিনি ব্যবহৃত হয়। নন-নিউট্রিটিভ সুইটেনারস (Nonnutritive Sweetener) হিসাবে স্যাকারিন এবং সাইক্লোমেট ব্যবহৃত হয়।

সাইক্লোমেট (Cyclamate) চিনির (সুক্রোজ) চেয়ে ৩০-৪০ গুণ বেশি মিষ্টি এবং স্যাকারিন ৩০০-৪০০ গুণ বেশি মিষ্টি।

৯.৫ রাসায়নিক সংরক্ষক (Chemical Preservative)

যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ খাদ্যদ্রব্যে অল্প মাত্রায় ব্যবহার করলে খাদ্যকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করা যায় সেগুলোকে রাসায়নিক সংরক্ষক বলা হয়।

এগুলোও এক ধরনের অ্যাডিটিভস তবে, রাসায়নিক সংরক্ষকগুলোকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক নিরাপদ তালিকার (GRAS LIST) অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। প্রতিটি পিজারভেটিভ ব্যবহারের আগে এর ব্যবহার বিধি, পরিমাণ ও মাত্রা সঠিকভাবে জেনে তবেই ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

নিম্নে অতিপরিচিত রাসায়নিক সংরক্ষকগুলোর (Chemical Preservatives) নাম ও ব্যবহার দেওয়া হল :

১) উদ্বায়ী প্রিজারভেটিভ (Volatile Preservatives) : উদ্বায়ী সংরক্ষকসমূহ প্রধানত ইথাইলিন অক্সাইড এবং প্রপাইলিন অক্সাইড হিসাবে মসলা সংরক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২) বেনজয়িক অ্যাসিড এবং এর লবণ : পেরা- হাইড্রোক্সি বেনজয়িক অ্যাসিড, সরবিক অ্যাসিড এবং এর লবণ, প্রপাইনিক অ্যাসিড এবং এর লবণ, সালফার ডাই-অক্সাইড এবং এর লবণ ইত্যাদি অ্যাসিড ফুডস যেমন– ফ্রুট ড্রিংকস, কার্বোনেটেড বেভারেজ এবং পিকেলস ইত্যাদির সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৯.৬ ব্রেড ইম্প্রুভার

ময়দাকে দ্রুত এজিং (Aging) করার জন্য ব্লিচিং এবং ম্যাচিউরিং (Maturing) এজেন্ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ব্লিচিং এজেন্ট হিসেবে প্রধানত বেনজয়েল পার-অক্সাইড এবং ব্লিচিং ও ইম্প্রুভিং এজেন্ট হিসেবে নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ, যেমন– ক্লোরিন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোসিল ক্লোরাইড এবং ক্লোরিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইম্প্রুভারস-এর কাজ হলো ডো (Dough) বা খামিরকে সমানভাবে এবং দ্রুত ফারমেন্ট করা। এ কাজের জন্য অক্সিডাইজিং এজেন্টস যেমন– পটাশিয়াম ব্রোমেট, পটাশিয়াম আয়োডেট, ক্যালসিয়াম পার-অক্সাইড ব্যবহার করা। এছাড়া অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড,অ্যামোনিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম সালফেট এবং অ্যামোনিয়াম ক্যালসিয়াম ফসফেট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ সমস্ত ব্রেড ইম্প্রুভারস খুব অল্প পরিমাণে যোগ করতে হয়। অন্যথায় খাদ্যের মান নষ্ট হতে পারে।

৯.৭ ফ্লেভার (Flavour)

খাদ্য প্রস্তুতির সময় ক্রেতাসাধারণের পছন্দের কথা বিবেচনা করে ফাইনাল প্রোডাক্ট-এর স্বাদ এবং গন্ধ উন্নত ও আকর্ষণীয় করার জন্য যে সমস্ত পদার্থ ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেগুলোকে ফ্লেভার বলা হয়। ফ্লেভার হিসেবে বিভিন্ন ধরনের মসলা (spices), উদ্বায়ী তেল (Essential oils) প্রাকৃতিক দ্রব্যের নির্যাস (Natural extractives) এবং বহু ধরনের কৃত্রিম ফ্লেভার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোর গঠন জটিল প্রকৃতির। ফুড ফ্লেভার সাধারণত তরল পানীয়, আইসক্রিম, কনফেকশনারি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো অল্প পরিমাণে ব্যবহার করতে হয় এবং সাধারণত ৩০০ পিপিএম-এর বেশি নয়। ফ্লেভার এনহ্যান্সার (Enhancer) হিসাবে মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট ব্যবহৃত হয়।

৯.৮ রঞ্জক পদার্থ

এগুলো এক ধরনের অ্যাডিটিভস। এ অ্যাডিটিভসগুলো প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম উভয় প্রকারের হতে পারে। প্রাকৃতিক রঞ্জক পদার্থ হিসাবে রেডবিট, কেরামেলস, ক্যারোটিনয়েডস, অ্যানাটো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থ হিসাবে এফডি এবং সি,ডি এবং সি রংসমূহ উল্লেখযোগ্য। এসব কালারিং এজেন্টসমূহের মধ্যে কতগুলো পানিতে আবার কতকগুলো তেলে বা অ্যালকোহলে দ্রবণীয়।

৯.৯ এন্টি-অক্সিডেন্ট

যে সমস্ত পদার্থের উপস্থিতিতে অটো-অক্সিডাইজেশন প্রক্রিয়া স্তিমিত হয় সেগুলোকে এন্টি-অক্সিডেন্ট বলা হয়। এন্টি-অক্সিডেন্ট মিশ্রিত খাবার সহজে রেনসিড হয় না। এন্টি-অক্সিডেন্ট হিসাবে বিএইচএ (BHA), বিএইচটি (BHT), প্রপাইল গেলেট, সাইট্রিক অ্যাসিড, ভিটামিন-ই বা টোকোফেরল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । সচরাচর এন্টি-অক্সিডেন্টসমূহ খাদ্যের লিপিডের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে শতকরা ০.০২ ভাগ পরিমাণ ব্যবহৃত হয়।

৯.১ অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রক

এগুলো প্রধানত অম্ল বা ক্ষারক। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য যেমন- ফলের রস, স্কোয়াস, নেকটার, ফ্রুট সিরাপ, ক্যান্ডি ইত্যাদির টক স্বাদ নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অম্লত্ব নিয়ন্ত্রক : সাইট্রিক অ্যাসিড, টারটারিক অ্যাসিড, ম্যালিক অ্যাসিড, ফসফরিক অ্যাসিড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইত্যাদি।

ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রক : ননি থেকে মাখন তৈরির সময় এর অম্লত্ব নিবারণের জন্য ক্ষারক অথবা বাফার লবণ ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. যে সমস্ত পদার্থ ঘটনাচক্রে অজান্তে খাদ্য প্রস্তুতির সময় যোগ হয়ে যায় তাদের বলে?
ক. Incidental Additives
খ. Intensional Additives
গ. Intensional Sweetener
ঘ. কোনোটিই নয়।

২. কোন উক্তিটি সত্য?
ক. সাইক্লোমেট (Cyclamate) চিনির (সুক্রোজ) চেয়ে ৩০-৪০ গুণ বেশি মিষ্টি।
খ. পেস্টিসাইড হলো ইনসিডেন্টাল অ্যাডিটিভস (Incidental Additives)।
গ. GRAS list এ প্রাপ্ত Additives সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না।
ঘ. সব কটি সত্য।

৩. রাসায়নিক সংরক্ষক এর ক্ষেত্রে কোনটি সত্য-
ক. GRAS list অন্তর্ভুক্ত নয়।
খ. অল্পমাত্রায় ব্যবহার করে খাদ্যের পচন হতে রক্ষা করা যায়।
গ. বেশি মাত্রায় ব্যবহার করে খাদ্যের পচন হতে রক্ষা করা যায়।
ঘ. কোনোটিই সত্য নয়।

৪. ব্রেড ইম্প্রুভার-এর কাজ হলো–
ক. ময়দাকে দ্রুত Aging করার জন্য।
খ. ময়দার খামিরকে সমানভাবে ফারমেন্ট করার জন্য।
গ. খাদ্যের কোয়ালিটি বৃদ্ধি করা।
ঘ. সব কটি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফুড অ্যাডিটিভস (Food Additives) বলতে কী বোঝায়?
২. GRAS list কী?
৩. ফুড অ্যাডিটিভস (Food Additives) কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর।
৪. রাসায়নিক সংরক্ষকের সংজ্ঞা লিখ।
৫. মিষ্টিকারক দ্রব্য বলতে কী বোঝ? বর্ণনা কর।
৬. অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রক দ্রব্যের নাম ও ব্যবহার লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্রেড ইম্প্রুভার ও ফ্লেভারস-এর নাম ও ব্যবহার বর্ণনা কর।
২. রঞ্জক পদার্থ ও এন্টি-অক্সিডেন্ট-এর নাম ও ব্যবহার বর্ণনা দাও।

দশম অধ্যায়
খাদ্য আইন

১০.১ খাদ্য আইন (Food Laws)

মানবজাতির স্বাস্থ্যরক্ষা এবং খাদ্যে বিভিন্ন ক্ষতিকর উপাদান রোধকল্পে যে আইন ও নীতিমালা ব্যবহার হয়ে থাকে তাকে খাদ্য আইন বলা হয়।

খাদ্য আইন সৃষ্টির কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা করা।
২. খাদ্যে ক্ষতিকর উপাদানের ব্যবহার রোধ করা।
৩. খাদ্যদ্রব্যের কাঁচামালের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা।
৪. খাদ্য মান বজায় রাখা।
৫. আর্থিক সঙ্গতি রক্ষা করা।
৬. আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১০.২ খাদ্য আইনের শ্রেণিবিভাগ

এই নীতিমালা দুই রকমের :

১. দেশীয় খাদ্য আইন
২. আন্তর্জাতিক খাদ্য আইন

১০.৩ দেশীয় খাদ্য আইন এবং আন্তর্জাতিক খাদ্য আইন

দেশীয় খাদ্য আইন

মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা করা, খাদ্যে ক্ষতিকর উপাদানের ব্যবহার রোধ, খাদ্যদ্রব্যের কাঁচামালের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা, খাদ্যমান বজায় রাখা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কোনো দেশে যে আইন কার্যকর করা হয় তাকে দেশীয় আইন বলে।

যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্য একটি আন্তর্জাতিক ব্যাপার, সেহেতু খাদ্য ব্যবসার ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক সমন্বিত নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তার খাতিরে জাতিসংঘের উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক কাঠামো তৈরি হয়। যা FAO/WHO, Codex Almintaries Commission নামে অভিহিত।

এ কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত খাদ্য নীতিমালা সংগ্রহ করা এবং তার সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক নীতিমালা প্রস্তুত করা।

আন্তর্জাতিক খাদ্য আইন

Federal Food এবং Drug Law নামে একটি আইন (Act) সর্বপ্রথম USA তে ১৯৩৮ সালে গঠিত হয় এবং ১৯৬৮ সালে এটি পূর্ণতা লাভ করে। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল আন্তঃদেশীয় ভেজালকৃত এবং মিসব্র্যান্ডেড খাদ্যদ্রব্য, ওষুধপত্র এবং প্রসাধনী দ্রব্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাচল বন্ধ করা। আন্তর্জাতিকভাবে লিখিত সব দেশে অনুসরণীয় খাদ্য আইনকে আন্তর্জাতিক খাদ্য আইন বলে।

১০.৪ খাদ্য আইনের বর্ণনা

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪৩ নং আইন) এর পঞ্চম অধ্যায় অনুযায়ী নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ-এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা নিচে উল্লেখ করা হলো :

ধারা ২৫ : কোনো ব্যক্তি বা তার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোনো ভেজাল খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন অথবা আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

ধারা ২৬ : কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, মানুষের আহার্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত মান অপেক্ষা নিম্নমানের কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন অথবা আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

ধারা ২৭ : কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য সংযোজন-দ্রব্য বা প্রক্রিয়াকরণ-সহায়ক দ্রব্য কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না অথবা উক্তরূপে প্রস্তুতকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

ধারা ২৮ : কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে কোন ভেজাল দ্রব্য মিশ্রিত করিবার উদ্দেশ্যে, শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত তৈল, বর্জ্য বা কোন ভেজালকারী দ্রব্য তাহার খাদ্য স্থাপনায় রাখিতে বা রাখিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

ধারা ২৯ : কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, মেয়াদোত্তীর্ণ কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খাদ্য আইন সৃষ্টির কারণ কোনটি?

ক. মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা করা
খ. খাদ্যে ক্ষতিকর উপাদানের ব্যবহার রোধ করা
গ. খাদ্য মান বজায় রাখা ।
ঘ. উপরের সব কটি ।

২. খাদ্য আইনের ক্ষেত্রে নীতিমালা কয় রকমের -

ক. দুই রকম
খ. তিন রকম
গ. চার রকম
ঘ. উপরের সব কটি ।

৩. Federal Food and Drug Law কোন দেশে গঠিত হয়

ক. USA
খ. England
গ. Russia
ঘ. Bangladesh

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. খাদ্য আইন বলতে কী বোঝ?
২. খাদ্য আইন সৃষ্টির কারণগুলো কী?
৩. খাদ্য আইন কত প্রকার ও কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুযায়ী নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ-এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা উল্লেখ কর ।

একাদশ অধ্যায়
খাদ্যের নির্ধারিত মানদণ্ড

১১.১ খাদ্যের নির্ধারিত মানদণ্ড (Food Standard)

মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে খাদ্যের প্রাকৃতিক গুণাগুণ বজায় রাখা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যে নীতিমালার মাধ্যমে সংগৃহীত কাঁচামাল, অ্যাডিটিভস, প্রস্তুতপ্রণালি এবং বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে খাদ্যের নির্ধারিত মানদণ্ড বা ফুড স্টান্ডার্ড বলে।

তবে প্রস্তুতকৃত খাদ্যের গুণগতমান সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মধ্যে আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখার মতো বা নির্ণয় করার মতো ব্যবস্থা বা নিয়মাবলি সংযোজনও এর আওতাভুক্ত।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক খাদ্য আইনের আওতায় বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর নির্ধারিত মানদণ্ড ও মান নির্দিষ্টকরণ একটি নীতিমালার মধ্যে আনা হয়েছে। এটা করা হয়েছে ক্রেতাসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা, খাদ্যদ্রব্যের গুণগত মান বজায় রাখা এবং বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য ভেজালকরণ প্রতিরোধ করতে।

১১.২ খাদ্যের নির্ধারিত মানদন্ডের গাঠনিক উপাদান

১. প্রতিটি খাদ্যদ্রব্যের সংজ্ঞা বা নামকরণ
২. প্রস্তুতপ্রণালি
৩. উপাদান নির্দিষ্টকরণ ও তাতে ব্যবহৃত কাঁচামাল
৪. অ্যাডিটিভস
৫. প্রক্রিয়াজাতকরণের পদ্ধতি
৬. বিশ্লেষণ পদ্ধতি
৭. প্যাকেজিং
৮. প্যাকেজিং সামগ্রী
৯. খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি
১০. লেবেলিং
১১. মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
১২. হাইজিন ও স্যানিটেশন

এসব বিষয়ে যে নীতিমালা বা মানদণ্ড তৈরি করা হয়েছে নীতিগতভাবে তা মেনে চলতে আমরা বাধ্য। এটাই খাদ্যের নির্ধারিত মানদণ্ড বা ফুড স্টান্ডার্ড (Food Standard)।

১১.৩ কৃত্রিম ভিনেগার ব্যবহারে নির্ধারিত মানদণ্ড ও নির্দিষ্ট বিবরণ

কৃত্রিম ভিনেগার হলো অ্যাসিটিক অ্যাসিড থেকে প্রস্তুত পানীয় দ্রবণ। এক্ষেত্রে ১০০ মি.লি. পানিতে কোনো ক্রমেই ৩.৭৫ গ্রাম-এর চেয়ে কম অ্যাসিটিক অ্যাসিড থাকতে পারবে না।
এছাড়া এতে নিম্নবর্ণিত দ্রব্যসমূহ না থাকা কাম্য :

১. সালফিউরিক অ্যাসিড বা অন্য কোনো জৈব অ্যাসিড।
২. সিসা ও তামা

৩. আর্সেনিকের পরিমাণ প্রতি মিলিয়নে ১.৫ ভাগের বেশি নয়।
৪. ক্যারামেল ব্যতীত অন্য কোনো রং।

১১.৪ রঙিন দ্রব্য এবং সংরক্ষক-এর নির্ধারিত মানদণ্ড ও নির্দিষ্ট বিবরণ

রঙিন দ্রব্য

শুধুমাত্র আইনত অনুমোদিত রং ছাড়া অন্য কোনো রং খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহার করা যাবে না। বাইরে থেকে কোনো রং যোগ করলে তা অবশ্যই বোতল বা প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ করতে হবে এবং বড় হাতে লিখতে হবে- যেমন 'ক্রিম রং যুক্ত' বা 'ARTIFITIALLY COLOURED' তবে ক্যারামেল কালারের ক্ষেত্রে উল্লেখ না করলেও চলবে। নিম্নলিখিত কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক ফুড কালারসমূহ যে কোনো খাবারে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন–

প্রাকৃতিক রং

১. এনাটো কালার
২. বিটা- এপো- ৮- ক্যারোটিনাল
৩. ক্যানথাজ্যানথিন
৪. ক্লোরোফিল
৫. রিবোফ্লাভিন
৬. ক্যারামেল
৭. স্যাফরন
৮. টারমারিক

রং	সাধারণ নাম
১. লাল	কারময়সিন
	ফাস্ট রেড
	এমারান্থ
২. হলুদ	ইরাইথ্রোসিন
	টারট্রাজাইন
৩. নীল	সানসেট ইয়োলো
	ইনডিগো টারমাইন
	ব্রিলিয়েন্ট ব্লু এফসিএফ
৪. গ্রিন	গ্রিন এস ফাস্ট
	গ্রিন এফসিএফ

সংরক্ষক

রাসায়নিক সংরক্ষক মূলত দুই প্রকার :

১. ক্লাস ওয়ান বা প্রথম শ্রেণির সংরক্ষক
২. ক্লাস টু বা দ্বিতীয় শ্রেণির সংরক্ষক

সংক্ষণের জন্য এগুলো যে কোনো খাদ্যদ্রব্যে মানদণ্ডে উল্লেখিত পরিমাণে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক্লাস ওয়ান বা প্রথম শ্রেণির সংরক্ষক

১. সাধারণ লবণ
২. চিনি
৩. ডেক্সট্রোজ
৪. গ্লুকোজ সিরাপ
৫. কাঠ পোড়ানো ধোঁয়া
৬. বিভিন্ন ধরনের মশলা
৭. ভিনেগার বা অ্যাসিটিক অ্যাসিড
৮. মধু

ক্লাস টু সংরক্ষক বা দ্বিতীয় শ্রেণির সংরক্ষক

১. বেনজয়িক অ্যাসিড বা এর যে কোনো লবণ।
২. সালফিউরিক অ্যাসিড এবং এর যে কোনো লবণ।
৩. সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের নাইট্রেট এবং নাইট্রাইট (মাংস পিকেলিং-এর জন্য ব্যবহার করা হয়)।
৪. সরবিক অ্যাসিডের সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্যাসিয়ামের লবণ এবং প্রপায়নিক অ্যাসিডের ক্যালসিয়াম ও সোডিয়ামের লবণ।
৫. নিসিন।
৬. সালফার ডাই-অক্সাইড।
৭. পটাশিয়াম মেটা বাই-সালফাইট ও সোডিয়াম মেটা বাই-সালফাইট।

উপর্যুক্ত দ্রব্যসমূহ বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন–

খাদ্যদ্রব্য	সংরক্ষক	পরিমাণ (পিপিএম)*
১. ফল, ফলের পাল্প, জুস, জ্যাম, জেলি	সালফার-ডাই-অক্সাইড বা বেনজয়িক অ্যাসিড	৪৫০ ৬০০
২. টমেটো সস বা অন্য যে কোনো সস	বেনজয়িক অ্যাসিড	৭৫০
৩. আচার এবং চাটনি	বেনজয়িক অ্যাসিড বা সালফার ডাই অক্সাইড	২৫০ ১০০
৪. রেডি টু সার্ভ ড্রিংক	সালফার ডাই অক্সাইড বা বেনজয়িক অ্যাসিড	৭০ ১২০
৫. স্কোয়াশ	সালফার ডাই অক্সাইড বা বেনজয়িক অ্যাসিড	৩৫০ ৬০০
৬. চিজ	সরবিক অ্যাসিড ও তার লবণ নিসিন	১০০০ ১০০০
৭. ময়দার কনফেকশনারি দ্রব্য	সরবিক অ্যাসিড বা সোডিয়াম সরবেট	১৫০০

PPM : Parts Per Million

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কোনটি নির্ধারিত খাদ্যবিধির গাঠনিক উপাদান?

ক. খাদ্যদ্রব্যের সংজ্ঞা বা নামকরণ
খ. প্রক্রিয়াজাতকরণের পদ্ধতি
গ. উপাদান নির্দিষ্টকরণ ও তাতে ব্যবহৃত কাঁচামাল
ঘ. উপরের সব কটি ।

২. নিচের কোন কৃত্রিম এবং প্রাকৃতিক ফুড কালার খাদ্যে ব্যবহার করা যায়?

ক. ক্যানথাজ্যানথিন
খ. ক্লোরোফিল
গ. রিবোফ্লাভিন
ঘ. উপরের সব কটি ।

৩. নিচের কোনটি প্রথম শ্রেণির সংরক্ষক–

ক. সাধারণ লবণ
খ. চিনি
গ. মধু
ঘ. উপরের সব কটি ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. খাদ্যের নির্ধারিত মানদণ্ড বলতে কী বোঝ?
২. কৃত্রিম ভিনেগার ব্যবহারের নির্ধারিত মানদণ্ড ও নির্দিষ্ট বিবরণ লিখ ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. নির্ধারিত মানদণ্ডের গাঠনিক উপাদানগুলো কী কী?
২. সংরক্ষক কী ও কত প্রকার? এদের ব্যবহারের নির্ধারিত মানদণ্ড বর্ণনা কর ।

দ্বাদশ অধ্যায়
খাদ্যদ্রব্য প্যাকেজিং/মোড়কীকরণ

১২.১ প্যাকেজিং

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে প্যাকেজিং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। যে কোনো প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যই হোক না কেন মোড়কে না ভরে সংরক্ষণ বা বাজারজাত করার প্রশ্নই আসে না। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে মোড়কীকরণ ধাপটি আসে সবার শেষে। খাদ্য সঠিকভাবে মোড়কীকরণের পরই বিক্রয়ের জন্য তৈরি হয়। ত্রুটিপূর্ণ মোড়কীকরণে অনেক ভালো মানের খাদ্যদ্রব্যও নষ্ট হয়ে যায় আবার সঠিকভাবে মোড়কীকৃত বিশেষ করে টিনজাতকৃত খাদ্যের জীবনকাল কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

সংজ্ঞা

খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ বা বাজারজাতকরণের তাগিদে কাগজ, পলিথিন, সেলুলোজ, টিনপ্লেট বা অন্য কোনো বস্তু হতে প্রস্তুত পাতলা শিট দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আবৃত করে ধুলাবালি, আলো-বাতাস, জলীয়কণা বা রোগজীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় মোড়কীকরণ বা প্যাকেজিং।

মোড়কীকরণের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব

খাদ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণসহ অধুনা প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ক্ষেত্রেই মোড়কীকরণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

১. মোড়কীকরণে খাদ্যের গুণগত মান রক্ষিত হয়, খাদ্যের আয়ুষ্কাল বেড়ে যায়।
২. বাহ্যিক ক্ষতিকর উপাদান, পরিবেশ, কীটপতঙ্গ ও ক্ষতিকর বস্তু থেকে খাদ্যকে রক্ষা করে।
৩. উপযুক্ত মোড়কের ব্যবহার খাদ্যে অণুজৈবিক ক্রিয়ার গতি রোধ বা ব্যাহত করে।
৪. খাদ্যে বায়ু ও পানি প্রবেশে বাধা প্রদান করে খাদ্যের অণুজৈবিক, রাসায়নিক ইত্যাদি পরিবর্তন হ্রাস করে অথবা কাঙ্ক্ষিত সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়।
৫. মোড়কীকরণ বার্তা বহনে এবং মানুষকে জ্ঞান প্রদান করতেও সমর্থ। একটি মোড়কের ভেতর কী সামগ্রী আছে তা মোড়কটি বলে দেয়। এ ছাড়াও প্রস্তুতকারী কোম্পানির নাম, প্রস্তুতির সময়, পরিমাণ, মূল্য ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় মোড়কে উল্লেখ থাকে।
৬. বাহ্যিক আঘাত (যা খাদ্যকে ত্রুটিপূর্ণ করে) থেকে খাদ্যকে রক্ষা করে।
৭. খাদ্যের চুরি বন্ধ করতে ভূমিকা রাখে।
৮. আলো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন খাদ্যকে আলো থেকে রক্ষা করে (যেমন-অস্বচ্ছ বোতল)।
৯. খাদ্যকে ভোক্তার কাছে আকর্ষণীয় করে ভোক্তাকে সেই খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট করে খাদ্যের বিক্রি বাড়িয়ে দেওয়া।
১০. মাঝারি আর্দ্রতা বহনকারী খাদ্য (intermediate moisture foods) থেকে জলীয় অংশ বের হয়ে যেতে বাধা প্রদান করে।
১১. খাদ্যকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠাতে ঝামেলামুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করে।

১২.২ প্যাকেজিং সামগ্রীর তালিকা

প্যাকেজিং সামগ্রী হিসাবে প্রধানত নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ ব্যবহৃত হয়ে থাকে–

প্যাকেজিং সামগ্রী	**প্রস্তুত প্যাকেজ**
১. টিন প্লেট	টিন কনটেইনার
২. গ্লাস	গ্লাস কনটেইনার
৩. প্লাস্টিক	প্লাস্টিক কনটেইনার, ফ্লেক্সিবল ব্যাগ, প্লাস্টিক বোতল, জার
৪. মোটা কাগজ	ব্যাগ, প্যাকেট, কার্টন, মোড়ক ইত্যাদি

নমনীয় প্যাকেজিং সামগ্রী

১. প্লাস্টিক ফিল্ম	→ প্লাস্টিক ব্যাগ
২. হাইডেনসিটি পলিইথিলিন শিট	→ পলি ব্যাগ
৩. লো-ডেনসিটি পলিইথিলিন শিট	→ পলি ব্যাগ
৪. পলি প্রপাইলিন শিট	→ পিপি ব্যাগ
৫. পলিস্টাইরিন শিট	→ ব্যাগ
৬. বিভিন্ন ধরনের লেমিনেটেড শিট	→ ল্যামিনেটেড প্যাক
৭. অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল	→ ল্যামিনেটেড প্যাক
৮. সেলোফেন	→ ল্যামিনেটেড প্যাক

প্যাকেজিং সামগ্রী (প্যাকেট/মোড়ক) নির্বাচন

একটি মোড়ককে এমনভাবে বাছাই করতে হবে যা উৎপন্ন দ্রব্যকে পর্যাপ্তভাবে রক্ষার নিশ্চয়তা দেয় এবং মোড়ককৃত দ্রব্যটি যেন আকর্ষণীয় সুবিধাজনক ও সস্তা হয়। একটি খাদ্যবস্তুর সাফল্য কেবল উল্লেখিত মোড়কীকরণের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে। মোড়ক বাছাইকরণ অনেকগুলো দিক বিবেচনার ওপর নির্ভর করে যা নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) খাদ্যবস্তু সুরক্ষা

১. শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা : মোড়কীকরণের উপাদান টেকসই, ধুলাবালি, পোকামাকড়, অণুজীব ইত্যাদি থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয় শক্তি সম্পন্ন এবং উপযুক্ত আলোর প্রবেশ ও উপযুক্ত তাপ পরিবহন ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে।

২. রাসায়নিক রক্ষা : মোড়কীকরণের উপাদান হবে নিষ্ক্রিয়, গন্ধহীন, স্বাদহীন এবং গ্যাস বাষ্প বা তরল শোষণ বা পরিবহনের উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন উপাদানকে অবশ্যই অভিপ্রেত ব্যবহারের সময় নিষ্ক্রিয় হতে হবে।

(খ) সুবিধা এবং আকর্ষণীয়তা

১. **মজুদকরণ এবং হ্যান্ডেলিং গুণাবলি :** মোড়কের ওজন, আকার ও আকৃতি খরিদ্দার ও উৎপাদনকারী উভয়ের জন্যই প্রয়োজনীয়। এটি ছাড়াও খাদ্যপণ্য দ্রুত প্যাকেট ভর্তিকরণ ও সিলকরণের দিকেও প্রস্তুতকারককে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্যাকেটে যে সকল সুবিধা থাকতে হবে তা নিম্নরূপ :

ক. প্যাকেটের মুখ বা ছিপি খুলতে হবে সহজভাবে ।
খ. প্যাকেট থেকে সহজে পণ্য অবমুক্ত করার সুবিধা থাকা দরকার ।
গ. প্রয়োজনমতো খুলতে ও বন্ধ করতে হবে সহজভাবে ।
ঘ. সহজভাবে বাজারজাত করার সুবিধা ।
ঙ. আকর্ষণীয়তা ।

(গ) মূল্য নির্ধারণ

নিচু মানের খাদ্যসামগ্রীর জন্য প্যাকেজের মূল্য নির্ধারণ অত্যন্ত জটিল ।

১২.৩ প্যাকেজিং সামগ্রীর বৈশিষ্ট্য

প্যাকেজিং সামগ্রী	বৈশিষ্ট্য
ক্রাফট পেপার	ক্রাফট পেপার কিছুটা শক্ত, ছিদ্রময় এবং প্রসারণশীল কিন্তু এদের গ্রিজ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই ।
গ্রিজ প্রুফ পেপার	এর ভিতরে গ্রিজ প্রবেশ করতে পারে না কারণ এতে ডাইক্লো হেক্সাইল এমিন এর প্রলেপ থাকে ।
গ্লাইসিন পেপার	এক ধরনের স্বচ্ছ এবং চকচকে কাগজ। গ্রিজ প্রতিরোধক এবং গন্ধ প্রতিবন্ধক ।
ওয়াক্সড পেপার	কাগজের উপর মোমের প্রলেপ দেওয়া থাকে । গ্রিজ প্রতিরোধক, দীর্ঘস্থায়ী এবং জলীয় কণা প্রতিবন্ধক । তাপে জোড়া লাগে এবং পানিতে ভিজে না ।
অ্যাফলটেড পেপার	দুই প্রস্থ কাগজের মাঝে বিটুমিন-এর প্রলেপ দিয়ে জোড়া লাগিয়ে প্রস্তুত করা হয় । সামান্য জলীয় কণা রোধক হিসেবে কাজ করে ।
ভেজিটেবল পার্চমেন্ট পেপার	গ্রিজ প্রতিরোধক এবং পানিতে ভিজালেও সহজে নষ্ট হয় না ।
ক্রাফট বোর্ড	সালফেট পাল্প থেকে প্রস্তুত এক ধরনের হলদে রঙের ক্রাফট পেপার ।
পেপার বোর্ড	এটি কাগজের চেয়ে বেশি পুরু অধিকতর শক্ত এবং এক স্তর বিশিষ্ট কার্টন তৈরিতে ব্যবহৃত হয় । এটি যদি মোম (wax) দ্বারা আবৃত থাকে তবে তা তাপ প্রয়োগ সিল করা সম্ভব ।
ফাইবার বোর্ড	শক্ত কাগজের কয়েকটি স্তর দ্বারা ফাইবার বোর্ড গঠিত হয় । করোগেটেড পেপার বোর্ড শিপিং কার্টন তৈরিতে ব্যবহার হয় ।
লেমিনেটেড শিট	দুই বা ততোধিক প্যাকেজিং সামগ্রীর পাতলা শিট পরস্পর একত্রে সংযুক্ত করে একক শিট তৈরি করা হয় । বাইরের পার্শ্বে পেপার বা সেলোফেন এবং ভিতরের পার্শ্বে পলিথিন বা পলিপ্রপিলিন এবং এই লেয়ার-এর মাঝে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল থাকতে পারে ।

লো-ডেনসিটি পলিইথিলিন (LDPE)	এটি প্রসারণশীল, শক্তিশালী, নমনীয় এবং তাপে সহজে জোড়া লাগে। অতি অল্প মাত্রায় জলীয় কণা প্রবেশ করতে পারে। এটি স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণহীন এবং রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়। ধীরে ধীরে খাবারের গন্ধ বের হয়ে যায়। ৯০° সে. তাপমাত্রায় গলে যায়।
হাইডেনসিটি পলিইথিলিন (HDPE)	লো-ডেনসিটি পলিইথিলিনের চেয়ে বেশি প্রসারণশীল, বেশি শক্তিশালী এবং কম মাত্রায় গ্যাস ও জলীয় কণা প্রবেশ করতে পারে। ১০০° সে. তাপমাত্রায়ও নরম হয় না। তাপে সহজে জোড়া লাগে।
পলি প্রপাইলিন (PP)	স্বচ্ছ, হাই-ডেনসিটি পলিথিলিনের চেয়ে বেশি জলীয় কণা প্রবেশ করতে পারে এবং নরম হওয়ার তাপমাত্রাও বেশি, তেল ও চর্বি প্রতিরোধক। তাপে জোড়া লাগে এবং নমনীয়।
পলিস্টাইরিন	অল্প জলীয় কণা প্রতিরোধক কিন্তু যথেষ্ট গ্যাস প্রবেশ্য। এটি নমনীয়। তাপে জোড়া লাগে।
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল	এটা অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর তৈরি খুব পাতলা শিট। সবচেয়ে ভালো জলীয় কণা, গ্যাস এবং খাদ্যে উপস্থিত উদ্বায়ী তেল প্রতিরোধক। তাপে জোড়া লাগে না। এই কারণে ল্যামিনেটেড শিটের মাঝখানে স্থাপন করা হয়।

১২.৪ প্যাকেজিং সামগ্রীর খাদ্যভিত্তিক ব্যবহার

প্যাকেজিং সামগ্রী	ব্যবহার
ক্রাফ্‌ট পেপার	পাউডার জাতীয় খাদ্য, ময়দা দানাদার শস্য, শিম, মটর, আলু ও বিভিন্ন ফল মোড়কীকরণে ব্যবহৃত হয়।
গ্রিজ প্রুফ পেপার	মাছ, মাংস, দুধজাত দ্রব্য এবং কনফেকশনারি দ্রব্য প্যাকেজিং-এর কাজে ব্যবহার হয়।
গ্লাইসিন পেপার	বিস্কুট, কপি, বাটার এবং ডেজার্ট পাউডার প্যাকেট করার কাজে ব্যবহৃত হয়।
ওয়াক্সড পেপার	সাধারণত বিস্কুট, দুধ, ফলের রস ইত্যাদি প্যাকেটজাত করার কাজে ব্যবহৃত হয়।
ট্র্যাসফলটেড পেপার	প্যাকেটের ওভার র‍্যাপিং সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
ভেজিটেবল পার্চমেন্ট পেপার	মাখন, মাংস এবং হিমায়িত খাদ্যদ্রব্য প্যাকেট করার কাজে ব্যবহৃত হয়।
পেপার বোর্ড	খাদ্যপণ্য মোড়কীকরণের জন্য কনজিউমার প্যাকেট কার্টন তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।
ফাইবার বোর্ড	সেকেন্ডারি শিপিং কার্টন তৈরিতে ব্যবহার হয়।
লেমিনেটেড শিট	হিমায়িত খাদ্য, প্রক্রিয়াজাত মাংস, ফলের রস, দুধ ও ফাস্টফুড প্যাকেট করতে ব্যবহৃত হয়।
লো-ডেনসিটি পলিইথিলিন (LDPE)	রুটি, হিমায়িত খাদ্য, ননিশূন্য গুঁড়ো দুধ, সসেজ এবং মিটপাই প্যাকিং-এর কাজে ব্যবহৃত হয়।

হাইডেনসিটি পলিইথিলিন (HDPE)	এটা দিয়ে তৈরি ব্যাগে ভরে শাকসবজি ফুটন্ত পানিতে সিদ্ধ করা যায়। শপিং ব্যাগ এবং ড্রাম লাইনার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
পলি-প্রপাইলিন (PP)	চিজ, বেকন, রান্না করা মাংস, বিস্কুট ও পটেটো চিপস প্যাকেট করা যায়।
পলিস্টাইরিন	টাটকা ফল ও শাকসবজি প্যাকেট করতে ব্যবহার করা হয়।
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল	বিস্কুট, কফি পাউডার, গুঁড়ো দুধ, গুঁড়া মসলা, ডিমের পাউডার ইত্যাদি দ্রুত জলীয় বাষ্প গ্রহণকারী যে কোনো খাদ্যদ্রব্য প্যাকেট করার উপযোগী।

১২.৫ প্যাকেজিং-এর প্রকারভেদ

প্যাকেজিং বা মোড়কীকরণ তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

প্রাইমারি : যে সমস্ত মোড়ক সরাসরি খাদ্যের সান্নিধ্যে আসে তাদের প্রাইমারি মোড়ক বলা হয়। উদাহরণ যেমন– ক্যান, জার ইত্যাদি। যেহেতু প্রাইমারি মোড়ক সরাসরি খাদ্যের সান্নিধ্যে আসে সেহেতু এগুলো খাদ্যের জন্য উপযুক্ত হবে এবং বিষাক্ত হবে না এবং খাদ্যের বর্ণ, স্বাদ, ঘ্রাণ ইত্যাদির উপর কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলবে না।

সেকেন্ডারি : সেকেন্ডারি মোড়ক একক মোড়ক যেমন কয়েকটি ক্যান, জার, পাউস ইত্যাদি একত্রে ধারণ করবে এবং এতে পরিবহন ও গুদামজাতকরণ সহজতর হয়। প্রাইমারি মোড়কগুলোকে ধুলাবালি ও কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। প্রাইমারি মোড়কের ন্যায় এটি আর্দ্রতা বা পানি, গ্যাস, বায়ু ইত্যাদির প্রবেশ ততোটা বাধা প্রদান করতে পারে না, তবু প্রাইমারি মোড়ককে এসবের আক্রমণ ও ভৌত আঘাত থেকে রক্ষা করতে সেকেন্ডারি মোড়কের আবশ্যকতার বিকল্প নেই। করোগেটেড কার্টন এর প্রধান উদাহরণ।

টারসিয়ারি : কয়েকটি সেকেন্ডারি মোড়ককে একত্রে ধারণ করে দূরবর্তী জায়গায় বহন করতে টারসিয়ারি মোড়কের প্রয়োজন হয়। খাদ্যসামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ করে জাহাজ ও এয়ার কার্গোতে বহন করতে এ ধরনের মোড়কের প্রয়োজন হয়।

১২.৬ ল্যাকারস (Lacquers) :

একে ক্যানের অভ্যন্তরীণ আবরণ (Coat) বা আচ্ছাদন বলা হয়। তবে সাধারণভাবে ল্যাকার বলতে এক ধরনের বস্তুর আবরণকে বোঝায় যা খাদ্যদ্রব্য এবং কনটেইনারের ভিতরের পার্শ্বে অবস্থান করে খাদ্যবস্তুকে কনটেইনার-এর সরাসরি সংস্পর্শে আসতে বাধা দেয়। ফলে ক্যানে রাসায়নিক ক্ষয় (Corrosion) হতে পারে না।

ল্যাকারের বৈশিষ্ট্য :

১. ল্যাকার বিষাক্ত হওয়া উচিত নয়।
২. ল্যাকার সর্বদা অবিচ্ছিন্ন এবং দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকা প্রয়োজন।

৩. ল্যাকারের গন্ধ খাদ্যদ্রব্যে প্রবেশ করা ঠিক নয়।
৪. ল্যাকারের যান্ত্রিক চাপ সহ্য বা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকা দরকার।

১২.৭ প্যাকেজিং পদ্ধতি

অ্যাসেপটিক প্যাকেজিং পদ্ধতি

খাদ্য সংরক্ষণের বিশেষ করে উন্নত প্যাকেজিং পদ্ধতি ব্যবহার করে তরল খাদ্য, যেমন-ফলের রস, তরল দুধ সংরক্ষণের জন্য অ্যাসেপটিক পদ্ধতির ব্যবহার বর্তমানে একটি নির্ভরযোগ্য, বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। এ পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ করা হলে খাদ্যের আয়ুষ্কাল কয়েক বছর পর্যন্ত থাকতে পারে। খাদ্যের স্বাদও প্রায় মূল খাদ্যের মতো অক্ষুণ্ন থাকে। অ্যাসেপটিক পদ্ধতিতে খাদ্য ও প্যাকেট বা প্যাকেজ আলাদা আলাদাভাবে স্টেরিলাইজেশন করা হয় এবং সেই স্টেরিলাইজেশন করা খাদ্য স্টেরিলাইজেশন করা প্যাকেটে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে (অ্যাসেপটিক এনভায়রনমেন্ট) ভর্তি করে সিল করতে হয়।

প্যাকেজ স্টেরিলাইজেশন→
→ খাদ্যের প্যাকেজিং (জীবাণুমুক্ত পরিবেশে) → অ্যাসেপটিক প্রডাক্টস
খাদ্যদ্রব্য স্টেরিলাইজেশন→

সুবিধা

১. প্যাকেজের ভেতর জলীয় বাষ্প প্রবেশ করা সুকঠিন, অনেক দিন অ্যাসেপটিক প্যাকেটজাত খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়।
২. অক্সিজেনসহ বিভিন্ন গ্যাসের প্যাকেজে প্রবেশ মাত্রা খুবই নগণ্য।
৩. প্যাকেটজাত খাদ্যের সুঘ্রাণ বজায় থাকে এবং বাহ্যিক দূষণ থেকে মুক্ত থাকে।
৪. খাদ্যের সাথে প্যাকেটের উপাদানের রাসায়নিক কোনো বিক্রিয়া ঘটে না।
৫. সঠিক প্যাকেজিং সিস্টেমে নিকট সমগ্রতা রক্ষিত হয়।
৬. উচ্চ ও নিম্ন উভয় তাপমাত্রার প্রতি সহিষ্ণুতা গুণ সম্পন্ন।
৭. প্যাকেজিং সিস্টেম আইনগত সকল বিষয় পূর্ণ করে।

অ্যাসেপটিক প্যাকেজের প্রকারভেদ

অ্যাসেপটিক প্যাকেজকে কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. নমনীয় পাউসেস (Pouches) ও ব্যাগ।
২. কার্টন এফ. এফ. এস. সিস্টেম (form-fill-seal-system) যা টেট্রাপ্যাক ও টেট্রা ব্রিক মূলনীতির অনুরূপ।
৩. থার্মোফর্ম-ফিল-সিল সিস্টেম।
৪. ব্যাগ-ইন-বক্স সিস্টেম।
৫. গতানুগতিক প্যাকেজ যা কাচ, টিনপ্লেট ইত্যাদি থেকে নির্মিত।

হট-ফিল-হোল্ড সিস্টেম (Hot fill hold system)

এগুলোকে অ্যাসিড জাতীয় খাদ্য ও বেভারেজের জন্য ব্যবহার করা হয়। খাদ্যকে পাত্রে ৭০-৯০° সে. তাপমাত্রায় ভর্তি করে সিল করা হয় এবং সেই তাপমাত্রায় ১-৩ মিনিট ধরে রেখে কমার্শিয়াল স্টেরিলিটি অর্জন করা হয়।

এ পদ্ধতির জন্য ব্যবহৃত প্যাকেজ তাপ ও আর্দ্রতা প্রতিরোধক হবে এবং বায়ুশূন্য অবস্থা সহ্য করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে গতানুগতিক ধাতব ক্যান ও কাচ-পাত্র উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে।

টেট্রাহেড্রাল আকৃতির পাউসেস (টেট্রাপ্যাক) তরল খাদ্য অ্যাসেপটিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। এটি অন্যান্য ডিজাইনের প্যাকেজের চেয়ে কম প্যাকেজিং সামগ্রী ব্যবহার করে।

এই পদ্ধতিতে তরলজাতীয় খাদ্য স্টেরিলাইজ করা হয়। অন্যদিক দিয়ে প্যাকেজিং সামগ্রী রিল থেকে বেন্ডিং রোলারের মধ্য দিয়ে একটা টিউবে উল্লম্বভাবে অবস্থিত তাপীয় সিলের সান্নিধ্যে আসে। তারপর এটি সেই স্টেরিলাইজেশন করা তরল দ্বারা চাহিদামাফিক মাত্রায় পূর্ণ করা হয় ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিল করা হয়। পদ্ধতিটি অবিরত প্যাকেজের ভিতর কোনো হেডস্পেস থাকে না। এক্ষেত্রে ট্রান্সভার্স সিল উৎপন্ন হয় তাপ ও চাপ থেকে।

১২.৮ প্যাকেট বা কনটেইনারে লেবেল লাগাবার পদ্ধতি

লেবেল অর্থ কোনো জিনিস বা মোড়কের গায়ে তার সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক বিবরণ। অবশ্যই এ বিবরণ দেশীয় বা আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতিমালার মধ্যে হতে হবে। আমাদের দেশে এ নীতিমালা নিয়ন্ত্রণ করে বিএসটিআই (BSTI) বা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট। লেবেলের বিষয়বস্তু নিচে দেওয়া হলো :

১. খাদ্যদ্রব্যের নাম উল্লেখ করতে হবে।
২. প্যাকিং মাধ্যমের নাম লিখতে হবে, যেমন– তেলে ভাজা বা পানিতে সিদ্ধ।
৩. প্রস্তুত খাদ্য যোগকৃত সকল ধরনের বস্তু বা ইনগ্রেডিয়েন্টস-এর তালিকা উল্লেখ করতে হবে। যেমন- তেল, মসলা, লবণ, সংরক্ষক ইত্যাদি।
৪. খাদ্যবস্তুর ওজন বা নেট ওয়েট উল্লেখ করতে হবে। যেমন- ১০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম ইত্যাদি।
৫. খাদ্যবস্তুসহ প্যাকেটের ওজন বা গ্রস ওয়েট উল্লেখ করতে হবে।
৬. ড্রেইন্ড ওয়েট উল্লেখ করতে হবে।
৭. প্রস্তুতকারকের নাম উল্লেখ করতে হবে।
৮. কোন দেশের তৈরি তার নাম থাকতে হবে।
৯. শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নাম, কোড নম্বর ও লট নম্বর উল্লেখ করতে হবে।
১০. প্রস্তুত করার তারিখ এবং ব্যবহার উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ উল্লেখ করতে হবে।
১১. খাদ্যদ্রব্যে কোনো রং ব্যবহার করলে অবশ্যই লিখতে হবে ARTIFICIALLY COLOURED
১২. ব্যবহার বিধি (যেখানে প্রযোজ্য)

উপরোক্ত বিষয়াবলি উল্লেখপূর্বক লেবেল প্যাকেট বা খুচরামূল্য কনটেইনারের গায়ে লাগাতে হবে।

১২.৯ লেবেলে আইনগত বাধ্যবাধকতা

মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা ও খাদ্যে ক্ষতিকর উপাদানের ব্যবহার রোধ করে সঠিক পরিমাণ, গুণগত ও নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির তাগিদে উপরে বর্ণিত বিএসটিআই (BSTI) নির্দেশিত বিষয়বস্তুর কোনো তথ্য গোপন করা যাবে না। সবকিছু পরিষ্কার ও স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে যেন ক্রেতা সাধারণের মনে কোনো প্রকার সন্দেহের উদ্রেক না হয়।

লেবেলে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা যাবে না। যেমন–

১. কোন জিনিস যোগ না করে উল্লেখ করা যাবে না।
২. কোনো বস্তু যেমন– ফলের রস বা অন্য কিছু না থাকলে তার ছবি দেওয়া যাবে না।

লেবেলিং-এর ক্ষেত্রে করণীয় বা নিষিদ্ধ যে কোনো বিষয়ই অমান্য করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

১২.১০ খাদ্যমান নিয়ন্ত্রণে প্যাকেজিং-এর ভূমিকা

খাদ্য মান নির্ণয় : কোনো জিনিসের সঠিক গুণাগুণ বজায় আছে কিনা তা পরীক্ষা করাকে মান নির্ণয় বলা হয়। কোনো খাদ্যের গুণাগুণ, খাদ্যমান, পুষ্টিমান, সঠিকভাবে বজায় আছে কিনা তা নির্ণয় করাকে খাদ্যের মান নির্ণয় বলে।

মান নিয়ন্ত্রণ : খাদ্যের গুণাগুণ, খাদ্যমান ও পুষ্টিমান সঠিকভাবে বজায় রাখাকে বা নিয়ন্ত্রণ করাকে খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ বলে। খাদ্য শিল্পে মান নির্ণয় ও মান নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কনফেকশনারি দ্রব্য : কনফেকশনারি খাদ্যের সাধারণ গুণ এই যে, এ ধরনের খাবার সাধারণত মচমচে হয়। কিন্তু খোলা স্থানে এ খাদ্য রেখে দিলে নরম হয়ে যায়। এর ফলে খাদ্যের স্বাদ ও বুনটের (Texture) ঘাটতি হয়। সাধারণত জলীয় অংশের পরিমাণ বেশি হলে খাবার নরম হয়। এসব খাবার বায়ুরোধী প্যাকেটে রাখলে খাবার মচমচে থাকে। সাধারণত পলিথিন সেলোফিন বা লেমিনেটেড ফয়েলের ব্যাগে এ খাবার প্যাকেট করা হয়।

ভোজ্যতেল : সাধারণত ভোজ্যতেল অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে তেলে খারাপ গন্ধ হয়। তখন তেল খাবার অযোগ্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থাকে রেনসিডিটি (Rancidity) বলে। তাই বাতাস থেকে নিরাপদ স্থানে তেল রাখতে হবে। এজন্য তেল বায়ুরোধী প্যাকেটে সরবরাহ করা হয়।

দুগ্ধজাত খাদ্য : দুগ্ধজাত খাদ্য যেমন গুঁড়ো দুধ ঝরঝরে হয়। দুধ যদি খোলা স্থানে রাখা হয় তাহলে জমাট বেঁধে যায়। এতে দুধের গুণগত মান নষ্ট হয়। তাই দুধ সাধারণত ল্যামিনেটেড অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, টিনের ক্যানে প্যাকেট করা হয়। কারণ এদের ভিতর দিয়ে বাতাস বা পানি যেতে পারে না।

শুকনো গুঁড়া কফি, চা, হরলিকস, মালটোবা জাতীয় খাদ্যও নষ্ট হওয়ার কারণ বাতাসের আর্দ্রতা। তাই এগুলো বায়ুরোধী এবং পানি নিরোধক পাত্র যেমন ল্যামিনেটেড ফয়েল বা কাচের বয়মে প্যাকেট করা হয়।

দুধ, ফ্রুটজুস, সস, আচার এসব খাদ্য নষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ অণুজীব। খোলা স্থানে সহজেই এসব খাদ্য অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাই এসব খাবার জীবাণুমুক্ত প্যাকেটে রাখা হয়।

এছাড়া পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ, ইঁদুর ইত্যাদির আক্রমণে খাদ্য নষ্ট হয়। তাই এদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য খাদ্য প্যাকেট জাত করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে খাদ্য নষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণগুলো হচ্ছে আর্দ্রতা, অণুজীব, বায়ু ও পোকামাকড়। তাই সঠিক পদ্ধতিতে প্যাকেজিং-এর মাধ্যমে এগুলো রোধ করা সম্ভব।

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে সবার শেষের ধাপ কোনটি?
ক. চিলিং
খ. ব্লাঞ্চিং
গ. প্যাকেজিং
ঘ. ফ্রিজিং।

২. মোমের প্রলেপ দেওয়া থাকে-
ক. ওয়াক্স পেপারে
খ. গ্লাইসিন পেপারে
গ. ক্রাফট পেপারে
ঘ. গ্রিজ প্রুফ পেপারে

৩. অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল সবচেয়ে ভালো
ক. জলীয় কণা প্রতিরোধক
খ. গ্যাস প্রতিরোধক
গ. উদ্বায়ী তেল প্রতিরোধক
ঘ. সব কটি

৪. খাবার জীবাণুমুক্ত প্যাকেটে রাখা হয় কারণ-
ক. খাবার খুব পুষ্টিকর
খ. খাবার জলীয় কণা শোষণ করে
গ. খাবার জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়
ঘ. খাবারের ভালো গন্ধ আছে

৫. বিএসটিআই (BSTI) অর্থ-
ক. বাংলাদেশ সাইন্স টেস্টিং ইন্সটিটিউট
খ. বাংলাদেশ স্টুডেন্ট টিচিং ইন্সটিটিউট
গ. বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট
ঘ. বাংলাদেশ সয়েল টেস্টিং ইন্সটিটিউট

৬. লেবেলিং-এর ক্ষেত্রে করণীয় বা নিষিদ্ধ উভয় বিষয়ই অমান্য করা-
ক. যুক্তি সংগত
খ. আইনত সিদ্ধ
গ. আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ
ঘ. কোনোটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্যাকেজিং-এর সংজ্ঞা লিখ।
২. কী করে ফলমূল, কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়, বাহ্যিক আঘাত ও পচনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়?
৩. প্যাকেজিং সামগ্রীর নাম লিখ।
৪. মোড়ক বাছাইকরণের বিভিন্ন দিক উল্লেখ কর।
৫. ক্রাফট পেপার কি? এটি কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
৬. গ্রিজ পেপার কী? এটি কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
৭. ওয়াক্সড পেপারের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার লিখ।
৮. অ্যাসফলটেড পেপারের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার লিখ
৯. ভেজিটেবল পার্চমেন্ট পেপারের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার লিখ।
১০. ক্রাফট বোর্ড-এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারসমূহ লিখ।
১১. লো-ডেনসিটি পলিইথিলিন-এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারসমূহ লিখ।
১২. হাই-ডেনসিটি পলিইথিলিন-এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারসমূহ লিখ।
১৩. পলি প্রপাইলিন-এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারসমূহ লিখ।
১৪. পলিস্টাইরিন-এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারসমূহ লিখ।
১৫. অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল-এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারসমূহ লিখ।
১৬. ল্যামিনেটেড শিট-এর ব্যবহার লিখ।
১৭. প্যাকেজিং-এর প্রকারভেদ আলোচনা কর।
১৮. খাদ্যদ্রব্যের মান নির্ণয় বলতে কী বোঝ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্যাকেজিং বলতে কী বোঝ? প্যাকেজিং-এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
২. বিভিন্ন প্যাকেজিং সামগ্রী এবং প্রস্তুত প্যাকেজের নাম লিখ। প্যাকেজিং সামগ্রী নির্বাচন পদ্ধতি আলোচনা কর।
৩. অ্যাসেপটিক প্যাকেজিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪. প্যাকেট বা কনটেইনারে লেবেলের ক্ষেত্রে বিএসটিআই (BSTI) নির্দেশিত বিষয়বস্তু এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা আলোচনা কর।
৫. খাদ্যমান নিয়ন্ত্রণে প্যাকেজিং-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
ধারক বা কনটেইনার

১৩.১ ধারক বা কনটেইনার (Container)

খাদ্যদ্রব্য ঔষধ এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখার উপযোগী পাত্র, বাক্স, বোতল, কৌটা ইত্যাদিকে কনটেইনার বলা হয়।

প্যাকেট হিসাবে কনটেইনার একটি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। খাদ্যদ্রব্যের এমন কোনো বিভাগ নেই যে ক্ষেত্রে কনটেইনারের ব্যবহার নেই। তরল, কঠিন, পাউডার, ইমালশন, সাসপেনশন অথবা ট্যাবলেট যাই হোক না কেন সব ধরনের খাদ্যদ্রব্যই কনটেইনারে প্যাক করা সুবিধাজনক।

১৩.২ কনটেইনার প্রস্তুত

কনটেইনার প্রধানত চার ধরনের সামগ্রী দিয়ে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। যেমন-

১. টিন প্লেট
২. অ্যালুমিনিয়াম
৩. প্লাস্টিক দ্রব্যাদি
৪. গ্লাস (কাচ)

১৩.৩ টিন কনটেইনার

এটা প্রধানত টিনের প্রলেপ দেওয়া লোকার্বন স্টিল শিট দিয়ে তৈরি করা হয়। কনটেইনার বিভিন্ন আকার, আকৃতি ও আয়তনের হতে পারে। রাসায়নিক ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে এর ভেতর পার্শ্বে সিনথেটিক ল্যাকার দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। টিন কনটেইনারে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষিত রাখতে হলে অবশ্যই তা সম্পূর্ণরূপে বায়ুনিরোধক হতে হবে। নইলে খাদ্যদ্রব্য জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে।

টিন কনটেইনারের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা-

১. সহজে তৈরি করা যায়।
২. যন্ত্র দিয়ে সহজে বায়ু নিরোধক রূপে বন্ধ করা যায়।
৩. সহজে পরিবহনযোগ্য।
৪. ওজনে হালকা।
৫. আলো, বাতাস, জলীয় কণা প্রবেশ করতে পারে না।
৬. বাইরের অপদ্রব্য দিয়ে দূষিত হয় না।
৭. প্রায় সব ধরনের খাবার এতে প্যাক করা যায়।
৮. সহজে ছাপানো, লেবেল লাগানো ও আকর্ষণীয় করা যায়।

অসুবিধা–

১. প্রধান সমস্যা মরিচা পড়া।
২. সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকতে পারে।
৩. ড্যাম্প পেপার এবং ক্ষয়কারী আঠা ব্যবহারে টিন দ্রুত ক্ষয় হয়।

১৩.৪ অ্যালুমিনিয়াম কনটেইনার

এ জাতীয় কনটেইনার প্রথম ১৯১৮ সালে মাছ এবং মাংস প্রক্রিয়াজাত করার জন্য তৈরি করা হয়। বর্তমানে নরওয়ে এবং সুইডেনে ব্যাপকভাবে অ্যালুমিনিয়াম কনটেইনার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর প্রধান কারণ কাঁচামালের সহজপ্রাপ্যতা, কম খরচে উৎপাদন এবং বিদ্যুতের প্রাচুর্য। প্রধানত ৯৯.৫% বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম এবং কখনও ১% ম্যাঙ্গানিজ যোগ করা হয়ে থাকে।

অ্যালুমিনিয়াম কনটেইনারের সুবিধা-

১. টিন প্লেটের চেয়ে ওজন কম।
২. রাসায়নিক ক্ষয়ের কারণে টিন কনটেইনারে যেমন- রঙিন বস্তুর উদ্ভব হয় এক্ষেত্রে তেমনটি হয় না।
৩. এ ধাতু বিষাক্ত নয় এবং ধাতব গন্ধ ও স্বাদ উৎপন্ন করে না।
৪. অতি সহজে কনটেইনার খোলা যায়।

অ্যালুমিনিয়াম কনটেইনারের অসুবিধা–

১. অ্যাসিড ও অ্যাসিডিক খাবার দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।
২. খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয় যাতে মুচড়িয়ে না যায়।
৩. টিন প্লেটের চেয়ে নরম। কাজেই সতর্কতার সাথে নাড়াচাড়া করতে হয়।
৪. হাই স্পিড বডিমেকার দিয়ে জোড়া লাগানো যায় না।

১৩.৫ গ্লাস কনটেইনারের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা–

১. খাবার দেখা যায় বলে ক্রেতা সহজে আকৃষ্ট হয়।
২. বারবার ব্যবহার করা যায়।
৩. দেখতে সুন্দর।
৪. গ্যাস, জলীয় কণা ও গন্ধ প্রতিরোধক।
৫. গন্ধহীন।
৬. রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়।
৭. লেবেল লাগানোর জন্য যে কোনো ধরনের আঠা ব্যবহার করা যায়।

অসুবিধা–

১. ওজন বেশি, তাই পরিবহন খরচও বেশি।
২. ভঙ্গুর, তাই সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হয়।

৩. টিন, অ্যালুমিনিয়াম ও প্লাস্টিক কনটেইনারের চেয়ে দামি।
৪. বেশি তাপ সহ্য করতে পারে না।
৫. ধাতব ঢাকনা দ্রুত ক্ষয় হয়।

১৩.৬ প্লাস্টিক কনটেইনারের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা-

১. সহজে প্রস্তুত করা যায়।
২. গ্লাস থেকে বেশি আঘাত সহ্য করতে পারে।
৩. ওজনে হালকা।
৪. টিন কনটেইনারের চেয়ে বেশি রাসায়নিক ক্ষয় প্রতিরোধক।
৫. কাচ বা টিনের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপক।
৬. সস্তা।
৭. যে কোনো আকার বা আকৃতি দেওয়া যায়।
৮. ছাপানো যায়।

অসুবিধা–

১. তাপ সহ্য করতে পারে না।
২. সম্পূর্ণভাবে গ্যাস ও জলীয় কণা প্রতিরোধক নয়।
৩. সব ধরনের প্লাস্টিক ঘাতসহ নয়।
৪. বিশেষ ধরনের গন্ধ আছে।
৫. সব ধরনের প্লাস্টিক খাবারের সরাসরি সংস্পর্শে ব্যবহার করা যায় না।

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি কনটেইনার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়?

ক. টিন প্লেট

খ. অ্যালুমিনিয়াম

গ. প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল

ঘ. উপরের সব কয়টি।

২. টিন কনটেইনারের সুবিধা কোনটি?

ক. সহজে তৈরি করা যায়

খ. সহজে পরিবহন করা যায়

গ. ওজনে হালকা

ঘ. উপরের সব কয়টি।

৩. কোনটি প্লাস্টিক কনটেইনারের অসুবিধা?

ক. তাপ সহ্য করতে পারে না

খ. সম্পূর্ণভাবে গ্যাস ও জলীয় কণা প্রতিরোধক নয়

গ. বিশেষ ধরনের গন্ধ আছে

ঘ. উপরের সব কয়টি।

৪. কোনটি অ্যালুমিনিয়াম কনটেইনারের সুবিধা?

ক. টিন প্লেটের চেয়ে ওজন কম

খ. ধাতু বিষাক্ত নয়

গ. সহজে কনটেইনার খোলা যায়

ঘ. উপরের সব কয়টি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কনটেইনার কী?

২. প্যাকেট হিসেবে কনটেইনার কী ভূমিকা পালন করে?

৩. কনটেইনার সাধারণত কী ধরনের সামগ্রী দিয়ে প্রস্তুত করা হয়?

৪. টিন কনটেইনারে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষিত রাখতে হলে কী করা প্রয়োজন?

৫. টিন কনটেইনারের সুবিধা কী কী?

৬. টিন কনটেইনারের অসুবিধা কী কী?

৭. অ্যালুমিনিয়াম কনটেইনারের সুবিধাগুলো লিখ ।
৮. অ্যালুমিনিয়াম কনটেইনারের অসুবিধাগুলো লিখ ।
৯. গ্লাস কনটেইনারের সুবিধাগুলো লিখ ।
১০. গ্লাস কনটেইনারের অসুবিধাগুলো কী কী?
১১. প্লাস্টিক কনটেইনারের সুবিধাগুলো লিখ ।
১২. প্লাস্টিক কনটেইনারের অসুবিধাগুলো লিখ ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কনটেইনার বলতে কী বোঝ? টিন কনটেইনার, অ্যালুমিনিয়াম কনটেইনার এবং গ্লাস কনটেইনারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর ।

ব্যবহারিক-১
দানাদার শস্যের বাছাই এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি

শস্যের একটি দানায় বিভিন্ন অংশ বিদ্যমান। বিভিন্ন শস্যের ক্ষেত্রে এ বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করা হলে অনেক সময় দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে হয়। এর সহজ সমাধান এভাবে মেলানো যায় যে কোনো দানাশস্যের দানায় চারটি প্রধান অংশ বিদ্যমান- জার্ম, ভেতরের শর্করাসমৃদ্ধ অংশ, পুষ্টিসমৃদ্ধ বাইরের স্তর ও সর্ববহিস্থ আঁশালো খোসা (husk)। প্রত্যেক ধরনের দানাশস্যের জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা (postharvest Management), তবে কয়েকটি সাধারণ মূলনীতি সকল শস্যদানার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ফসল সংগ্রহ থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত ধাপগুলো একটি চেইনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে যা অনেক সময় জটিল বলে মনে হয়। শস্য সিস্টেমকে তিনটি পর্যায়ে ফেলা যায়; যথা- প্রথম ধাপটি সংগ্রহ থেকে শস্যের সংরক্ষণ পর্যন্ত বিরাজিত; দ্বিতীয় ধাপটি প্রারম্ভিক প্রসেসিং, তবে এক্ষেত্রে শস্য খাওয়ার উপযোগী হয় না এবং তৃতীয় ধাপটি হচ্ছে চূড়ান্ত প্রক্রিয়াকরণ যেমন- বেকিং। নিচে সংগ্রহোত্তর প্রক্রিয়াজাতকরণ ধাপসমূহ উপস্থাপিত হলো-

শস্য আহরণ

↓

মাঠে শস্য শুকানো

↓

ফসল থেকে দানা আলাদা করা বা মাড়াই করা

↓

দানা ঝারাই করা

↓

শুকানো

↓

দানা সংরক্ষণ

↓

প্রারম্ভিক প্রক্রিয়াজাতকরণ
(পরিষ্কার করা, গ্রেডিং করা, খোসা ছাড়ানো, গুঁড়া করা, পেষণ করা, ভেজানো, পারবয়লিং, শুষ্কীকরণ, চালুনিতে ছাঁকা ইত্যাদি)

↓

চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ
(বেকিং, ভাজা, ছাঁচের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগে বিশেষ আকার দেওয়া, ব্লেন্ডিং, ফারমেনটিং ইত্যাদি)

↓

প্যাকেজিং

↓

মার্কেটিং

ব্যবহারিক-২
ময়দায় উপস্থিত গ্লুটেনের পরিমাণ নির্ণয়

ধৌতকরণ পদ্ধতিতে ময়দার উপস্থিত ভিজা এবং শুকনা গ্লুটেনের পরিমাণ নির্ণয়

তত্ত্ব

গমের আটা বা ময়দায় যে প্রোটিন থাকে তাকে বলা হয় গ্লুটেন যা পানির উপস্থিতিতে আঠালো এবং স্থিতিস্থাপক হয়। দেখলে মনে হয় যেন চাবাঠ চুইংগাম। এ জাতীয় গ্লুটেন আর কোনো দানাদার শস্যে দেখা যায় না। গ্লুটেনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে ময়দার বহুমুখী ব্যবহার এবং গমের প্রকারভেদ। যেমন–

১) গ্লুটেনের পরিমাণ ১১-১২% হলে তা থেকে প্রস্তুত করা যায় ব্রেড।
২) গ্লুটেনের পরিমাণ ৮-১০% হলে প্রস্তুত করা যায় বিস্কুট।
৩) গ্লুটেনের পরিমাণ ৮-৯% হলে প্রস্তুত করা যায় কেক।

কাজেই গম থেকে বিভিন্ন খাবার প্রস্তুতির জন্য ময়দায় উপস্থিত গ্লুটেনের পরিমাণ নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

১) নিক্তি ও ওজন বাক্স
২) বিকার
৩) ময়দা
৪) পানি
৫) ওভেন

কার্যপ্রণালি

১) ২০ গ্রাম ময়দা মেপে একটি পরিষ্কার প্রশস্ত বিকারে নাও। তাতে অল্প অল্প করে পানি যোগ করে শক্ত খামির প্রস্তুত কর এবং গোল করে দলা পাকাও।
২) এবার দলাটি বিকারে রেখে পানি দিয়ে ডুবিয়ে দাও এবং ২০ মিনিট অপেক্ষা কর।
৩) এরপর হাত দিয়ে ময়দার দলাটি আস্তে এমনভাবে কচলাতে থাক যেন দলাটি না ভাঙে। দেখবে বিকারে পানি সাদা হয়ে যাচ্ছে। উপর থেকে এই সাদা পানি ফেলে দাও। দেখ যেন ময়দার কোনো বড় অংশ পানির সাথে চলে না যায়।
৪) নতুন করে আবার পানি যোগ কর এবং আগের মতো ময়দার দলা কচলাতে থাক, দেখতে পাবে এবারেও পানি সাদা হয়ে যাচ্ছে। আগের মতো সাদা পানি ফেলে দাও।
৫) আবার পানি যোগ কর এবং কচলাতে থাক। এমনি করে যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিষ্কার পানি এবং একটি ছোট আঠালো দলা হাতে জমা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এভাবে চালিয়ে যাও। এই আঠালো এবং স্থিতিস্থাপক দলটিই গ্লুটেন। একে ভিজা গ্লুটেন বলা হয়।

৬) এবার একটি ওয়াচ গ্লাসের ওজন নাও এবং প্রাপ্ত গ্লুটেনসহ আবার ওজন কর।

৭) মনে কর প্রাপ্ত ভিজা গ্লুটেনের ওজন = x

এই x গ্রাম ভিজা গ্লুটেন পাওয়া গেছে ২০ গ্রাম ময়দা হতে

সুতরাং ময়দায় % ভিজা গ্লুটেন = $\frac{x}{20} \times 100$

$= 5x$

৮) এরপর প্রাপ্ত ভিজা গ্লুটেনসহ ওয়াচ গ্লাসটি ওভেনে রেখে ১০০° সে. তাপমাত্রায় শুষ্ক কর যতক্ষণ না এর স্থির ওজন পাওয়া যায়। স্থির ওজনটি লিখে রাখ।

৯) পূর্বের ন্যায় শুষ্ক গ্লুটেনের পরিমাণ শতকরা হারে প্রকাশ কর।

মনে করো শুকনো গ্লুটেনের ওজন = খ

এই শুকনো গ্লুটেন পাওয়া গেছে ২০ গ্রাম ময়দা থেকে।

সুতরাং ময়দায় % শুকনো গ্লুটেন = ৫ খ।

ব্যবহারিক-৩
নোনতা বিস্কুট, পাউরুটি, মিষ্টি বিস্কুট প্রস্তুতকরণ

স্পঞ্জ ও খামির পদ্ধতিতে নোনতা বিস্কুট প্রস্তুতকরণ

নোনতা বিস্কুটের উপকরণ

উপকরণ	পরিমাণ (গ্রাম)
ময়দা	১০০
ফ্যাট	১০
চিনি	৫
লবণ	৬
HCO_3	০.৪
$(NH_3)_2CO_3$	০.২
ফ্লেভার	০.১

এক্ষেত্রে নির্ধারিত ময়দার ৭০% এর সাথে ইস্ট এবং পানি মিশিয়ে তিন মিনিট মিক্স করার পর চোলাইকরণের জন্য ১২-১৮ ঘণ্টা রেখে দেওয়া হয়। এরপর বাকি ময়দায় লবণ এবং ফ্যাট ঐ চোলাইকৃত খামিরের সাথে পুনরায় মেশাও। এই মিশ্রিত খামিরকে স্পঞ্জ এবং এই পদ্ধতিকে স্পঞ্জ এবং খামির পদ্ধতি বলে।

এই খামির থেকে বিস্কুট বানিয়ে পূর্বের ন্যায় বেকিং, কুলিং এবং প্যাকেজিং করা হয়।

মিষ্টি বিস্কুটের প্রস্তুতপ্রণালি

মিষ্টি বিস্কুটের উপকরণ

উপকরণ	পরিমাণ (গ্রাম)
ময়দা	৫০০
চিনির পাউডার	১৬০
ফ্যাট	১২৫
ননি ছাড়া গুঁড়া দুধ	১০
গ্লুকোজ সিরাপ	১০
লবণ	৫
অ্যামোনিয়াম বাই-কার্বোনেট	৫
সোডিয়াম বাই-কার্বোনেট	১
বেকিং পাউডার	৫

অ্যাসিড ক্যালসিয়াম ফসফেট (ACP)	৫
ভেনিলা ফ্লেভার	৫
বাটার ফ্লেভার	৫
পানি	৫০
লেসিথিন	২
সোডিয়াম মেটাবাই সালফেট (SMP)	১
কালার	প্রয়োজনমতো

প্রস্তুতপ্রণালি

১. ফ্যাট ভালো করে ফেটে তাতে চিনির পাউডার, গুঁড়া দুধ, গ্লুকোজ সিরাপ, ফ্লেভার, লেসিথিন ধীরে ধীরে যোগ করে হভার্ড মিক্সারের সাহায্যে তিন মিনিট ধরে মেশাও। এই কাজটি বিটার বা চামচের মাধ্যমে করা যেতে পারে।
২. এরপর লবণ, অ্যামোনিয়াম বাই-কার্বোনেট, সোডিয়াম বাই-কার্বোনেট পানিতে গুলে উপরের মিশ্রণের (১ নং ধাপ) সাথে যোগ করে পুনরায় তিন মিনিট ধরে মিশাও।
৩. ACP, SMP পানিতে গুলে মেশাও সাথে যোগ করা হয়।
৪. এরপর ময়দা এবং বেকিং পাউডার একসাথে চালনির সাহায্যে পরপর তিনবার চেলে উপরের মিশ্রণের (২ নং ধাপ) সাথে যোগ করে ভালোভাবে মেশাও যতক্ষণ পর্যন্ত খামির তুলার মতো নরম না হয়।
৫. এরপর খামির দিয়ে ২ মি.মি. পুরু শিট প্রস্তুত কর এবং তা কেটে অথবা ছাঁচের সাহায্যে বিস্কুটের আকার দান করার পর ট্রের উপর রেখে ওভেনে ২০৪° সে. তাপমাত্রায় ৬-৭ মিনিট বেক করার পর ঠান্ডা কর।

প্যাকেজিং : বর্তমানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লেমিনেটেড অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দ্বারা প্যাকেট করা হয়।

পাউরুটি প্রস্তুতপ্রণালি

পাউরুটি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

ক. ময়দা, খ. পানি, গ. ইস্ট, ঘ. লবণ

ঐচ্ছিক উপাদান

ক. চিনি
খ. চর্বি ও তেল
গ. মল্ট ময়দা (Malt Flour)
ঘ. গুঁড়া দুধ (Milk Flour)
ঙ. জারক, যেমন পটাশিয়াম ব্রোমেট অথবা পটাশিয়াম আয়োডেট
চ. মিনারেল ইস্ট ফিড (mineral yeast feed), যেমন অ্যামোনিয়াম বাই-সালফেট, অ্যাসিড ক্যালসিয়াম

সালফেট

ছ. ওয়াটার কন্ডিশনার (water conditioner), ক্যালসিয়াম ফসফেট

জ. মোল্ড ও রোপ প্রতিরোধক (anti-mold & anti-rope agents), মোল্ড প্রতিরোধক- সোডিয়াম বা ক্যালসিয়াম প্রোপায়োনেট

রোগ প্রতিরোধক : অ্যাসিটিক অ্যাসিড, অ্যাসিড ক্যালসিয়াম ফসফেট (এসিপি), ক্যালসিয়াম ডাই-অ্যাসিটেট, জি.এম.এস

উপাদান	পরিমাণ
ময়দা	১০০ কেজি
পানি	পরিমাণমতো
ইস্ট (*Saccharomycetes cerevisiae)*	২-৫ কেজি
লবণ	১ কেজি
চিনি	২-৮ কেজি
গুঁড়া দুধ	২ কেজি
অথবা তরল দুধ	১০ কেজি
ডিম	২০-৪০টি
সয়াবিন তেল	২ কেজি
পটাশিয়াম ব্রোমেট বা পটাশিয়াম আয়োডেট	১০০ গ্রাম
সোডিয়াম বা ক্যালসিয়াম প্রোপায়োনেট	১০০ গ্রাম
অ্যাসিটিক অ্যাসিড	৫০০ সিসি- ১ লিটার

প্রস্তুতপ্রণালি

১. চালুনিতে ছাঁকা : চালুনিতে নিম্নোক্ত কারণে ময়দা ছাঁকা হয়

- অবাঞ্ছিত পদার্থ দূর করতে।
- ময়দায় বায়ু প্রবাহিত করতে।

২. ওজন নেওয়া : উপকরণের সকল দ্রব্য আলাদা আলাদাভাবে মেপে নাও।

৩. মেশানো : একটা মিক্সিং মেশিনে/পাত্রে উপকরণের সকল দ্রব্য ভালোভাবে মেশানো হয়। মিশ্রণটি বেশি শক্তও হবে না, আবার বেশি পাতলাও হবে না। মেশানোর অনুমোদিত সময় হচ্ছে ৩ মিনিট।

৪. ফারমেন্টেশন : মিশ্রণ (dough) ফারমেন্টেশন চেম্বারে ২৮-২৯° সে. তাপমাত্রায় ২ ঘণ্টা রাখা হয়। এ সময় বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, চিনির উপর ইস্টের ক্রিয়া অর্থাৎ

$$\text{চিনি} \xrightarrow[\text{(জাইমেস)}]{\text{ইস্ট}} \text{কার্বন ডাই-অক্সাইড } (CO_2) + \text{অ্যালকোহল}$$

এই CO_2 উৎপন্ন হওয়াতে মিশ্রণটি ফুলে ওঠে।

৫. নক-ব্যাক : ফুলে উঠা মিশ্রণের উপর বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ (হাত দিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে) করতে হয় যাতে মিশ্রণ থেকে CO_2 দূরীভূত হয়। চাপ প্রয়োগ করতে হয় কয়েকবার।

৬. মধ্যবর্তীকালীন প্রুফ : নক-ব্যাকের পর প্রায় ২৫ মিনিট কাল এভাবেই রেখে দিতে হয়।

৭. মল্ডিং : আবার গ্যাস (CO_2) চাপ প্রয়োগে বের করা হয় এবং পাকানো হয়। প্রেসার বোর্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতে হয়। তারপর মোল্ডের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাপে রাখতে হয়।

৮. চূড়ান্ত প্রুফ : মোল্ডে ভর্তি করার পর ৩২° সে. তাপমাত্রায় এবং ৮০% আর্দ্রতায় প্রায় ৫৫ মিনিট রাখতে হয়। এ সময়ে মিশ্রণ টুকরাগুলো পরিপূর্ণ পাউরুটির আকার ধারণ করে।

৯. বেকিং : চুল্লিতে ২৩২° সে. তাপমাত্রায় ২৫ মিনিট রাখা হয়। এ সময়ে পাউরুটি তৈরি সম্পন্ন হয়। বেশ কিছু পরিবর্তন এ ধাপে সম্পন্ন হয়। তাপমাত্রা ৫৪° সে. এর উপর থাকায় ইস্টের কার্যকলাপ নষ্ট হয়ে যায় এবং তাপমাত্রা ৭৭° সে. এর উপর থাকায় (α- এমাইলেজ ও β- এমাইলেজ) এনজাইমের কার্যকলাপ নষ্ট হয়ে যায়।

১০. ঠান্ডা করা : কক্ষ তাপমাত্রায় পাউরুটি ঠান্ডা করা হয়।

১১. টুকরাকরণ : চাকু বা ছুরি দিয়ে ছোট ছোট টুকরা করা হয়।

১২. মোড়কে ভর্তিকরণ : টুকরা করা পাউরুটি পলিথিনের কাগজের মোড়কে ভর্তি করে সিল করা হয়।

ব্যবহারিক-৪
ক্যান্ডি, মিল্ক টফি ও চকলেট টফি প্রস্তুতকরণ

ক্যান্ডি উৎপাদন প্রক্রিয়া

ক্যান্ডি প্রস্তুতকরণে সাধারণত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, যথা- সিরাপের টিএসএস অপরিবর্তনীয় রেখে এবং সিরাপের টিএসএস পরিবর্তন করে।

সিরাপের টিএসএস অপরিবর্তনীয় রেখে ক্যান্ডি প্রস্তুতকরণের ধাপ-

১. **নির্বাচন :** পরিপক্ব, সতেজ ও অণুজীব বা অসুখমুক্ত ফল ও সবজি বেছে নেওয়া হয়।

২. **ধৌতকরণ :** পরিষ্কার পানিতে ভালোভাবে ধোয়ে নিতে হয়।

৩. **খোসা ছাড়ানো ও প্রস্তুতকরণ :** ফল বা সবজির বাইরের আবরণ অপসারণ করা হয় এবং ১/৪–১/২ ইঞ্চি পরিমাণে ছোট ছোট টুকরায় কাটা হয়।

৪. **সালফার ও লবণ প্রয়োগ :** ১/২ মিলিগ্রাম কেএমএস ১ লিটার পানিতে গুলিয়ে নিতে হয় এবং এতে ২% লবণ যোগ করা হয়। এই দ্রবণে ফলের টুকরাগুলো প্রায় ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয় এবং তারপর দ্রবণ থেকে ফলগুলো বের করে নেওয়া হয়।

৫. **ব্লাঞ্চিং :** টুকরাগুলো ফুটন্ত পানিতে প্রায় ১০ মিনিট এমনভাবে রাখা হয় যাতে টুকরাগুলো কিছুটা নরম হয়। এরপর এদের ঠান্ডা পানিতে রাখা হয়।

৬. **বিচ্ছিদ্রকরণ :** কাঁটা চামচ দিয়ে চারদিকে সমানভাবে ছিদ্র করা হয়।

৭. **চিনির দ্রবণ প্রস্তুতকরণ :** পানিতে চিনি ও সাইট্রিক অ্যাসিড যোগ করে গুলিয়ে ৬৫% টিএসএস-এর দ্রবণ তৈরি করা হয়। বেশি টকযুক্ত ফলে অ্যাসিড যোগ করার প্রয়োজন নেই। অনুপাত হচ্ছে- চিনি ৬৫%; অ্যাসিড ০.২৫%; পানি ৩৪.৭৫%।

৮. **সিরাপে ডুবানো :** টুকরাগুলো চিনির দ্রবণে ডুবানো হয় এবং অল্প সময় তাপ দেওয়া হয়। তারপর এক রাত দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা হয়। এ সময়ে দ্রবণ থেকে চিনি আস্তে আস্তে ফলের মধ্যে অভিস্রবণ পদ্ধতিতে প্রবেশ করতে থাকে এবং ফলের ভেতর থেকে পানি বের হয়ে দ্রবণের ঘনত্বকে কমিয়ে দেয়। এরপর দ্রবণ থেকে ফলের টুকরাগুলো বের করে রাখা হয় এবং দ্রবণকে তাপ দিয়ে ৬৫% টিএসএস পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। ফলের টুকরাগুলো আবার এতে ডুবিয়ে রেখে আরও এক রাত রাখা হয়। পরে দেখা যাবে, দ্রবণের ঘনত্ব আবার কিছুটা কমেছে। ফলের টুকরাগুলো আবার বের করা হয় এবং দ্রবণকে তাপ দিয়ে দ্রবণের ঘনমাত্রা ৬৫% আনা হয়। তারপর আবার ফলের টুকরোগুলো এতে ডুবিয়ে রাখা হয়। পরের দিন ফলের টুকরাগুলো দ্রবণ থেকে বের করে এনে ট্রেতে সাজানো হয় এবং ড্রায়ারের মধ্যে রাখা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না ভালোমতো শুষ্ক হয় ততক্ষণ পর্যন্ত টুকরাগুলো ড্রায়ারের মধ্যে থাকে। সাধারণত বিশুষ্কীকরণ সম্পূর্ণ হতে ১০-১২ ঘণ্টা সময় লাগে। ২য় বা ৩য় দিনে দ্রবণ কম পড়লে ৬৫% এর দ্রবণ আগের নিয়মে বানিয়ে এতে যোগ করা যেতে পারে।

প্যাকেজিং : ড্রায়ারে শুষ্ককৃত টুকরাগুলো বের করে পলিথিন ব্যাগে সিল করে রাখতে হয়। পলিথিন ব্যাগের পরিবর্তে কাচের বোতলেও রাখা যেতে পারে।

দ্রবণের টিএসএস পরিবর্তন করে ক্যান্ডি প্রস্তুতকরণ :

প্রথমোক্ত পদ্ধতির প্রায় সব কটি ধাপই ঠিক থাকে। এখানে শুধু চিনির দ্রবণের ক্ষেত্রে প্রথমে কম টিএসএস বজায় রাখা হয় এবং আস্তে আস্তে দ্রবণের টিএসএস বাড়ানো হয়। যেমন প্রথম দিনে দ্রবণের টিএসএস ২০%-এ রাখা হয়। দ্বিতীয় দিন টিএসএস ৪০% পর্যন্ত বাড়ানো হয় এবং তৃতীয় দিন টিএসএস ৬৫% করা হয়।

বিঃ দ্রঃ যদি রিফ্র্যাক্টোমিটার না থাকে তবে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ২য় ও ৩য় দিনে চিনির দ্রবণের ঘনমাত্রা চোখের আন্দাজে ১ম দিনের মতো রাখতে হয়।

মিল্ক টফি

মিল্ক টফি ঃ

উপাদান	পরিমাণ
চিনি	৫০০ গ্রাম
গুঁড়ো দুধ	১০০ গ্রাম
বাদাম	২৫ গ্রাম
এলাচ	৫ টি
ভেনিলা	৪/৫ ফোঁটা
কালার	প্রয়োজনমতো
পানি	২০০ মিলি

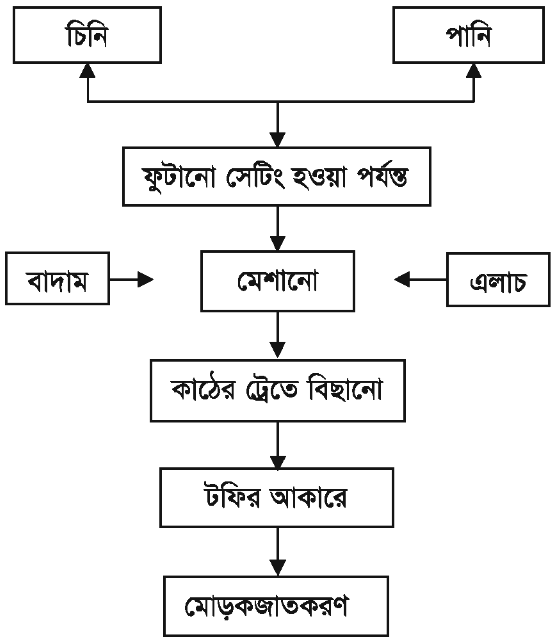

চিত্র : মিল্ক টফি

প্রস্তুতপ্রণালি ঃ

১. ২০০ মিলিলিটার পানিতে দুধ যোগ করে মেশাও ।
২. মিশ্রিত দুধ চিনির সঙ্গে মিশিয়ে তাপ দাও ।
৩. মিশ্রণ ফুটতে ফুটতে এমন একটা পর্যায় আসবে যা এর দু-এক ফোঁটা কাপের পানিতে ফেললে সম্পূর্ণভাবে জমে যাবে তখন বাদাম ও এলাচির বীজ পেষণ করে মিশ্রণে যোগ করে মেশাও ।
৪. ভেনিলা এবং প্রয়োজনমতো কালার যোগ করে ভালোভাবে মেশাও ।
৫. কাঠের ট্রেতে ওয়েল পেপার বিছিয়ে তার উপর গরম মিশ্রণ মেশাও ।
৬. তারপর ছোট ছোট টুকরায় কাটো ।
৭. প্রস্তুতকৃত টফিগুলো মোড়কজাত কর ।
৮. প্রয়োজনীয় সংখ্যায় বা ওজনে প্যাকিং কর ।

চকলেট টফি (লজেন্স টাইপ) উৎপাদন প্রক্রিয়া

চকলেট টফি উৎপাদন প্রক্রিয়া

উপকরণ	পরিমাণ
চিনি	৭০০ গ্রাম
তরল গ্লুকোজ	৫০০ গ্রাম
সাইট্রিক অ্যাসিড	১০ গ্রাম
কালার	প্রয়োজনমতো
ফ্লেভার (লেমন, পাইন অ্যাপল, অরেঞ্জ, ম্যাংগো)	২-৩ মিলিলিটার
পানি	২৮০ মিলিলিটার

প্রস্তুতপ্রণালি

ক. চিনি ও পানি একত্রে মেশাতে হয় ।
খ. উপরিউক্ত মিশ্রণ কিছুক্ষণ ফুটার পর তরল গ্লুকোজ যোগ করতে হয় ।
গ. মিশ্রণ ফুটতে ফুটতে যখন তাপমাত্রা ১৬০° সে. হবে তখন ইস্পাতের তৈরি টেবিলে ঢালতে হয় । এ সময় কাপের পানিতে দু'এক ফোঁটা নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে মিশ্রণ সম্পূর্ণ জমে যাচ্ছে ।
ঘ. এরপর ফ্লেভার, কালার ও সাইট্রিক এসিড যোগ করা হয় এবং খুব ভালোভাবে ঢেলে মেশাতে হয় ।
ঙ. টফি কাটার দিয়ে চকলেট টফি কাটতে হয় ।
চ. আলাদা আলাদাভাবে চকলেট টফি কাগজে মোড়াতে হয় ।
ছ. প্রয়োজনীয় সংখ্যায় বা ওজনে প্যাকিং করতে হয় ।

চকলেট টফি (লজেন্স টাইপ) তৈরির পদ্ধতি ছকের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো :

চিনি পানি

↓

ফুটানো

↓

মেশানো ← তরল গ্লুকোজ

↓

ফুটানো (১৬০° সে.)

↓

টেবিলে ঢালা

↓

মেশানো ← ফ্লেভার ← কালার ← সাইট্রিক অ্যাসিড

↓

কাটা

↓

মোড়কজাতকরণ

প্রবাহ চিত্র : চকলেট টফি তৈরি

৬. লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট
৬.১ ব্যক্তিত্ব সুরক্ষা

৬.১.১ দৈনন্দিন কার্য পরিকল্পনা

পরিকল্পনা বলতে আমরা ভবিষ্যৎ কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপকে বুঝে থাকি। দৈনন্দিন কর্মপরিকল্পনা বলতে আমরা বুঝি দৈনন্দিন কার্যসম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক উপায়ে এবং সঠিক বা উপযুক্ত সময়ে প্রতিদিনের কার্যসম্পাদনের পরিকল্পনাই হলো দৈনন্দিন কর্মপরিকল্পনা।

সুতরাং বলা যায়, যে পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সম্পাদিত দৈনিক করণীয় কার্যাবলির বিবরণ দেওয়া হয় এবং কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাকে দৈনন্দিন কর্মপরিকল্পনা বলে। দৈনন্দিন কর্মপরিকল্পনার উদাহরণ হলো কোনো কাজের কর্মসূচি।

কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন/কর্মসূচি ঃ সাধারণত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন/কর্মসূচি হলো কোনো নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের জন্য বাস্তব বা ব্যবহারিক রূপরেখা। এতে নির্দিষ্ট কাজটির আরম্ভের এবং সমাপ্তির সময়সহ অন্যান্য সহায়ক যাবতীয় কার্যাবলির মেয়াদসহ ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ থাকে। কর্মসূচিতে সাধারণত নিম্নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে :

১. নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য;
২. উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যের বর্ণনা;
৩. উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির উপর অর্পিত দায়িত্বের বর্ণনা;
৪. প্রয়োজনীয় সম্পদের বর্ণনা;
৫. প্রতিটি কাজের দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত করতে হবে তা ঠিক করা;

উপরিউক্ত কাজগুলো অবশ্যই পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সম্পাদিত হতে হবে।

নিম্নের ছকের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন/কর্মসূচির নমুনা দেওয়া হলো

কার্য নং	পদক্ষেপ	আনুমানিক সময়	প্রতিদিন কর্মঘণ্টা	আনুমানিক ব্যয়	দায়িত্ব
১।	অফিস কক্ষ নির্মাণ	১ মাস	প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা	২ লক্ষ টাকা	প্রধান প্রকৌশলী ও মিস্ত্রি
২।	আসবাপত্র ক্রয়	৭ দিন	প্রতিদিন ২ ঘণ্টা	৫০ হাজার টাকা	মহাব্যবস্থাপক
৩।	আসবাবপত্র বিন্যাস	৩ দিন	প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা	২ হাজার টাকা	অফিস সহকারী
৪।	অফিস সহকারী নিয়োগ	১০ দিন	১ দিন বিজ্ঞাপন ১ ঘণ্টা ১ দিন সাক্ষাৎকার ৩ ঘণ্টা	২ হাজার টাকা	কর্মীব্যবস্থাপক
৫।	অফিস উদ্বোধন	১ দিন	১ দিন আনুমানিক ২ ঘণ্টা	২ হাজার টাকা	পাবলিক রিলেশন অফিসার

৬.১.২ সাফল্য অর্জন ও সাফল্যের বাধা

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যুগ। বর্তমান বিশ্ব উন্নতির ফলে নতুন বিষয়ে লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট-এর গুরত্ব বা প্রয়োজনীয়তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। বর্তমান জগতে স্বল্প সময়ে অধিক কার্য সম্পাদন করা ও সর্বাধিক ব্যয় সংকোচন করার চেষ্টা সকল প্রতিষ্ঠানেই বিদ্যমান। কীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যিক পত্রাদি রচনা করা যায়, বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ, প্রতিবেদন, সভা কার্যবিবরণী রচনা ও সংরক্ষণ করতে হয়, তা কোনো সাধারণ শিক্ষা থেকে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। আত্মবিশ্লেষণ আত্মউন্নয়ন, ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক, দলবদ্ধ কার্য সম্পাদন, এসব বিষয় জানতে হলে লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট অধ্যয়ন আবশ্যক। লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট অধ্যয়ন করে নিজেকে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা যায়। তখন মেধার শতভাগ ব্যবহার করা সম্ভব। মেধার পরিপূর্ণ প্রয়োগের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিশ্রম করে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা সম্ভব।

অপরদিকে কোনো ব্যক্তি যখন নিজেকে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে না, তখন মেধাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে না, সময়ের কাজ সময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না, সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি সাফল্য অর্জনে বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত হবে।

তাই যে কোনো কাজে বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সফল হতে হলে প্রথমত নিজেকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। অতঃপর প্রচুর পরিশ্রম করে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে হবে।

৬.১.৩ সাফল্যের পরিমাপ

সমাজে প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনা দ্বারা নিজের জীবনের উন্নয়ন করে থাকে। মানুষের জীবনমানের যতটুকু উন্নয়ন, ততটুকুই হলো তার সাফল্যের পরিমাণ। কেউ ব্যবসা করে, কেউ চাকরি করে, কেউ আইনজীবী পেশা গ্রহণ করে, কেউ ডাক্তার বা প্রকৌশলী হয়, আবার অনেকে রাজনীতি করেও জীবনের উন্নয়ন করে থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতার জন্য প্রথমে প্রয়োজন শিক্ষা গ্রহণ। শিক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব।

৬.১.৪ আত্মসম্মান

সাধারণত নিজের ভালো কাজের অর্জিত স্বীকৃতিই হলো আত্মসম্মান। আত্মসম্মান একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। কেননা মানুষের আত্মসম্মানবোধ না থাকলে সে কোনো কাজেই সফলতা অর্জন করতে পারে না। যদি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পিয়নের ন্যায় আচরণ করে তাহলে সে প্রতিষ্ঠানে উন্নতি আসার কথা ভাবা যায় না।

পরিচালকের মধ্যে যদি পরিচালকসুলভ মনোভাব না থাকে তাহলে যে কোনো সমস্যা বা উদ্ভূত পরিস্থিতি শক্তভাবে মোকাবেলা করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

আত্মসম্মান এর গুণাবলি : আত্মসম্মান বা ব্যক্তিত্বের কিছু গুণাবলি থাকা প্রয়োজন। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

১. **আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব :** আত্মসম্মানী ব্যক্তির সবচেয়ে বড় উপাদান হলো আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। কারণ ব্যক্তির যদি আকর্ষণী শক্তি না থাকে তাহলে অন্যরা তার প্রতি আকর্ষিত হবে না।

২. **সৌজন্যতা :** সৌজন্যতা আত্মসম্মানের অন্যতম গুণ। আত্মবিশ্বাসী মানুষের সৌজন্যতাবোধ থাকা বাঞ্ছনীয়।

৩. **আত্মবিশ্বাসী :** আত্মবিশ্বাস একজন সফল ব্যক্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যদি মানুষের মধ্যে এ গুণটি না থাকে তাহলে সে প্রতিষ্ঠানের উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারবে না।
৪. **মনোযোগী :** একজন আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তির যে কোনো কাজে মনোযোগ থাকতে হবে।
৫. **পরিশ্রমী :** আত্মবিশ্বাসী মানুষ সবসময়ই পরিশ্রমী হয়।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, আত্মসম্মান মানুষের পরম সত্তা। একজন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তির উপরিউক্ত গুণাবলি বিদ্যমান।

৬.১.৫ নিম্নমানের আত্মসম্মানের কারণ

মানুষের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের সম্মান নিজেকে অর্জন করে নিতে হয়। কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে, চলা-ফেরায়, প্রতিটি ক্ষেত্রে আত্মসম্মান বজায় রাখতে হয়। নিম্নমানের আত্মসম্মানের কিছু কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. ব্যক্তিত্বহীনতা : ব্যক্তিত্বহীনতার কারণে মানুষের সম্মানহানী হয়। সমাজের যে কোনো অনুষ্ঠানে, যে কোনো কাজে নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে না পারলে মানসম্মানে আঘাত আসে।
২. সৌজন্যহীনতা : মানুষের মধ্যে সৌজন্যবোধ থাকা বাঞ্ছনীয়, কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া, বিপদে পড়লে তার খোঁজ-খবর নেওয়া কিংবা বাসায় ভালো কিছু রান্না হলে প্রতিবেশীকে দাওয়াত দেওয়া এক ধরনের সৌজন্যবোধ। যখন মানুষের মধ্যে এ ধরনের সৌজন্যবোধের অভাব থাকবে তখন সেই ব্যক্তি সমাজে আত্মসম্মান বজায় রাখতে পারে না।
৩. মনোযোগহীনতা : যে কোনো কাজে সফলতার জন্য প্রথমে মনোযোগী হয়ে কাজ করতে হয়। কাজে যদি মনোযোগ না থাকে তখন কাজটি সুন্দরভাবে বোঝা যায় না, ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সে ক্ষেত্রে বারবার বিষয়টি বোঝার জন্য বা জানার জন্য অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়। এতে করে ব্যক্তিত্বহীনতায় ভুগতে হয় এবং সম্মানহীনতা দেখা যায়।
৪. অলসতা : জীবনে যারাই সফলতা পেয়েছেন তাদেরকে কঠোর প্ররিশ্রম করতে হয়েছে। পরিশ্রম ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়। অলস ব্যক্তিরা সমাজে কারো কাজে আসে না, তারা নিজেরাও জীবনে কোনো উন্নতি করতে পারে না। অলসতা হলো ব্যক্তিত্বহীনতার লক্ষণ এবং নিম্নমানের আত্মসম্মানের একটি বড় কারণ।

৬.১.৬ আত্মবিশ্বাস নির্মাণ কৌশল

নিজের প্রতি নিজের বিশ্বাস বা আস্থা তৈরি হওয়াকে আত্মবিশ্বাস গঠন বলে। নিম্নোক্ত উপায়ে একজন ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস গঠিত হয়ে থাকে :

১। **দৃঢ় মনোবল :** মনোবল নির্দিষ্ট করে সঠিকভাবে বিশ্বাসের সাথে কাজ করাকে দৃঢ় মনোবল বলে। আর আত্মবিশ্বাস গঠনে মনোবল মজবুত হতে হবে।

২। **পরিকল্পনা :** কোনো কাজ করার জন্য আগাম চিন্তা-ভাবনাকে পরিকল্পনা বলে। আত্মবিশ্বাস গঠনে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই পরিকল্পিতভাবে কাজ করতে হবে।

৩। **আস্থা ও বিশ্বাস :** কোনো কাজ করার জন্য অবশ্যই আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে।

৬.২ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি

৬.২.১ মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করার অর্থ হলো সমাজের অসহায় মানুষের সেবা করা এবং সমবেত চেষ্টার মাধ্যমে তাদের নানাভাবে উন্নতি করা। সমাজে গরিব-দুস্থকে সাহায্য করা; দরিদ্র অথচ অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসায় সাহায্য করা; নিরন্নকে অন্নদান; বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান; দুর্বল অসহায়কে প্রয়োজনীয় সাহায্য করা আমাদের সামাজিক ও মানবীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ সকল দায়িত্ব ব্যক্তিগত প্রয়াসে না পারলে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পথচারী পথ হারিয়ে ফেললে তাকে পথের সঠিক সন্ধান দেওয়া, এতিম, মিসকিনদের যথাযথভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করা, নিরক্ষতা দূর করতে বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, পথে কোনো লোক দুর্ঘটনাকবলিত হলে তাদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। কোনো লোক পথে ঘাটে অসহায়ভাবে পড়ে থাকলে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া আমাদের প্রত্যেকের মানবীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৬.২.২ সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, ফুফা-ফুফি প্রমুখের সাথে রক্তের সম্পর্কের কারণে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এদের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের সুসম্পর্ক বিদ্যমান।

পরিবারের বাইরে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক বিদ্যমান। দূরত্বের মাপকাঠিতে প্রতিবেশীরা সবচেয়ে কাছের মানুষ। বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী যতই আপন হোক না কেন তারা যদি দূরে বসবাস করে ইচ্ছা করলে বিপদের সংবাদ পেলে প্রতিবেশীদের চেয়ে আগে আমাদের বাসায় আসতে পারে না। তাই শুধু পরিবারের সদস্য কিংবা আত্মীয়-স্বজন নয়, সকলের সাথে সুসম্পর্ক, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। কেউ বিপদে পড়লে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। রোগব্যাধিতে ভুগলে সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে তাদের জিজ্ঞাসা করা, কিছুক্ষণের জন্য হলেও বেড়াতে যাওয়া, বাড়িতে ভালো কিছু রান্না হলে বা বিভিন্ন কুশলাদি ধর্মীয় সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় উৎসবে খাবার বা অন্যান্য জিনিস উপহার হিসেবে পাঠানো প্রয়োজন। এতে ঈর্ষা এবং হিংসা দূর হয়। বন্ধুত্বের সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

৬.২.৩ মনোভাব নির্ধারণের উপাদান

মনোভাব একটি শিক্ষালব্ধ আচরণ। এর মাধ্যমে মানুষ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গতি রক্ষা করে। এই আচরণ বিভিন্ন উপাদান দিয়ে প্রভাবিত হয়ে থাকে।

নিম্নে মনোভাব গঠনের কয়েকটি উপাদান আলোচনা করা হলো–

১. **চাহিদা পূরণ ও মনোভাব :** ব্যক্তির চাহিদা পূরণ এবং চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী পাওয়ার মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। যে সমস্ত বিষয় ব্যক্তির চাহিদা পূরণের ব্যাপারে সহায়ক সেসব বিষয়ের প্রতি ব্যক্তির অনুকূল মনোভাব গড়ে ওঠে। সুতরাং চাহিদা পূরণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শর্তের মাধ্যমে মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে।

২. **সামাজিক প্রভাব ঃ** সামাজিক প্রভাব সৃষ্টিকারী শর্ত দ্বারাও মনোভাব সংগঠিত হয়ে থাকে। আমরা দেখি যে, একজন শিশুর মনোভাব প্রথমে তার পিতামাতার মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং পরে খেলার

সাথীর মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমাদের অধিকাংশের পছন্দ ও অপছন্দ আমাদের পিতামাতা কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

৩. **তথ্য পরিবেশন ও মনোভাব :** তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে পিতামাতা তাদের সন্তানের মনোভাব গঠনে সাহায্য করতে পারে। তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষ বস্তু, রাজনীতি, আদর্শ, ন্যায়-নীতি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনাবলি সম্বন্ধে মনোভাব সৃষ্টি করা যায়।

৪. **পুরস্কার, শাস্তি ও মনোভাব :** কোনো একটি ভালো কাজ করার পর পিতামাতা শিশুদের প্রশংসা করতে পারেন এবং ভুল আচরণের জন্য শাস্তি দিতে পারেন। এরূপ পুরস্কার ও শাস্তি একজন ব্যক্তির মনোভাব গঠনে সাহায্য করে।

৫. **একাত্মীভাবন ও মনোভাব :** শিশু যখন বড় হতে থাকে তখন তারা যেসব লোককে পছন্দ করে তাদের সমকক্ষ হতে চায়। একাত্মীভাবন একটি শিক্ষণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি অন্যের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলিকে নিজের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে।

৬. **সভা-সমিতি ও মনোভাব :** প্রত্যেক সদস্যই তার সভা-সমিতির রীতিনীতি, নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং ধীরে ধীরে সমিতির অন্য সদস্যদের সাথে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

৭. **ব্যক্তিত্ব ও মনোভাব :** একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যেমন– কৃষ্টি, শিক্ষা, বুদ্ধি, রাজনৈতিক ধারণা প্রভৃতি উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, অনুরূপভাবে এসব উপাদান ব্যক্তির মনোভাব গঠনেও সাহায্য করে। একজন মনোবিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণে দেখেছেন যে, বেশি শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে গোঁড়ামির রাজনৈতিক মনোভাব দেখা যায় না। অপরদিকে, যারা কম শিক্ষিত ও অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন তাদের মধ্যে গোঁড়ামির রাজনৈতিক মনোভাব দেখা যায়।

৬.২.৪ ইতিবাচক মনোভাবের সুবিধা

দুটি সত্তা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে আত্মবিনাশী অপরটি হচ্ছে আত্মবিশ্বাসী। ভালো-মন্দ বলে কিছু নেই, মানুষের চিন্তাচেতনাই ভালো বা মন্দের সৃষ্টি করে। মানুষের মন পরিবর্তনশীল। যে কোনো সময় মানুষের মন পরিবর্তন হতে পারে। অর্থাৎ মানুষের মন পরিবেশ পরিস্থিতির উপর বিরাজমান। মানুষের মস্তিষ্ক হচ্ছে প্রোগ্রামের পরিকল্পনা। যদি মস্তিষ্কে আত্মবিশ্বাসী ধারণা সেট করা হয়ে যায় তখন তা হয় ইতিবাচক মনোভাব। ইতিবাচক উপলব্ধি হচ্ছে মানুষের লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রধান হাতিয়ার। ইতিবাচক উপলব্ধি সৃজনশীলতার ও মননশীলতার জন্ম দেয়। যেমন একজন দুর্নীতিবাজ ও তার দুর্নীতির কর্মকে আমরা নেতিবাচক বলে মনে করি। এ কারণে সমাজ তাকে ধিক্কার দিয়ে থাকে। এটাকে বলা হয় নেতিবাচক উপলব্ধি। অন্যদিকে একজন ভালো বা সৎ মানুষের কর্মকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং সমাজের সকলে তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। এটি ইতিবাচক উপলব্ধি। ইতিবাচক কর্মই হবে আমাদের চলার পথের পাথেয়।

৬.২.৫ ইতিবাচক মনোভাব গঠনের ধাপ/উপায়সমূহ

ইতিবাচক মনোভাব গঠনের ধাপ/উপায়সমূহ নিম্নরূপ-

১. **মনোভাব পরিবর্তন :** মানুষের মনোভাব সর্বদা পরিবর্তনশীল। মনকে যে যেভাবে পরিবর্তন করবে তার মন সেভাবেই পরিবর্তন হবে। মানুষের মনের ময়লা মুছে ফেললে অর্থাৎ অজুহাত, আলস্য, হতাশা, ব্যর্থতা দূর করে দিলে তার মধ্যে সফলতা আসবেই।

২. **প্রশংসা করা :** মানুষের কাজের প্রশংসা করলে তার কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। সেজন্য কেউ ছোট কাজ করলেও তার কাজটি ছোট করে না দেখে প্রশংসা করা উচিত। এতে সে অনুপ্রাণিত হয়ে বড় কাজ করার স্পৃহা পাবে।
৩. **মূল্যায়ন :** কাজের মূল্যায়ন করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। অনুগতকে গুরুত্ব দিলে নিজের গুরুত্বও বাড়ে। অবজ্ঞায় কখনও পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া যায় না। এজন্য গুরুত্ব ও সম্মান দিয়ে মূল্যায়ন করা উচিত।
৪. **অন্যকে সহযোগিতা করা :** আমার কাছে মানুষ যা প্রত্যাশা করে আমার উচিত মানুষকে তার চেয়ে বেশি কিছু দেওয়া। এতে নিজের মূল্যায়ন আরও বৃদ্ধি পায়। কাজেই মনে রাখতে হবে অন্যের সহযোগিতা ও সমর্থন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থার মধ্যে বিদ্যমান।

পরিশেষে উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, মস্তিষ্কে যদি আত্মবিশ্বাসী মনোভাবের ধারণা সৃষ্টি করা যায় তাহলে সেটি হবে ইতিবাচক মনোভাব। উপরোক্ত উপায়সমূহ অবলম্বন করে ইতিবাচক উপলব্ধি সৃষ্টি করা যায়।

৬.৩ মূল্যবোধ

৬.৩.১ মূল্যবোধ কীভাবে বিচার করা হয়

সামাজিক মূল্যবোধ সমাজ জীবনের অপরিহার্য উপাদান। এর মাধ্যমেই সমাজে মানুষ ভালোমন্দ বিচার করতে পারে এবং বাঞ্ছিত আচরণ করতে সমর্থ হয়। প্রত্যেক সমাজেই নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ থাকে, যেগুলোকে অবলম্বন করে ঐ সমাজের মানুষ সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে। মূলত সামাজিক মূল্যবোধ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সমাজের মানুষের কাছে প্রতিফলিত হয় এবং প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক মূল্যবোধের এসব বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

১. **সামাজিক উৎপত্তি :** সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এর উৎপত্তি ও বিকাশ। সামাজিক মূল্যবোধ জৈবিকভাবে নির্ধারিত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কিছু নয় বরং মানুষের প্রয়োজনে সামাজিকভাবেই এর উৎপত্তি।
২. **জন অংশগ্রহণ :** সামাজিক মূল্যবোধ সকলের অংশগ্রহণেরই ফল। ব্যক্তি-জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে মূল্যবোধ অনুসৃত হতে পারে কিন্তু সামাজিক জীবনের ব্যাপকতর পরিসরে যে মূল্যবোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তা সকলের অংশগ্রহণের ফলেই সম্ভব। তবে সমাজের সকল সদস্যের কাছে তা সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত নাও হতে পারে। তাই অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো লোক নিশ্চিন্তে কোনো মূল্যবোধের পরিপন্থী কাজ করে বেড়াচ্ছে অন্যদিকে এই একই কাজ মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের বিচলিত করছে।
৩. **সামাজিক মূল্যবোধ অর্জিত :** সামাজিক মূল্যবোধ মানুষকে শিখতে হয় বা অর্জন করতে হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে আসে না। পারিবারিক জীবনে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শৈশব থেকেই মূল্যবোধের শিক্ষণ শুরু হয় এবং এই শিক্ষণ প্রক্রিয়া বংশপরম্পরায় চলতে পারে। এমনকি সংস্কৃতির একীভূতকরণ (Cultural assimilation) অথবা বিস্তৃতির (Defusion) মাধ্যমেও সামাজিক মূল্যবোধ এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে স্থানান্তরিত হয়।

৪. **সামাজিক শৃঙ্খলা :** সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধগুলো পারস্পরিক সংযোজনের মাধ্যমে একটা সুসমন্বিত প্যাটার্ন সৃষ্টি করে এবং এর ফলে সৃষ্টি হয় মূল্যবোধ ব্যবস্থা। সমাজে এ সু-সমন্বিত মূল্যবোধ ব্যবস্থার উপস্থিতিতে সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর অনুপস্থিতিতে নানাবিধ সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়। কারণ সামাজিক মূল্যবোধের আলোকেই সমাজে মানুষ সঠিকভাবে চলতে শিখতে এবং তার প্রয়োজন মিটানোর পথ খুঁজে পায়।

৫. **সংস্কৃতির বিকাশ :** প্রতিটি সংস্কৃতির বিকাশের জন্য সামাজিক মূল্যবোধ অপরিহার্য। সমাজের জনসাধারণের মূল্যবোধের প্রতি স্থায়ী এবং সংবেদনশীল আসক্তি রয়েছে। কারণ জনগণের মাঝে মূল্যবোধ খাদ্যের মতোই অপরিহার্য।

৬. **পরিবর্তনশীল :** পরিবর্তনশীলতা সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে সামাজিক মূল্যবোধেরও পরিবর্তন হয়। যেমন গণতন্ত্রের ধারণার উদ্ভব ও বিকাশের ফলে উপনিবেশবাদ সমাজের মানুষের কাছে ধিকৃত হয়েছে।

৭. **স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া :** সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শ মানুষ যখন শিখে, তখন কোন কোন মূল্যবোধ অবচেতনভাবেই তার মনে আবিষ্ট হয় এবং এর ফলে ঐ মূল্যবোধভিত্তিক প্রতিক্রিয়া হয় স্বতঃস্ফূর্ত। যেমন- শিক্ষক ও বয়স্কদের সম্মান করা।

৮. **আপেক্ষিকতা :** সংস্কৃতির সঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত। তাই বিভিন্ন সংস্কৃতিতে সামাজিক মূল্যবোধও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন- বাংলাদেশের একজন কৃষক আসন করে মাদুরে বা কাঠের পিঁড়িতে বসেই সাধারণত খেয়ে থাকেন, কিন্তু আমেরিকান একজন কৃষক সর্বদাই খাওয়ার টেবিলে বসে খেতে পছন্দ করেন।

৯. **আদর্শের সাথে সম্পর্কযুক্ত :** সমাজের মানুষের বিভিন্ন কর্মে অনুসৃত আদর্শগুলো সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারাই রীতিসিদ্ধ হয়। কারণ সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শ একটি অপরটির সহগামী এবং সম্পূরক হিসাবে বিবেচিত হয়।

১০. **সামাজিক পুরষ্কার ও শাস্তি :** সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তিতেই সমাজে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। যেমন- একজন পাপাচারী ডাকাতের হত্যাকারীকে অনেক সময় পুরস্কৃত করা হয় কিন্তু নির্দোষ ব্যক্তির হত্যাকারীর চূড়ান্ত শাস্তি হিসেবে ফাঁসি দেওয়া হয়।

১১. **রীতি-নীতির সমষ্টি :** সামাজিক মূল্যাবোধের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সামাজিক রীতি-নীতি, চাল-চলন, আচার-আচরণ, ধারণা, মনোভাব, বিশ্বাস, নীতি প্রভৃতির সমষ্টিগত রূপ।

১২. **মানবিক ও গুণাবলির বিকাশ :** সামাজিক মূল্যবোধ সমাজের মানুষের মধ্যে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, শৃঙ্খলাবোধ, শ্রমের মর্যাদা, সহনশীলতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলি বিকাশে সাহায্য করে।

১৩. **ঐক্য ও গতিশীলতা :** একই সামাজিক মূল্যাবোধে বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে একটি ঐক্য গড়ে ওঠে এবং এ ঐক্যের ভিত্তিতে সমাজের মানুষ বিভিন্ন গতিশীল ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। ফলে সমাজে গতিশীলতা বিদ্যমান থাকে।

১৪. **প্রতিবাদধর্মী :** সামাজিক মূল্যাবোধ সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদধর্মী। যেমন- সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, হত্যা, চাঁদাবাজি, শোষণ, অপহরণ, ছিনতাই, নারী নির্যাতন প্রভৃতি অন্যায়ের প্রতি সমাজের মূল্যবোধপন্থী মানুষ প্রতিবাদমুখর হওয়ার কারণে এগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

১৫. **সামাজিক প্রগতি ও কল্যাণ :** সামাজিক মূল্যাবোধ সামাজিক প্রগতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি মানুষের অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে বাঞ্ছিত আচরণের দিকে ধাবিত করে। ফলে সামাজিক প্রগতি ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

৬.৩.২ মূল্যবোধ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ

মূল্যবোধ বলতে মানুষের এমন এক বিশ্বাস বোধ ও মানদণ্ডকে বোঝায়। যার মাধ্যমে কোনো বিষয়ের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়। মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, চাল-চলন, কার্যক্রম প্রভৃতি মূল্যবোধের অনুকরণে পরিচালিত হয়। কল্যাণমূল্যক কাজ করার জন্য অর্থের প্রয়োজন আবার কল্যাণমূলক কাজে অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমেই অর্থনীতির সার্থকতা। তাই মূল্যবোধ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তাদের সম্পর্কের বিশেষ দিকগুলো হলো–

১. **মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ :** মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা সামাজিক মূল্যবোধের একটি অন্যতম কাজ। কারণ মৌল চাহিদার অপূরণ থেকে সমাজে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়। অর্থনীতির সাহায্য ছাড়া এ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। প্রতিটি চাহিদা পূরণের জন্যই অর্থের প্রয়োজন হয়। এখানে সামাজিক মূল্যবোধ বাস্তবায়ন অর্থনীতির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।

২. **অভিন্ন নীতি :** সসীম সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের অসীম চাহিদা পূরণ করে তাদের স্বনির্ভর করার নির্দেশনা অর্থনীতি দিয়ে থাকে। সামাজিক মূল্যবোধ ও সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় মানুষকে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করে। এভাবেই নীতিগত দিক থেকে উভয়ে একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৩. **একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :** সামাজিক মূল্যবোধ এবং অর্থনীতি উভয়েরই লক্ষ্য হলো মানবকল্যাণ। অর্থনীতি মানুষের অভাবপূরণের জন্য চেষ্টা করে। সামাজিক মূল্যবোধ মানুষের সকল দিকের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালায়। এক কথায় মানুষের কল্যাণে উভয়েই কাজ করে থাকে এবং এটি তাদের অন্যতম লক্ষ্য।

৪. **কল্যাণমুখী ও বিকাশমুখী অর্থনীতি :** কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ। জনকল্যাণমূলক অর্থনীতির সাথে সমাজকর্মের একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এ সম্পর্কের ফলেই কল্যাণমুখী ও বিকাশমুখী অর্থনীতি আরো সুদৃঢ় হয়েছে।

৫. **কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা : স্টুয়ার্ট সি. ডড** এর-মতে, 'সামাজিক মুল্যবোধ হলো ঐসব রীতিনীতির সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের নিকট থেকে আশা করে এবং যা সমাজ ব্যক্তির নিকট থেকে লাভ করে।' কাজেই সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমে সমাজ মানুষের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে। এজন্য বিভিন্ন কাজের উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। অর্থনীতি বেকারত্ব লাঘবের জন্য কর্মসংস্থানের চেষ্টা চালায়। তাই কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উভয়ে মানুষকে সহায়তা করে থাকে।

৬. **খাপ খাওয়াতে সহায়তা করা :** দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলে জনগণ সমাজে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না। সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমে সমাজ সমাজের মানুষকে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করে। এ ক্ষেত্রে অর্থনীতি সমাজকর্মের উপর নির্ভরশীল। কেননা সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমে সমাজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি না করলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভেস্তে যাবে।

৭. **অর্থনীতি সমস্যা সমাধানে সহায়ক :** সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য যত ভালো কর্মসূচি আসুক না কেন, অর্থনীতির জ্ঞান ব্যতীত তার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অর্থনীতি অধ্যয়নের মাধ্যমেই সমাজকর্মীরা সামাজিক মূল্যবোধ বাস্তবায়নের জন্য সীমিত সম্পদের মাধ্যমে মানুষের অসীম চাহিদা পূরণের জ্ঞান অর্জন করে থাকে। তাই বলা যায় সামাজিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে অর্থনীতি।

৬.৩.৩ ব্যক্তিগত জীবনে অঙ্গীকারবদ্ধতা

সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেক মানুষেরই কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এসব দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সমাজের উন্নতি নির্ভর করে। দায়িত্বের পাশাপাশি জবাবদিহির ব্যাপারটি জড়িত। অন্যদিকে দায়িত্ব ও জবাবদিহির মাধ্যমে অধিকার ভোগ করা সহজ হয়। তাই সামাজিক দায়িত্ব ও কতর্ব্যবোধ সামাজিক মূল্যবোধকে সহায়তা করে।

৬.৩.৪ নৈতিক সততা ও আইনগত সততা

সমাজকর্ম মূল্যবোধের প্রাথমিক অবস্থার সময়কালকে বলা হয় নৈতিক পর্যায়। এ সময় সাহায্যার্থীদের মূল্যবোধগত অবস্থানকে গুরুত্বের সাথে দেখা হতো। এ সময় ভিক্ষাবৃত্তির বেশি প্রচলন ছিল। তখন চেষ্টা করা হয় ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া এবং রিলিফ ব্যবস্থার প্রচলন করা। এর অংশ হিসেবে আমেরিকায় দান সংগঠন সমিতি (Cos) এবং 'Settlement Home' আন্দোলন গড়ে ওঠে। এসবের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের নৈতিকতাকে চাঙ্গা করা। নৈতিকতার পর্যায়ে মানুষের স্নেহ, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, অংশগ্রহণ প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। নৈতিকতার বিষয়গুলো সমাজকর্মের মূল্যবোধের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। এক্ষেত্রে ব্যক্তি মর্যাদার স্বীকৃতি ও মানবতাবোধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

৬.৩.৫ মূল্যবোধের উন্নয়ন ও পরিশীলন

সামাজিক মূল্যবোধ সমাজ অনুমোদিত আচার-আচরণের সমষ্টি। পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় মূল্যবোধের ভূমিকা অপরিহার্য। মূল্যবোধ কতগুলো বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সামাজিক মূল্যবোধ যেসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো–

১. **আইনের শাসন :** আইনের শাসন সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম ভিত্তি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তির স্বাধীনতা বজায় থাকলে ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হবার সুযোগ পায়, তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং নিজের অধিকার সম্পর্কেও সচেতন হয়। একটি দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের সকলেই আইন মেনে চলে। ফলে সবাই আইনের আওতায় আসে। ফলে সামাজিক মূল্যবোধ অধিক শক্তিশালী হয় এবং সামাজিক ভূমিকা পালনে জোরালো অবদান রাখে।

২. **সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার :** একটি সমাজের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচারের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সুবিচার নিশ্চিত করতে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সাম্য ও ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতিতে সামাজিক অবক্ষয় এসে সমাজে বাসা বাঁধে। পশুসুলভ আচরণ, বিশৃঙ্খলা, অমানবিকতা প্রভৃতিতে সমাজ ছেয়ে যায়। সমধিকারা ও ন্যায়বিচার সমাজের সব কিছুর অবসান ঘটিয়ে সুন্দর ও সুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। এজন্য সাম্য ও ন্যায়বিচার সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত।

৩. **ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ :** ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সামাজিক মূল্যবোধের আরেকটি অন্যতম ভিত্তি। এটি মানুষকে সামাজিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ করে। সমাজস্থ মানুষের মধ্যে মৈত্রী ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক না থাকলে সামাজিক শান্তি কোনো দিনই আশা করা যায় না। এজন্যই সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল থাকতে পারে যে, সামাজিক ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি। যা সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত।

৪. **সামাজিক শৃঙ্খলা :** সামাজিক ঐক্য ও সংহতির জন্য শৃঙ্খলা অপরিহার্য। এটি মানবিক গুণাবলি বিকাশেও সহায়ক। উন্নত সমাজ ব্যবস্থার এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। অর্থাৎ যে সমাজ যত বেশি সুশৃঙ্খল সে সমাজ তত উন্নত। সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ সমাজে মানবীয় গুণাবলির বিকাশের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি আনয়ন করে। তাই এটি সামাজিক মূল্যবোধের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত।

৫. **সহানুভূতি ও সহমর্মিতা :** সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সমাজ খুবই জরুরি। সহানুভূতি ও সহমর্মিতা এ দুটি মানবীয় গুণাবলির উপাদান। সমাজের সদস্যদের মধ্যে সহনশীল গুণ থাকা অতি জরুরি। এর অভাবে সমাজে হিংসা, হানাহানি, সংঘাত, দ্বন্দ্ব, সামাজিক অবক্ষয় প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। ফলে মূল্যবোধের বিকাশ ঠিকভাবে হয় না। তাই কার্যকর সমাজব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে সামাজিক সহনশীলতা ও সহমর্মিতা।

৬. **শ্রমের মর্যাদা :** শ্রমের মর্যাদা শুধু সামাজিক মূল্যবোধেরই ভিত্তি নয়, একটি জাতির উন্নয়নের চাবিকাঠিও বটে। এজন্যই শ্রমবিমুখ জাতি কোনোদিনই উন্নতির শিখরে উঠতে পারে না। একটি জাতির সব শ্রমের বিনিময়ে সে জাতির উন্নয়ন সাধিত হয়। তাই দৈহিক ও মানবিক সব শ্রমকেই সবার মর্যাদা দেওয়া উচিত। শ্রমবিমুখ জাতি মর্যাদাহীন, মূল্যহীন ও তুচ্ছ জাতি হিসেবে পরিচিত। তবে কৃষক, শ্রমিক ও জ্ঞানীর শ্রম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৭. **সামাজিক নীতিবোধ :** নীতিবোধ মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। যে সমাজে নৈতিকতার শক্তি যত বেশি সে সমাজ তত সুশৃঙ্খল। নীতিবান মানুষ ন্যায়-অন্যায় মেনে চলে। অর্থাৎ ভালো-মন্দ বিচার করে জীবনযাপন করে। নৈতিকতা জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমাজ হলো এর উৎপত্তি ও চর্চার কেন্দ্র। মূল্যবোধের সাথে এর রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এসব কারণেই নৈতিকতা সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম ভিত্তি ও উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

৮. **পারস্পরিক সহযোগিতা :** পারস্পরিক সহযোগিতা সামাজিক মূল্যবোধের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভিত্তি। মানুষে মানুষে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা না থাকলে সমাজে কোনোদিন শান্তি আশা করা যায় না। সমাজে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক কেবল এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এভাবে নানাভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা মূল্যবোধকে সহায়তা করে।

৯. **ধর্মীয় অনুশাসন :** ধর্মীয় অনুশাসন বা রীতিনীতি মানুষের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করে। ধর্মীয় অনুশাসন না মেনে চললে সমাজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ধর্মীয় আদর্শ, বিশ্বাস, রীতিনীতি প্রভৃতি মানুষকে সৎ জীবনযাপনে সহায়তা করে। অর্থাৎ এগুলো মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। তাই ধর্মীয় অনুশাসন একটি তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক মূল্যবোধ।

৬.৪ সামাজিক দক্ষতা ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক

৬.৪.১ আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারনে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কারণেই এ সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। নিজের স্বার্থকে কখনও বড় করে দেখতে হয় না। আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, চলা-ফেরায় অন্যের প্রতি যথাযথ সম্মান সহানুভূতি প্রদর্শন এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্বাধীনতা প্রদান ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক তৈরীতে সহযোগিতা করে।

৬.৪.২ সহমর্মিতা ও সহযোগিতা

সমাজে বসবাসকারী পরস্পরের মধ্যে সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব থাকতে হবে। সহযোগিতামূলক মনোভাবের কারণে মানুষ একে অপরের কাছে আসে। 'সকলের তরে সকলে আমরা' এ চেতনা সামাজিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে, ফলে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

৬.৪.৩ আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক সুরক্ষা

সকল ক্ষেত্রে বন্ধুসুলভ আচরণ করা উচিত। কখনও অন্য ব্যক্তির মতামতের প্রতি অসম্মান জানানো ঠিক নয়। যে ব্যক্তির যতটুক পাওয়া উচিৎ প্রত্যাশাটা সেরকম হওয়াই শ্রেয়, বিপদ-আপদে সহানুভূতির হাত বাড়ানো, এভাবেই আন্তঃব্যক্তির সম্পর্ক সুরক্ষা করা যায়।

৬.৪.৪ বিরোধের কারণসমূহ এবং সমাধান

আমাদের প্রত্যাশা ও পাওয়ার পার্থক্যের জন্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ প্রত্যাশা পূরণ না হলেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। দ্বন্দ্ব সাংগঠনিক আচরণের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সংগঠন চায় কর্মীদের দ্বারা অধিক উৎপাদনের মাধ্যমে ঈপ্সিত সাফল্য লাভ করতে। অপরদিকে, কর্মীরা চায় কাজের বিনিময়ে অধিক সুবিধা। যখনই এ দুই অবস্থার মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটে তখনই দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়।

যে কোনো বিষয়ে দুই বা অধিক ব্যক্তির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তাকে সাধারণ অর্থে দ্বন্দ্ব বলা হয়। মৌলিক অর্থে বলা যায়, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা দল কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একমত পোষণ না করলে এবং উল্লিখিত বিষয় নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তাকে দ্বন্দ্ব বলে। বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে দ্বন্দ্বের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রমাণ্য সংজ্ঞা দেওয়া হলো :

১. **L.J. Mullins-** এর মতে, 'দ্বন্দ্ব হলো কোনো ব্যক্তির আচরণ যা কোনো ব্যক্তির লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে থাকে।'

২. **March Ges Simson-** এর মতে, 'সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দিষ্ট পদ্ধতির ব্যর্থতাকে দ্বন্দ্ব নামে অভিহিত করা যায়।'

৩. **Griffin-** এর মতে, 'অর্থাৎ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা দলের মধ্যকার মতানৈক্যকেই দ্বন্দ্ব বলে অভিহিত করা যায়।'

সমাধান সমূহ :

১. **অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপক তাদের প্রণীত সিদ্ধান্তই কর্মীদের উপর চাপিয়ে দেন। এক্ষেত্রে কর্মীদের মতামতকে সম্মান দেয়া হয় না। ব্যবস্থাপককে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পারস্পরিক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে কর্মীদের কর্মক্ষমতা বাড়ে।

২. **প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎসাহ দান :** সংগঠনের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা বিদ্যমান থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা উৎসাহ নিয়ে কাজ করে।

৩. **আপষ :** সতর্কতা বজায় রেখে আপষের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসন করা যায়।

৪. **পারস্পরিক স্বার্থের নীতির বাস্তবায়ন :** ব্যবস্থাপক যদি কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে তাহলে কর্মীরা অধিক উৎপাদনের প্রতি মনোনিবেশ করে। এর ফলে উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে এবং ফলশ্রুতিতে দ্বন্দ্ব নিরসন হবে।

৫. **সুস্পষ্ট নীতিমালা :** প্রতিষ্ঠান কীভাবে পরিচালিত হবে তার একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। এর ফলে কোনো কর্মীর মনে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হবে না।

৬. **বাইরে থেকে লোক আনয়ন :** প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতা নিয়ে অনেক সময় দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে লোক নিয়োগ করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করা হয়।

৭. **প্রক্রিয়ার পরিবর্তন :** সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিবর্তনের মাধ্যমেও দ্বন্দ্ব নিরসন করা সম্ভব হয়। এতে প্রতিটি কাজের পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

৮. **সম্পদের প্রসার :** প্রতিষ্ঠান সম্পদের প্রসার ঘটাতে পারলে সংশ্লিষ্ট সকলের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। দ্বন্দ্বহ্রাস পাবে।

৯. **সমতা আনয়ন :** এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। আর যেসব বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা সম্ভব নয়, সেসব বিষয়ের উপর তেমন জোর দেওয়া হয় না, এ পদ্ধতিকে বলা হয় সমতা আনয়ন পদ্ধতি।

১০. **বল প্রয়োগ :** মধ্যস্থতাকারী একজন ব্যক্তি এ পর্যায়ে বলিষ্ঠভাবে হস্তক্ষেপ করে দুই পক্ষের অনড় মনোভাবের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারেন।

১১. **সমঝোতা :** দ্বন্দ্ব নিরসনের একটি প্রাচীন পদ্ধতি সমঝোতা। এতে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গকে কিছু গ্রহণ এবং কিছু ত্যাগ করতে হয়। শিল্পবিরোধ নিরসনের ক্ষেত্রে সমঝোতা অধিক ব্যবহৃত পন্থা।

১২. **ঘটনার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন :** সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে এক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের মূল কারণ এবং উৎস খুঁজে বের করে দ্বন্দ্বের সমাধান করা হয়।

১৩. **যোগাযোগ :** সংগঠনে যোগাযোগ পদ্ধতি উন্নয়নের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসন করা যায়।

১৪. **মুখোমুখি আলোচনা :** বিবদমান পক্ষসমূহ এক্ষেত্রে বসে সমস্যার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করে, মুখোমুখি আলোচনা করে এবং সর্বশেষে সমাধানে উপনীত হয়।

৬.৪.৫ আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক উন্নয়নের কৌশল

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের কারণেই এ সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি বা কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তি-ব্যক্তি সম্পর্ক উন্নয়ন হয়।

নিম্নে এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. **বন্ধুসুলভ আচরণ :** বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক বৃদ্ধি করা যায়। ভালো আচরণের মাধ্যমে যা অর্জন করা সম্ভব খারাপ আচরণের মাধ্যমে তা কখনও সম্ভব নয়।

২. **যথাযথ সম্মান :** যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের উন্নয়ন হয়। প্রাপ্য সম্মান নিশ্চিতভাবে প্রদানের মাধ্যমেও তা করা সম্ভব।

৩. **সহানুভূতি :** সহানুভূতি প্রদর্শনের মাধ্যমেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে সহানুভূতি বিরাট ভূমিকা পালন করে।

৪. **প্রাপ্তির নিশ্চিয়তা :** যে ব্যক্তির যতটুকু পাওয়া উচিত ঠিক ততটুকু প্রদানের মাধ্যমেও তা করা সম্ভব। অর্থাৎ মানুষ তার ন্যায্য অংশ প্রাপ্ত হলে মানুষে মানুষে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে।

৫. **স্বাধীনতা প্রদান :** প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনতা প্রত্যাশা করে। কোনো কারণে স্বাধীনতা খর্ব হলে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা প্রদানের দ্বারাও ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক উন্নয়ন হয়।

৬. **মানসিক চাহিদা :** মানুষের নানা ধরনের চাহিদার মধ্যে মানসিক চাহিদাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানসিকভাবে মানুষ সুস্থ থাকলে যেমন কাজে উৎসাহ পায় ঠিক তেমনি দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়।

৭. **বিশ্বস্ততা :** ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক উন্নয়নে বিশ্বস্ততা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বিশ্বস্ততার মাধ্যমে শুধু সম্পর্ক উন্নয়ন হয় না, সম্পর্ক দীর্ঘজীবীও হয়।

৮. **স্বীকৃতি :** স্বীকৃতি প্রদান দ্বারা ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের বিকাশ ঘটে। এটি ছাড়া সম্পর্ক উন্নয়ন কল্পনাও করা যায় না।

৯. **ভুল বোঝাবুঝির অবসান :** বিভিন্ন কারণে মানুষের সাথে মানুষের ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এগুলো অবসানের মাধ্যমে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক উন্নয়ন সম্ভব।

১০. **কৃতিত্ব :** ভালো কাজের কৃতিত্ব প্রদানের দ্বারা ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক আরও ভালো হয়। মানুষ তার ভালো কাজগুলোর স্বীকৃতি আশা করে। আর তা পেলেই শ্রদ্ধাবোধ বহুগুণে বেড়ে যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, মানুষ সামাজিক জীব। একে অন্যের সাথে মনের ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যমে জীবনযাপন করতে হয়। তাই ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক উন্নয়ন করা প্রয়োজন। তাই উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে কাজ করলেই ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক উন্নয়ন হবে।

৬.৫ উপস্থাপন কৌশল

৬.৫.১ বাচনভঙ্গি

সাধারণভাবে বলা যায়, যে ব্যক্তি সভা বা অনুষ্ঠান পরিচালনা করে, তাকে উপস্থাপক বলে। অনুষ্ঠানের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপকের দক্ষতা ও নিপুণতার ওপর নির্ভরশীল। শ্রোতা ও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের মন জয় করার মাধ্যেই তার সার্থকতা। একজন উপস্থাপকের দৈহিক ভাষা বা তাকে দেখতে কী রকম হবে তা নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর, যেমন−

১। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী;
২। সুদর্শন;
৩। পরিশ্রমী;
৪। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব;
৫। আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বর;
৬। সততা ও বিশ্বস্ততা;
৭। আত্মবিশ্বাস ও
৮। সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদি।

পরিশেষে উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, উল্লিখিত বিষয়গুলোই উপস্থাপনা দক্ষতার দৈহিক ভাষা।

৬.৫.২ উপস্থাপন কৌশল

যে ব্যক্তি কোনো বিষয় উপস্থাপন করেন তিনিই হলেন উপস্থাপক। উপস্থাপনা যে কোনো অনুষ্ঠানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য ও স্বার্থকতা নির্ভর করে সুন্দর উপস্থাপনের উপর। যে কোনো সভা ও অনুষ্ঠানকে সুন্দর, আকর্ষণীয়, প্রাণবন্ত করতে সঠিক উপস্থাপনা কৌশল উপস্থাপকের আয়ত্ত করতে হয়। মূলত সমগ্র অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সার্থকভাবে পরিচালিত করতে হলে একজন উপস্থাপককে অবশ্যই মার্জিত, রুচিশীল, উপস্থিত বুদ্ধি, হাস্যোজ্জ্বল, সময় সচেতন ও সুন্দর বাচনভঙ্গির অধিকারী হতে হয়।

৬.৫.৩ ভাষা ও সঠিক উচ্চারণরীতি

ভাষা বলতে আমরা মানবকণ্ঠের শব্দসমষ্টিকে বুঝি। একজন উপস্থাপকের ভাষা সম্পর্কে যথেষ্ট ভালো ধারণা থাকতে হবে। অনেক সময় সাধু ও চলিত ভাষায় মিশ্রণ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। বাংলা, ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে এবং উচ্চারণও স্পষ্ট হতে হবে। ভাষাজ্ঞান ভালো হলে উপস্থাপনা দক্ষতা অনেক বৃদ্ধি পায়।

৬.৫.৪ উপস্থাপনার গতি ও কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ

সাধারণভাবে স্বর বলতে আমরা মানুষের কণ্ঠের যে শব্দ তাকে বুঝে থাকি। একজন উপস্থাপকের স্বর স্পষ্ট হতে হবে। অর্থাৎ শব্দ ভালো ও সুন্দর হতে হবে, যাতে শ্রোতা-দর্শকরা সহজে বুঝতে পারে। মিনমিনে বা করুণ স্বর অনেক উপস্থাপকের ভাবমূর্তি নষ্ট করে ফেলে।

৬.৫.৫ উপস্থাপনায় আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার

উপস্থাপনা বলতে কোনো বক্তব্য জনসম্মুখে প্রকাশ করাকে বোঝায়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংগঠনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক যখন তার ব্যবসায়ের পরিচিতির জন্য সভা আহ্বান করে মঞ্চের মাধ্যমে জনসম্মুখে বক্তব্যে তা তুলে ধরেন, তখন তাকে উপস্থাপন বলে। এটা যখন কোনো ব্যক্তি একটি সভা বা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সুন্দরভাবে পরিচালনার ক্ষমতা বা সামর্থ্য প্রদর্শন করতে পারেন, তখন তাকে উপস্থাপনা দক্ষতা বলে। আর যিনি উপস্থাপনা করেন তাকে উপস্থাপক বলে। উপস্থাপনা দক্ষতা অর্জনের জন্য উপস্থাপকের পোশাক হতে হবে স্বাস্থ্যসম্মত, রুচিশীল, মার্জিত ও ভদ্রোচিত। অর্থাৎ যে পোশাকের রং, আকার-আকৃতি সুন্দর কিন্তু উগ্র নয় যে কোনো ব্যক্তির কাছে গ্রহণযোগও বলে বিবেচিত হবে। মঞ্চে আত্মবিশ্বাসী হয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতে হলে উপস্থাপকের গলার স্বর হতে হবে সুস্পষ্ট এবং ভাষা হতে হবে সহজবোধ্য। উপস্থাপকের কণ্ঠের স্বর স্পষ্টকরণ তথা উপস্থাপনা দক্ষতা আনয়নে বর্তমানে অনেক আধুনিক যন্ত্রের উদ্ভব ও প্রচলন দেখা যায়। যেমন– LED প্রজেক্টর যার মাধ্যমে উপস্থাপক সুন্দরভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন পাওয়ারবায়েস্ট স্লাইডের মাধ্যমে, ফলে শ্রোতারা সুন্দরভাবে শ্রবণের পাশাপাশি লিখিত বক্তব্য ছবিসহ দেখার সুযোগ পায়। এতে করে শ্রোতা বা সভার সদস্যগণ উপস্থাপনকৃত বিষয় সম্পর্কে দ্রুত ভালো ধারণা অর্জন করতে পারেন।

6.6 Skill in Communicative English
(Conversational Situation)
6.6.1 Living in an Apartment

Conversation A

S1. What floor *is* your apartment on?
S2. It's on the third floor.
S1. Is the building a walk-up?
S2. No. It has a small elevator.

Conversation B

S1. How large is your apartment?
S2. It has four and a half rooms.
S1. Then you have two bedrooms.
S2. Right. A living room, a kitchen, two bedrooms, and a bath.

Conversation C

S1. Is this your apartment?
S2. Yes, it is.
S1. How many bedrooms do you have?
S2. Two big ones and one small one.

Conversation D

S1. What's a cooperative apartment?
S2. In a cooperative, you actually buy the apartment.
S1. Just as you would buy a house?
S2. Yes. Then you only pay maintenance costs each month.

Conversation E

S1. Do you like your new apartment?
S2. Yes, I like the service in the building, too.
SI. Are there doormen and guards?
S2. Yes, and the building is close to the shopping areas.

6.6.2 Speak English Using the Telephone /Conversations

Conversation A

S1. Could you give me the number of the Best Bag Company?
S2. Is that in the city or in the suburbs?
S1. In the city. On Tenth Street.
S2. Just a moment, please.

Conversation B

S1. What's the telephone number of Pan-Eastern Airways?
S2. Just a moment, please.
S1. Thank you, operator.
S2. That number is Hillside 6-7600.

Conversation C

S1. I'd like to speak to Bob, please.
S2. What number are you calling?
S1. M-U-one-four-three-seven-six.
S2. Sorry. You've got the wrong number.

Conversation D

S1. May I speak to the director, please?
S2. Who's calling, please?
S1. Tell him it's his friend from California.
S2. Just a moment, please

Conversation E

S1. I'd like to speak to Mr. Bush, please.
S2. May I ask who's calling, please?
S1. Tell him it's his assistant.
S2. Please hold the line while I see if he's in.

6.6.3 About Different Types Of Cutters

Conversation A

S1. Which cutting tools are available in your factory?
S2. We have knife, hakso blade, wire cutter, wire stripper etc.
S1. What do you used for cutting scostape?
S2. We use scissor for cutting scostape.

Conversation B

S1. What is the function of knife in laboratory?
S2. Knife is used for cutting vegetable and fruit sample etc.
S1. Is there any other function?
S2. There are many functions of knife in example it is used for removing skin and head of fish, shrimp sample, dividing into small pieces before blending.

Conversation C

S1. Have you facility for cutting rod?
S2. Yes. We have hakso blade for cutting rod.
S1. How do you cut wire?
S2. We cut wire by wire cutter or wire stripper.

6.6.4 Speak English get help in Stores and Talking about shopping

Get help in Stores

Conversation A

S1. Do you wish some assistance?
S2. Yes. How much is that pen?
S1. This one or that one?
S2. The one next to the black one.

Conversation B

S1. May I help you?
S2. Yes, I'd like to look at pens.
S1. Certainly. Fountain pens or ball-point pens?
S2. I'm looking for a good fountain pen,

Conversation C

S1. Could you help me, please?
S2. What can I do for you?
S1. Could I look at the wristwatch in this case?
S2. Just one moment, please, while I get the key.

Conversation D

S1. Hello. Are you waited on?
S2. No. I'd like a ream of typing paper, please.
S1. Will there be anything else?
S2. No. I believe that's all, thank you.

Conversation E

S1. Is someone helping you?
S2. I beg your pardon?
S1. Could I help you with anything?
S2. No, thanks. Someone is already waiting on me.

Getting Help in Stores/ Exercises 1-4

Exercise 1 / Line Al /

want	Do you wish some assistance?
help	Do you want some help?
Would you like	Would you like some help?
advice	Would you like some advice?
care for	Would you care for some advice?

Exercise. 2 / Line A2 /

How much is that pen?	How much does that pen cost?
How much are those dishes?	How much do those dishes cost?
How much is that briefcase?	How much does that briefcase cost?
How much are those gloves?	How much do those gloves cost?
How much is that alarm clock?	How much does that alarm clock cost?
How much are those glasses?	How much do those glasses cost?

***Exercise 3 / Line* A3 /**

How much does that pen cost?	What does that pen cost?
How much do those dishes cost?	What do those dishes cost?
How much does that briefcasecost?	What does that briefcase cost?
How much do those gloves cost?	What do those gloves cost?
How much does that alarm clockcost?	What does that alarm clockcost?
How much do those glassescost?	What do those glasses cost?

***Exercise 4 / Line* A2 /**

How much is that pen?	What does that pen cost?
How much are those glasses?	What do those glasses cost?
How much is that billfold?	What does that billfold cost?
How much arc those two ashtrays?	What do those two ashtrays cost
How much is that small vase?	What does that small vase cost?

Getting Help in Stores / Exercises 5-8

Exercise 5 / Line A4 /

I mean the one next to the black one.

beside	I mean the one beside the black one.
close to	I mean the one close to the black one.
behind	I mean the one behind the black one.
in front of	I mean the one in front of the black one.
opposite	I mean the one opposite the black one.
near	I mean the one near the black one.
under	I mean the one under the black one.

Exercise 5 / Line B4 /

I'd like to look at pens.	May I look at your pens?
I'd like to look at cameras.	May I look at your cameras?
I'd like to look at billfolds.	May I look at your billfolds?
I'd like to look at watches.	May I look at your watches?
I'd like to look at suitcases.	May I look at your suitcases?
I'd like to look at suits.	May I look at your suits?
I'd like to look at overcoats.	May I look at your overcoats?

Exercise 7 / Line B4 /

I'm looking for a good fountain pen.

expensive	I'm looking for an expensive fountain pen.
wristwatch	I'm looking for an expensive wristwatch.
cheap	I'm looking for a cheap wristwatch.
camera	I'm looking for a cheap camera.
small	I'm looking for a small camera,
practical	I'm looking for a practical camera.

Exercise 8 / Line Cl /

Could you help me, please?

assist	Could you assist me, please?
Would	Would you assist me, please?
advise	Would you advise me, please?
Can	Can you advise me, please?
wait on me	Can you wait on me, please?
take care of	Can you take care of me, please?

Getting Help in Stores / Exercises 9 and 10

Exercise 9 / Line C3 /

gold pen	Could I look at the gold pen in this case?
in the black box	Could I look at the gold pen in the black box?
small camera	Could I look at the small camera in the black box?
on the shelf	Could I look at the small camera on the shelf?
black leather billfold	Could I look at the black leather billfold on the shelf?

Exercise 10 / Line D2 /

I'd like a rim of typing paper, please.

a pad of drawing paper	I'd like a pad of drawing paper, please.
a packet of lined paper	I'd like a packet of lined paper, please.
a bottle of ink	I'd like a bottle of ink, please.
a box of paper clips	I'd like a box of paper clips, please.
a box of stationer	I'd like a box of stationery, please.

Talking about Shopping/ Conversations

Conversation A

S1. Where do you do your shopping?
S2. I usually start at he Central Department Store.
S1. What do you think of their selection?
S2. They have a good selection, and their prices are low, too.

Conversation B

S1. They're having a big sale at the Greenfield Shopping Center.
S2. Anything in particular on sale?
S1. Well, they advertised linens and house furnishings.
S2. suppose there'll be crowds of people in the store.

Conversation C

S1. I spent the afternoon shopping for clothes.
S2. How did you make out?
S1. Well, I found an excellent raincoat, and I bought some shoes.
S2. That reminds me that I have to go shopping soon.

Conversation D

S1. Where did you buy your coat?
S2. I bought it at the Fifth Avenue Store—but a long time ago.
S1. About how much did it cost?
S2. At the moment, I've forgotten how much it cost.

Conversation E

S1. Why did you choose the green one?
S2. To tell the truth, I really didn't have much choice in my size.
S1. Excuse my asking, but how much did you pay for it?
S2. It was on sale, and I paid only forty-five dollars

6.6.5 Sending and Receiving Letters/ (Conversation)

Conversation A

S1. *Are* you writing a letter?
S2. Yes. I'm writing to my family.
S1. Do you write letters very often?
S2. Yes. I write five or six letters a week.

Conversation B

S1. Do you write letters very often?
S2. No. I hate to write letters.
S1. It takes a lot of time.
S2. It sure does.

Conversation C

S1. Did Robert get a letter?
S2. Yes. He got one yesterday.
S1. Does he get many letters?
S2. Yes. He gets some every day.

Conversation D

S1. Charles wrote me a long letter.
S2. When did he write to you?
S1. He sent the letter to me about a week ago.
S2. He hasn't even sent me a postcard yet!

Conversation E

S1. We wrote to Mary's sister last week.
S2. Has she written to you yet?
S1. No, she hasn't.
S2. She wrote to me a few days ago.

6.6.6 *Talking about the Weather & trips and sight seeing*

Talking about Weather Condition

Conversation A

S1. It was hot yesterday,
S2. But it's quite cool today.
S1. Yes. I'm wearing a sweater under my coat.
S2. I'm going to put on a jacket.

Conversation B

S1. It's freezing today!
S2. Yes. It's worse than yesterday.
S1. How cold is it?
S2. t's ten below.

Conversation C

S1. What cold weather this is!
S2. It certainly is.
S1. What's the temperature?
S2. It's five above.

Conversation D

S1. You've seen a hurricane, haven't you?
S2. Once, a long time ago.
S1. Does it ever snow in your country?
S2. Only a few times a year.

Conversation E

S1. Do you like the weather in this part of the country?
S2. Not really, but I'm adjusted to it now.
S1. Is the weather different in your part of the country?
S2. Yes. It never gets as cold there as it does here.

Talking about the Weather I Exercises 1-5

Exercise 1 / Lines A1 and A2 /

It was hot yesterday.	It *was* quite hot, wasn't it?
It was cold yesterday.	It *was* quite cold, wasn't it?
It was warm yesterday.	It *was* quite warm, wasn't it?
It was cool yesterday.	It *was* quite cool, wasn't it?
It was chilly yesterday.	It *was* quite chilly, wasn't it?
It was damp yesterday.	It *was* quite damp, wasn't it?

Exercise 2 / Line A4 /

I'm going to put on a sweater.

a wool shirt	I'm going to put on a wool shirt.
a jacket	I'm going to put on a jacket.
gloves	I'm going to put on gloves.
an overcoat	I'm going to put on an overcoat.
overshoes	I'm going to put on overshoes.

Exercise 3 / Line B2 /

It's worse than yesterday.

better	It's better than yesterday.
hotter	It's hotter than yesterday.
colder	It's colder than yesterday.
warner	It's warmer than yesterday.
cooler	It's cooler than yesterday.

Exercise 4 / Line B2 /

It's worse than yesterday.	It's the worst day in a long time.
It's hotter than yesterday.	It's the hottest day in a long time.
It's colder than yesterday.	It's the coldest day in a long time.
It's warmer than yesterday.	It's the warmest day in a long time.
It's cooler than yesterday.	It's the coolest day in a long time.

Exercise 5 / Line C1/

What cold weather this is!

humid	What humid weather this is!
hot	What hot weather this is!
cloudy	What cloudy weather this is!
damp	What damp weather this is!
sticky	What sticky weather this is!

Trips and Sight-seeing/Conversations

Conversation A

S1. Did you *have a* nice time over the weekend?
S2. I had lots of fun.
S1. What did you do?
S2. I did a lot of sight-seeing.

Conversation B

S1. How long were you out of town?
S2. I was away for two weeks.
S1. When were you away?
S2. I took the time off in August.

Conversation C

S1. How did you go to India last month?
S2. We went by plane.
S1. What kind of plane did you take?
S2. It was a jet.

Conversation D

S1. Have you ever been to Italy?
S2. No. I've never been there.
S1. Have you ever been to France?
S2. Yes. I was there last summer.

Conversation E

S1. Did your parents stay in home for very long?
S2. Yes. They stayed there for two months.
S1. Did they describe their trip to you?
S2. Yes, and they showed us a lot of photographs.

6.6.7. Talking about Eating & Dinner Conversations

Talking about Eating

Conversation A

S1. What did you have for breakfast?
S2. I had coffee, toast, and eggs.
S1. How did you have your eggs?
S2. Soft-boiled, as usual.

Conversation B

S1. How about a cup of coffee?
S2. That sounds good.
S1. I always enjoy coffee after work.
S2. I like it best in the morning.

Conversation C

S1. Would you like to have an orange?
S2. Thanks, but I don't think so.
S1. Oranges are good for you.
S2. I know, but I had one about an hour ago.

Conversation D

S1. Where did you have lunch today?
S2. I ate at the cafeteria with John.
SI. Did you have a good lunch?
S2. Yes. I had a hot roast beef sandwich.

Conversation E

S1. There's a cafeteria over there.
S2. Didn't you eat before we left?
S1. Yes, but I'm hungry again.
S2. Well, I m still digesting my lunch.

Talking about Eating I Exercises 1-5

Exercise 1 / Line Al /

What did you have for breakfast?

lunch	What did you have for lunch?
they	What did they have for lunch?
eat	What did they eat for lunch?
dinner	What did they eat for dinner?
she	What did she eat for dinner?

Exercise 2 / Line A3 /

How did you have your eggs?

coffee	How did you have your coffee?
meat	How did you have your meat?
potatoes	How did you have your potatoes?
vegetables	How did you have your vegetables?
salad	How did you have your salad?

Exercise 3 / Lines A3 and A4 /

Did you have your egg soft-boiled?

hard-boiled	Did you have your eggs hard-boiled?
poached	Did you have your eggs poached?
scrambled	Did you have your eggs scrambled?
fried	Did you have your eggs fried?

Exercise 4 / Lines B1 and B3 /

I always enjoy a cup of coffee after work.

tea	I always enjoy a cup of tea after work,
a glass of milk	I always enjoy a glass of milk after work.
wine	I always enjoy a glass of wine after work.
lemonade	I always enjoy a glass of lemonade after work.

Exercise 5 / Lines Cl and C3 /

Would you like to have an orange?	Oranges are good for you.
Would you like to have an apple?	Apples are good for you.
Would you like to have a banana?	Bananas are good for you.
Would you like to have a lemon?	Lemons are good for you.
Would you like to have a tomato?	Tomatoes are good for you.

Dinner Conversations

Conversations A

S1. I hope you're hungry tonight.
S2. I'm sure I'll have a good appetite.
S1. There's a menu right beside you.
S2. Thanks. I see it.

Conversation B

S1. What do you usually have for dinner?
S2. Potatoes and some kind of meat.
S1. Do you ever have anything else?
S2. Oh, I have other things for example, fish, rice, and vegetables.

Conversation C

S1. The fish is delicious in this restaurant. I hear.
S2. It's a popular dish in this country.
S1. But I always choose steak if possible.
S2. Well, I'm going to have fish.

Conversation D

S1. Do you like vegetables?
S2. I like some but not all.
S1. What kind do you like?
S2. I like lettuce and radishes and a few others.

Conversation E

S1. Do you always drink tea with your meals?
S2. Not always, but usually.
S1. How do you like your tea?
S2. With sugar and lemon.

Dinner Conversations I Exercises 1-4

Exercise 1 / Line Al /

I hope you're hungry tonight.

ready to eat	I hope you're ready to eat tonight.
have a good appetite	I hope you have a good appetite tonight.
feel like eating well	I hope you feel like eating well tonight.
order enough food	I hope you order enough food tonight.
something different	I hope you order something different tonight.

Exercise 2 / Line Cl /

The fish is delicious in this restaurant

wonderful	The fish is wonderful in this restaurant.
The meat	The meat is wonderful in this restaurant.
always	The meat is always wonderful in this restaurant.
excellent	The meat is always excellent in this restaurant.
The chicken	The chicken is always excellent in this restaurant.

Exercise 3 / Line C2 /

That's a popular dish in this country.

kind of food	That's a popular kind of food in this country.
famous	That's a famous kind of food in this country.
the United States	That's a famous kind of food in the United States.
kind of meal	That's a famous kind of meal in the United States.
well-known	That's a well-known kind of meal in the United States.

Exercise 4 / Line El /

Do you always drink tea with your meals?

coffee	Do you always drink coffee with your meals?
usually	Do you usually drink coffee with your meals?
at breakfast	Do you usually drink coffee at breakfast?
milk	Do you usually drink milk at breakfast?
generally	Do you generally drink milk at breakfast?

দ্বিতীয় পত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি

ভূমিকা :

আধুনিক বিশ্বে মানুষের রুচির পরিবর্তন হচ্ছে, বেড়ে চলেছে নতুন নতুন খাদ্যের চাহিদা। আর এই সমস্ত খাদ্য উৎপাদনের জন্য কারখানাগুলোতে ব্যবহৃত হচ্ছে নানারকম যন্ত্রপাতি। যন্ত্রপাতি ছাড়া খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের কথা ভাবা যায় না। যন্ত্রপাতি অবশ্যই গুণে মানে ভালো হতে হবে যাতে করে কম খরচে অল্প সময়ে অধিক খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা যায়। যন্ত্রপাতি অবশ্যই ভালো মানের ধাতুর তৈরি হতে হবে। কখনো লোহার তৈরি যন্ত্রপাতি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় ব্যবহার করা যাবে না। কারণ লোহা খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটায়, ফলে অবাঞ্ছিত রং ও ক্ষতিকর পদার্থের সৃষ্টি করে। যার কারণে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়ে যায়।

১.১ যন্ত্রপাতির তালিকা :

বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় ব্যবহৃত কিছু যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো– ছুরি, পটেটো পিলার, পটেটো স্লাইসার, রস নিষ্কাশন যন্ত্র (বাস্কেট প্রেস, লাইম জুস এক্সট্রাক্টর, লাইম জুস স্কুইজার, হাইড্রোলিক জুস প্রেস, রোজ টাইপ এক্সট্রাক্টর, স্ক্রু টাইপ জুস এক্সট্রাক্টর, ফ্রুট মিল, পালপার), বোতলজাতকরণ যন্ত্র (ভ্যাকুয়াম ফিলিং, ক্রাউন কর্কিং মেশিন, ক্যাপ সিলার, নিউম্যাটিক ক্যাপ সিলার, যান্ত্রিক ক্যাপ সিলার), জেলমিটার, রিফ্রাক্টোমিটার, ক্যানিং বা টিনজাতকরণ যন্ত্র (ডাবল ক্যান সিমার, ডাবল সিমার, ক্যান বডি রিফরমার, ক্যান বডি রোলিং মেশিন, ফ্লানজার, ক্যান ফিলিং মেশিন, ক্যান সিলার, অটো ক্যান সিলার, ম্যানুয়াল ক্যান সিলার) প্যাকেজিং মেশিন (ব্যাগ সিলার, প্যাকেট মোড়ানো যন্ত্র, কার্টন সিলার) ইত্যাদি।

১.২ যন্ত্রপাতির বর্ণনা :

১. বিভিন্ন ধরনের ছুরি : প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের পূর্বে ফল ও সবজিকে সুবিধামতো প্রস্তুত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ছুরির প্রয়োজন হয় যেমন–

২. পাইনআপেল রিমুভার: পাইনআপেল রিমুভার কোণাকৃতি পাত বিশিষ্ট একধরনের ছুরি। এর সাহায্যে আনারসের চোখ অতি সহজেই তুলে ফেলা যায়।

চিত্র : পাইনাআপেল রিমুভার

(ক) পিলিং নাইফ : পিংলি নাইফ ফল ও সবজির খোসা ছাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র : পিলিং নাইফ

(খ) ক্যান/ওপেনার/কর্ক রিমুভার : এর সাহায্যে ক্যানের ঢাকনা কাটা ও কোমল পানীয় জাতীয় বোতলের কর্ক বা মুখ খোলা হয়।

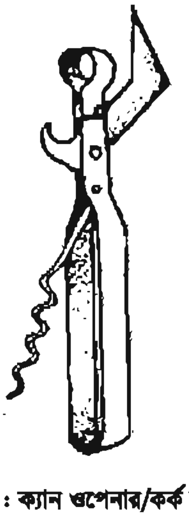

চিত্র : ক্যান ওপেনার/কর্ক রিমুভার

(গ) কোর ও সিড রিমুভার : এই বিশেষ ধরনের ছুরির সাহায্যে ফলের শক্ত শাঁস ও বিচি আলাদা করা হয়।

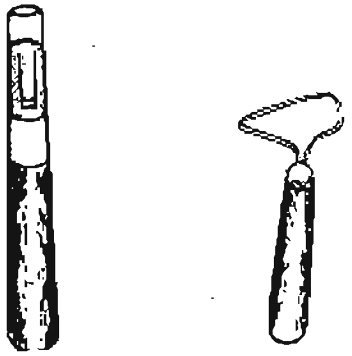

চিত্র : কোর ও সিড রিমুভার

(ঘ) কাটিং নাইফ : সাধারণত ফল ও সবজি সুবিধামতো আকারে কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়।

চিত্র : কাটিং নাইফ

২. পটেটো পিলার : এ যন্ত্রের সাহায্যে আলুর খোসা ছাড়ানো হয়।

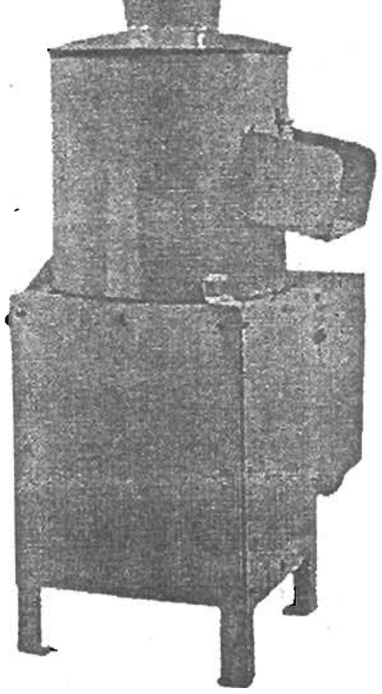

চিত্র : পটেটো পিলার

৩. পটেটো স্লাইসার: আলুজাত খাদ্য তৈরির জন্য যে বিভিন্ন আকারের আলুর স্লাইস করতে হয় তা এ যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়।

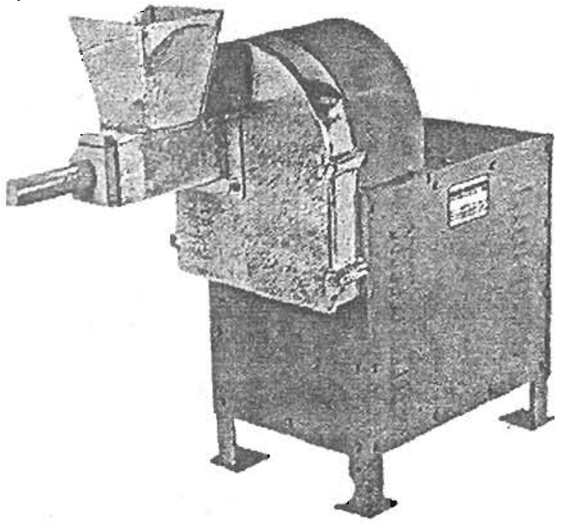

চিত্র : পটেটো স্লাইসার

৪. রস বা জুস নিষ্কাশন যন্ত্রপাতিসমূহ

প্রক্রিয়াজাত কারখানাগুলোতে ফলের ধরন ও জুসের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে এসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয়। বিভিন্ন রকমের ফলমূল যেমন : আম, আনারস, কমলালেবু, আপেল, টমেটো, তরমুজ, মাল্টা ইত্যাদির পাল্প ও জুস/রস পৃথক করার জন্য এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিচে কিছু কিছু যন্ত্রপাতি চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :

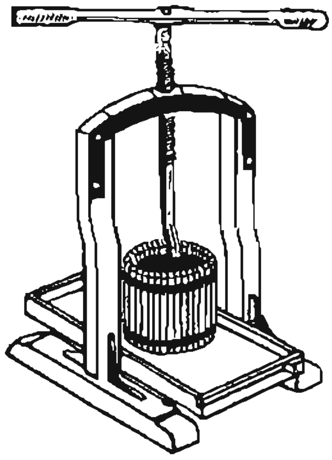

চিত্র : বাস্কেট প্রেস

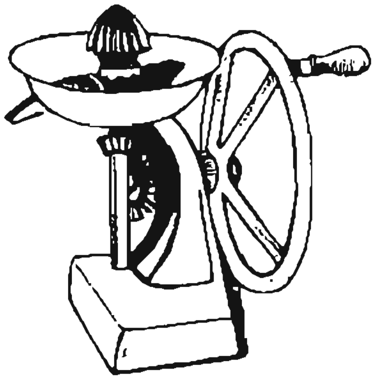

চিত্র : লাইম জুস ও এক্সট্রাক্টর

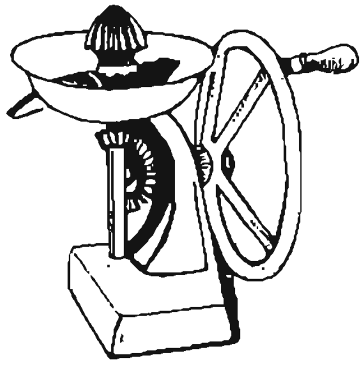

চিত্র : লাইম জুস স্কুইজার

চিত্র : হাইড্রোলিক জুস প্রেস

চিত্র : রোজ টাইপ জুস এক্সট্রাক্টর

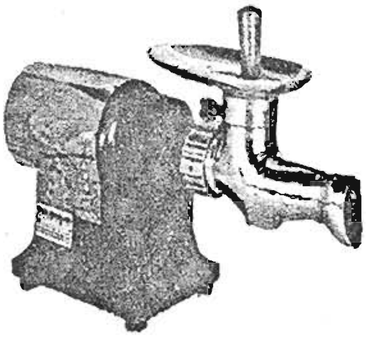

চিত্র : স্ক্রু টাইপ জুস এক্সট্রাক্টর

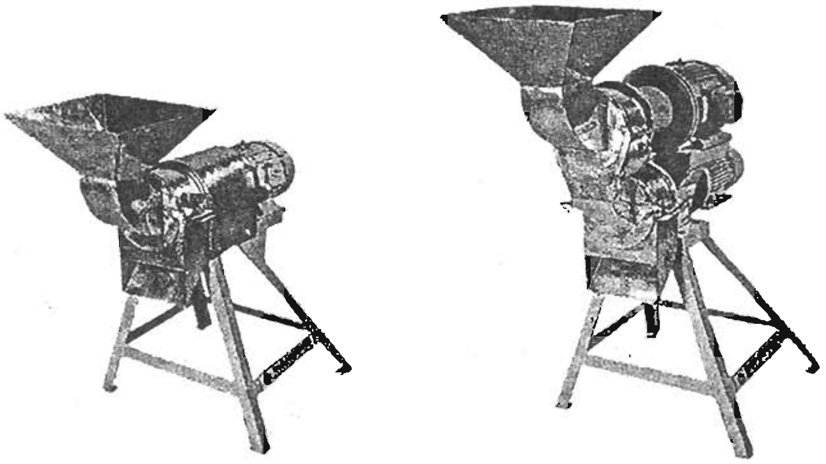

চিত্র : ফ্রুট মিল

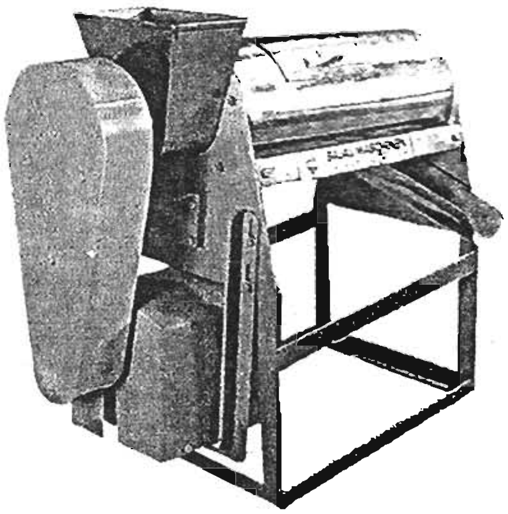

চিত্র : পাল্পার

৫. বোতলজাতকরণ যন্ত্রপাতি

প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য সাধারণত তরল বা অর্ধ তরল জাতীয় পদার্থ বোতলজাতকরণে এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। ভ্যাকুয়াম ফিলিং-এর সাহায্যে বায়ুরুদ্ধ অবস্থায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য বোতলে ভরা হয়। তারপর ক্যাপ সিলার বা কর্কিং মেশিনের সাহয্যে বোতলের মুখ লাগানো হয়। নিচের চিত্রে একটি বোতলজাতকরণ মেশিনে দেখানো হলো।

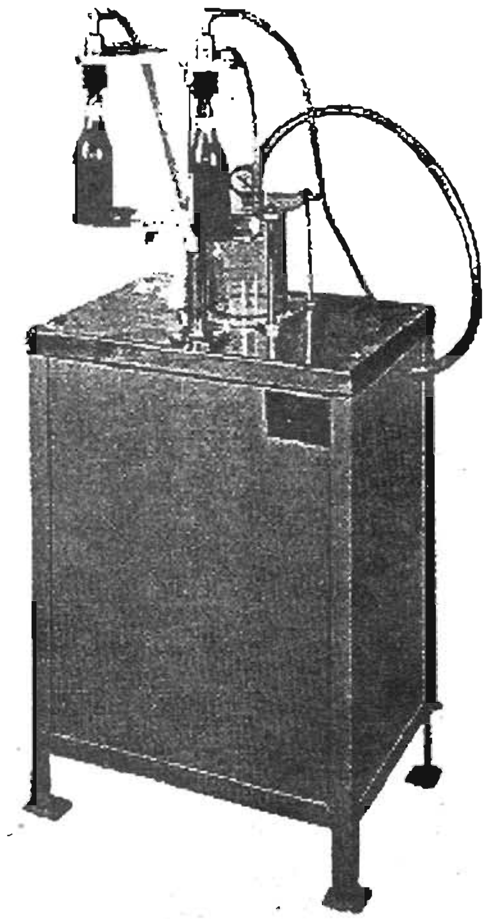

চিত্র : ভ্যাকুয়াম ফিলিং

চিত্র : ক্রাউন কর্কিং মেশিন

চিত্র : ক্যাপ সিলার

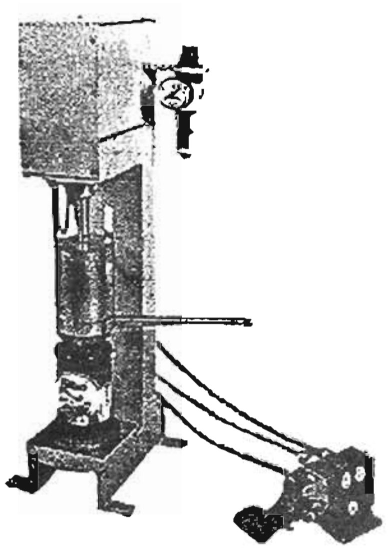

চিত্র : নিউম্যাটিক ক্যাপ সিলার

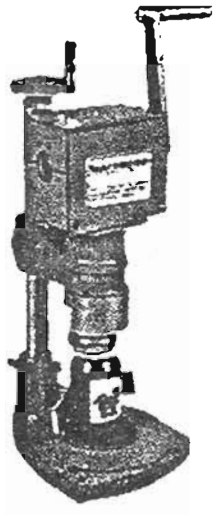

চিত্র : যান্ত্রিক ক্যাপ সিলার

৬. জেলমিটার : এটি একটি উভয় মুখ খোলা কাচের নল। এর উপরের অংশ মোটা এবং নিচের অংশ সরু। মোটা অংশে পাঠরেখা অঙ্কিত থাকে। এর সাহায্যে ফলের নির্যাসে পেকটিনের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়।

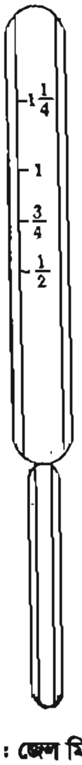

চিত্র : জেল মিটার

৭. রিফ্রাক্টোমিটার : এ যন্ত্রের সাহায্যে ফলের রস বা রস হতে প্রস্তুতকৃত খাদ্য যেমন জ্যাম, জেলি, স্কোয়াস প্রভৃতির চিনির শতকরা পরিমাণ বা ব্রিক্স নির্ণয় করা হয়। এ যন্ত্রের এক প্রান্তে চোখ লাগিয়ে দেখার জন্য একটি লেন্স থাকে। এ লেন্স দিয়ে যন্ত্রের ভিতরে দেখলে একটি রেখাঙ্কিত স্কেল দেখা যায়। রিফ্রাক্টোমিটারের অপর প্রান্তে একটি ঢাকনাযুক্ত কাচের নমুনা প্লেট থাকে। এ প্লেটের উপর এক ফোটা খাদ্য দ্রব্যের নমুনা রেখে ঢাকনা চেপে দিয়ে দেখলে উক্ত ফলের রসের ব্রিক্স-এর মান স্কেল রিডিং থেকে পাওয়া যায়। যন্ত্রের ভিতর যে স্কেলটি দেখা যায় তাতে ০° থেকে ১০০° ব্রিক্স পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে। স্কেলের রং থাকে হালকা হলুদ বা নীলাভ। যখন বিক্স নির্ণয় করা হয় তখন ঐ দ্রব্যের নির্দিষ্ট মান অনুসারে নিচ থেকে নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত একটু কালো দেখায়। যে রেখা বরাবর স্কেলের রঙের হালকা অংশ ও গাঢ় অংশ এক সাথে মিশে থাকে এবং ঐ স্থানে যে মান লিখা থাকে সেটাই ঐ বস্তুর প্রকৃত ব্রিক্স। এছাড়াও কিছু কিছু অটোমেটিক রিফ্রাক্টোমিটার আছে যাতে সরাসরি ব্রিক্স-এর মান পাওয়া যায়।

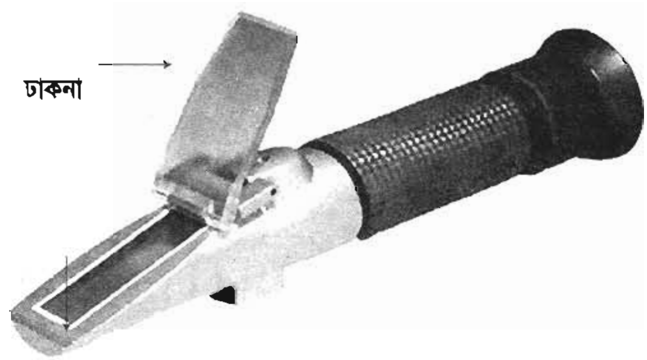

চিত্র : হ্যান্ড রিফ্রাক্টোমিটার

চিত্র : অটোমেটিক রিফ্রাক্টোমিটার

৮. ক্যানিং বা টিনজাতকরণ যন্ত্রপাতি

প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যদ্রব্যকে জীবাণুমুক্ত রেখে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার জন্য ক্যানে ভর্তি করে রাখা হয়। ক্যান তৈরিকরণ, ক্যান ভর্তিকরণ ও ক্যান সিলিং-এর জন্য পৃথক পৃথক যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়।

(ক) ক্যান তৈরির যন্ত্রপাতি : ক্যান তৈরির জন্য এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়।

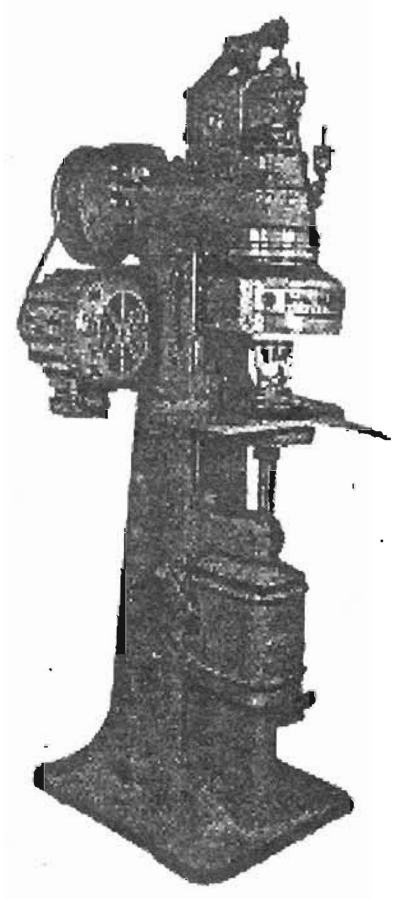

চিত্র : ডাবল ক্যান সিমার (স্থির ধরনের)

চিত্র : ডাবল সিমার (ঘূর্ণনশীল ক্যানের ক্ষেত্রে)

চিত্র : ক্যান বডি রিফর্মার

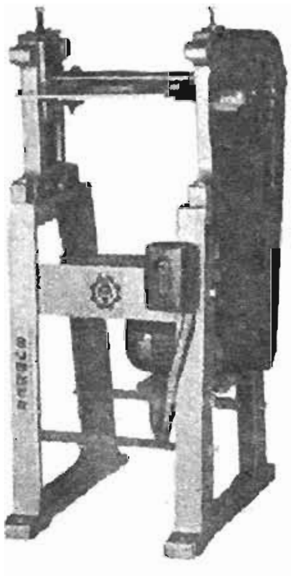

চিত্র : ক্যান বডি রোলিং মেশিন

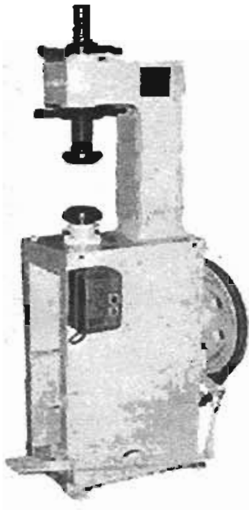

চিত্র : ফ্লানজার

(খ) ক্যান ফিলিং মেশিন : প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যদ্রব্য ক্যানে ভর্তি করার জন্য ব্যবহৃত হয়। নিচে চিত্র দেখ।

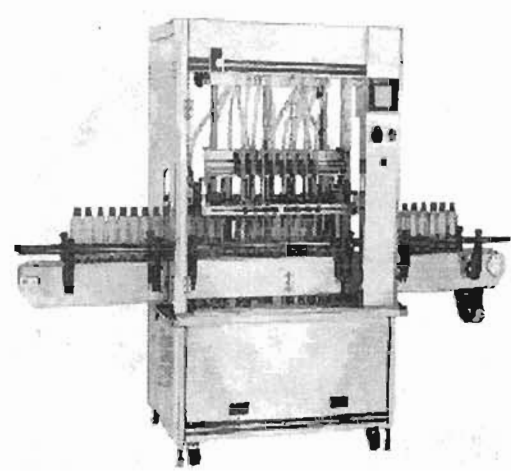

চিত্র : ক্যান ফিলিং মেশিন

(গ) ক্যান সিলার : খাদ্যদ্রব্য ক্যানে ভর্তি করার পর ক্যানের মুখ বন্ধ করতে ক্যান সিলার ব্যবহার করা হয়।

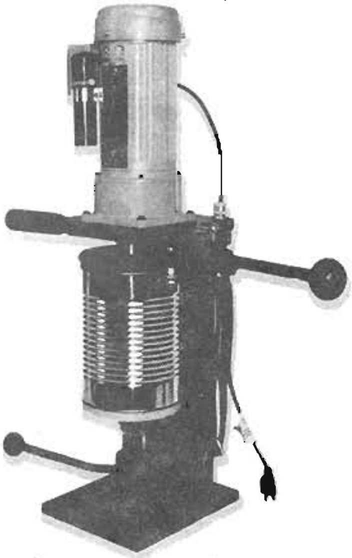

চিত্র : অটো ক্যান সিলার

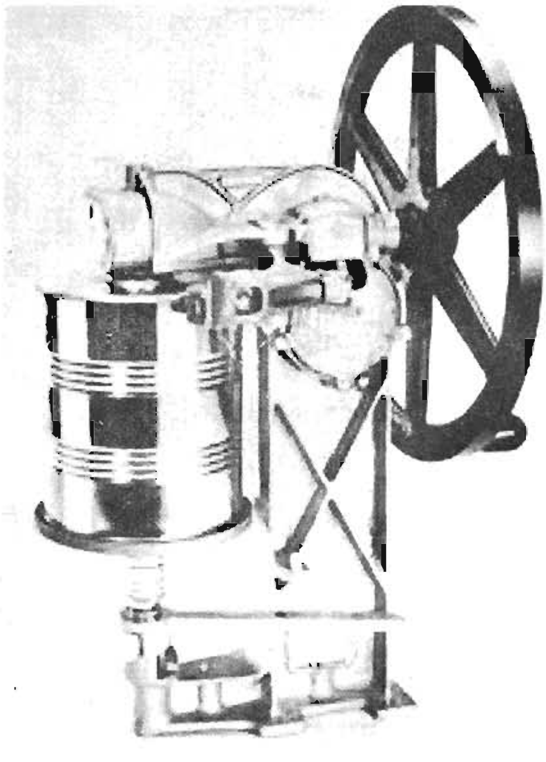

চিত্র : ম্যানুয়াল ক্যান সিলার

৯. প্যাকেজিং মেশিন

প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যদ্রব্যকে প্যাকেট বা কার্টনে বায়ুরুদ্ধ অবস্থায় বন্ধ করতে আজকাল বিভিন্ন রকমের প্যাকেজিং মেশিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তার মধ্যে ব্যাগ সিলার, মোড়ানোর যন্ত্র, কার্টন সিলার অন্যতম। ব্যাগ সিলারের সাহায্যে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল বা পলিথিন ব্যাগ অতি সহজে বায়ুরুদ্ধভাবে বন্ধ করা যায়। মোড়ানো যন্ত্র বা র‍্যাপিং মেশিনের সাহায্যেও অতি সহজে বিভিন্ন আকারের প্যাকেটে মুড়িয়ে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা যায়। সঠিক ও দ্রুত কার্টন সিল করতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় কার্টুন সিল ব্যবহৃত হয়।

চিত্র : পলি ব্যাগ সিলার

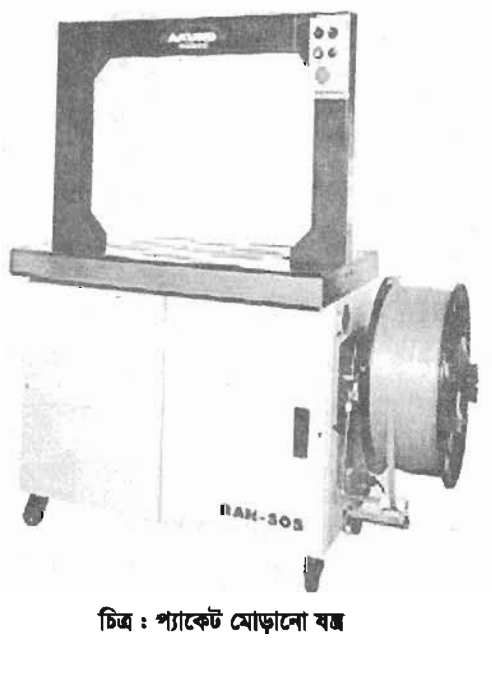

চিত্র : প্যাকেট মোড়ানো যন্ত্র

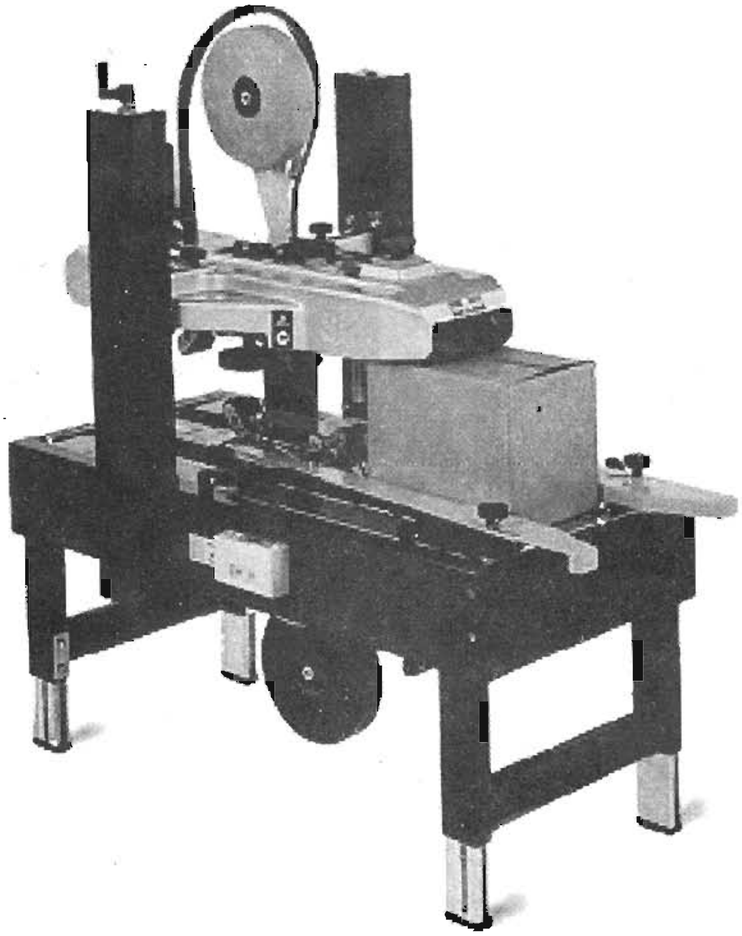

চিত্র : কার্টন সিলার

১০. শুষ্ককরণ যন্ত্রপাতি

যান্ত্রিক শুষ্ককরণের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ড্রায়ার আছে। খাদ্যপণ্য শুষ্ককরণের প্রকৃতির ওপর অথবা উৎপাদিত পণ্যের অর্থনৈতিক দিক ও কাঙ্ক্ষিতমান প্রাপ্যতার ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট ধরনের ড্রায়ার কোনো নির্দিষ্ট প্রকার খাদ্যের জন্য নির্বাচন করা হয়।

নিম্নে কতকগুলো অতি ব্যবহৃত ড্রায়ার এবং এগুলো দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ বা তালিকা দেয়া হলো :

ক্র: নং	ড্রায়ারের নাম	শুষ্ককরণের জন্য নির্বাচিত পণ্যদ্রব্য
১.	ড্রাম ড্রায়ার	দুধ, শাক-সবজির রস, কলা
২.	ভেকুয়াম সেল্‌ফ ড্রায়ার	সীমিত খাদ্য, যেমন-টমেটো, লেবুর রস
৩.	কন্‌টিনিউয়াস ভ্যাকুয়াম ড্রায়ার	ফল এবং শাকসবজি

৪.	কন্‌টিনিউয়াস বেল্ট	শাক-সবজি
৫.	ফ্লুইডাইজড বেড ড্রায়ার	শাক-সবজি
৬.	ফোম মেটড্রায়ার	রস
৭.	ফ্রিজ ড্রায়ার	মাংস এবং মাংসজাত খাদ্য
৮.	স্প্রে ড্রায়ার	ডিম, ডিমের কুসুম, দুধ
৯.	রোটারি ড্রায়ার	এটি সাধারণত খাদ্যে ব্যবহৃত হয় না তবে কতকগুলো মাংসজাত দ্রব্য শুষ্ককরণে ব্যবহৃত হয়
১০.	কেবিনেট ড্রায়ার	ফল এবং শাক-সবজি
১১.	কিলন্‌-ড্রায়ার	আপেল এবং কতকগুলো শাক্-সবজি
১২.	টানেল ড্রায়ার	ফল এবং শাক্-সবজি
১৩.	সোলার-কাম যান্ত্রিক ড্রায়ার	দানা শস্য, ফল, শাক-সবজি
১৪.	সৌর শুকানো যন্ত্র (সোলার ড্রায়ার)	ফল, সবজি

(ক) ক্যাবিনেট ড্রায়ার

ক্যাবিনেট ড্রায়ারের একটি চেম্বার থাকে যেখানে খাদ্যবস্তু ট্রেতে রাখা হয়। ট্রেগুলোর নাড়াচাড়ার সুবিধার্থে এগুলোকে একটি র‍্যাকের ওপর রাখা হয় এবং ছোট ট্রেগুলো ড্রায়ারের সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত করে দেয়া হয়। প্রথমে হিটারের মধ্য দিয়ে ফ্যানের সাহায্যে বাতাস চালনা করা হয়। পরে উত্তপ্ত বাতাস খাদ্যসামগ্রীর ওপর দিয়ে প্রবাহিত করার ফলে এটি শুষ্ক হয়। এটি সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়সাপেক্ষ এবং সহজেই পরিচালনা করা যায় এবং এর গঠন কৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা যায়। এটি সাধারণত ল্যাবরেটরিতে শাক-সবজি ও ফলমূলের ডিহাইড্রেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

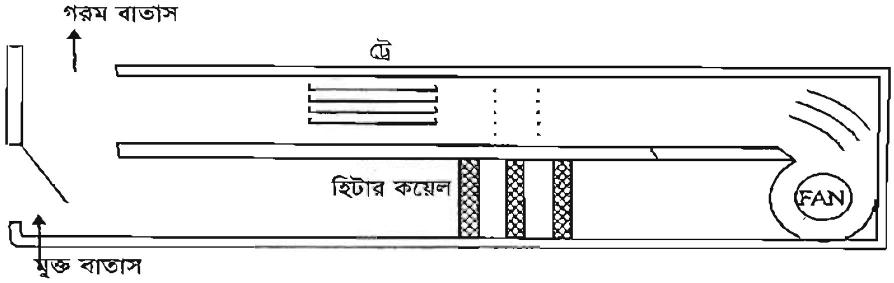

চিত্র : কেবিনেট ড্রায়ারের কার্যপ্রণালি

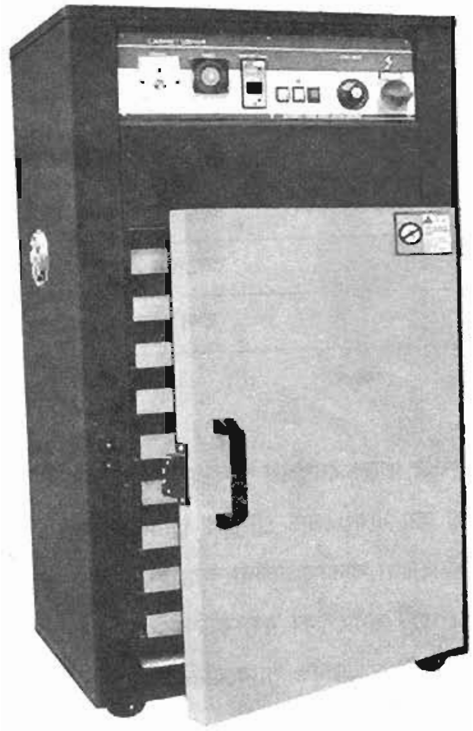

চিত্র : কেবিনেট ড্রায়ার

(খ) টানেল ড্রায়ার

এ ধরনের ড্রায়ারগুলো সাধারণত ফল ও শাক-সবজি শুষ্ককরণের কাজে অধিক ব্যবহৃত হয়। এতে ১০ থেকে ২০ মিটার লম্বা টানেল থাকে যার মধ্যে খাদ্যভর্তি ট্রে ধারণকারী ট্রাক রাখা হয়। ট্রেগুলোর ওপর দিয়ে গরম বাতাস চালনা করা হয়। নির্দিষ্ট সময় পরে এক ট্রাকপূর্ণ শুষ্ক খাদ্য টানেলের এক প্রান্ত দিয়ে বের হয় এবং অন্য প্রান্তে পুনরায় নতুন খাদ্য পূর্ণ ট্রে রাখা হয়। টানেল ড্রায়ারে খাদ্য যেদিকে চালনা করা হয় বাতাসও সেদিকে এর সমান্তরালে চালনা করা হয়। বাতাস বিপরীত দিকেও চালনা করা যেতে পারে ফলে শুষ্ক গরম বাতাস প্রথমে শুষ্কতম খাদ্যের সংস্পর্শে আসে এবং এর ফলে ভালো শুকনা খাদ্য পাওয়া যায়, যা দীর্ঘদিন সংরক্ষিত অবস্থায় রাখা যায়।

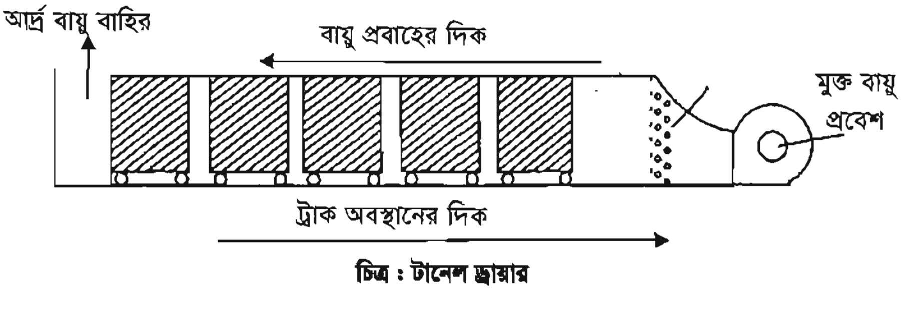

চিত্র : টানেল ড্রায়ার

গ) স্প্রে ড্রায়ার :

এটি একপ্রকার বুদ্ধতাপীয় ড্রায়ার। তবে অন্যান্য ড্রায়ার থেকে এর পার্থক্য এই যে, এর দ্বারা দ্রবণ, মণ্ড বা লেই, স্লায়িস শুষ্ক করা হয়। খাদ্যবস্তু ট্রে অথবা অন্য কোনো অবলম্বনে নেয়া হয় না। কিন্তু তরল খাদ্য বস্তু ফোঁটা ফোঁটা করে ফেলা হয় এবং শুষ্ক বাতাসে এগুলো শুকানো হয়। এ ড্রায়ারের সুবিধা এই যে, খুব অল্প সময়ে এ ড্রায়ার দিয়ে খাদ্যদ্রব্য শুকানো যায়।

লম্বালম্বিভাবে নিচের দিকে পতিত প্রবাহ এবং খাদ্যবস্তু একত্রে মিলিত হয়। এ ধরনের ড্রায়ারে গরম গ্যাস এবং তরল খাদ্যবস্তু একটি টাওয়ারের নিচে উপনীত করানো হয় এবং পরে নিচের দিকে পতিত হয়। খাদ্যবস্তুর গুঁড়াগুলো একত্রে টাওয়ারের নিচে জমা হয়। স্প্রে অবশ্যই লম্বালম্বি ও সমতল থাকে। যদি প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে করা যায় তবে খাদ্যের স্বাদ, বর্ণ ও পুষ্টি উপাদানের ব্যাপক অংশ অক্ষুণ্ন থাকে। যেমন– ডিম, ডিমের কুসুম ও দুধ এই পদ্ধতিতে শুষ্ক করা হয়।

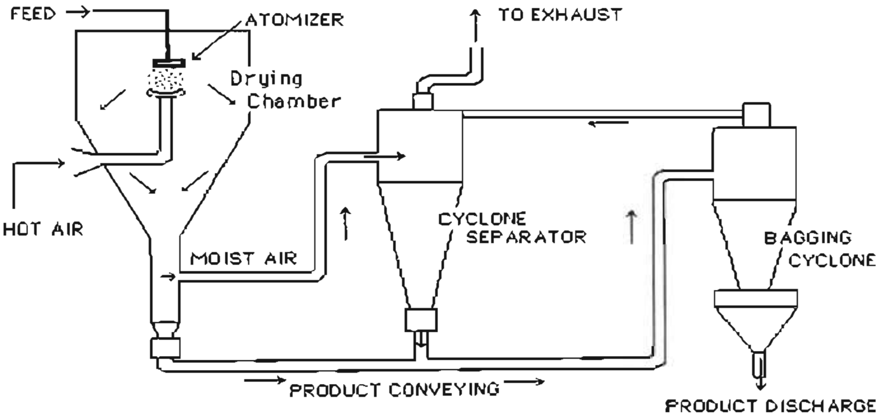

(ঘ) ড্রাম ড্রায়ার

তরল খাদ্যদ্রব্য ডিহাইড্রেশনের জন্য ১-২ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট ঘূর্ণায়মান ড্রাম ব্যবহৃত হয়। ড্রাম উত্তপ্ত বাষ্প দ্বারা গরম করা হয়। ড্রামের ভেতর রাখা খাদ্যবস্তুর উপর পাতলা আবরণ দিয়ে আবদ্ধ করা হয়। উত্তপ্ত বাষ্পের তাপ ড্রামের গাত্র বেয়ে পাতলা আবরণে আবদ্ধ খাদ্যবস্তুতে সঞ্চালিত করা হয়। ফলে খাদ্যদ্রব্য শুষ্ক হয়। শুকানো উৎপাদ পরে স্ক্রেপার ব্লেড-এর সাহায্যে ড্রাম থেকে সরানো হয়। পরে শুষ্ক ফিল্ম ঝুরঝুরে হয়ে যায় এবং মিহি পাউডারে পরিণত হয়। যেমন দুধ, শাক-সবজির রস, কলা এই পদ্ধতিতে শুষ্ক করা হয়।

(ঙ) সোলার-কাম যান্ত্রিক ড্রায়ার

এই ড্রায়ার দিনের বেলায় সূর্যের আলো ব্যবহার করে এবং রাতে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি হাইব্রিড নামে এই ধরনের একটি ড্রায়ার উদ্ভাবন করে। এই ড্রায়ারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা আছে ফলে কম তাপমাত্রার দরুন শস্যের পচন ও বেশি তাপমাত্রায় শস্যের গুণাগুণ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। বিভিন্ন ধরনের শস্যবীজসহ ফল, শাক-সবজি, ঔষধি গাছ ইত্যাদি এই ড্রায়ারে শুকানো যায়। চিত্রে বারি হাইব্রিড ড্রায়ার দেখানো হলো।

চিত্র : বারি হাইব্রিড ড্রায়ার

(চ) সৌর শুকানো যন্ত্র (সোলার ড্রায়ার)

ফল-সবজি শুকিয়ে সংরক্ষণ করা খুবই প্রাচীন পদ্ধতি। এটা আজকাল উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে করা হয়। সবজি শুকানো বলতে এর মধ্য থেকে জলীয় অংশ সরিয়ে ফেলা বুঝায়। এ পদ্ধতি অন্যান্য সংরক্ষণ পদ্ধতির তুলনায় অনেক বেশি সুবিধাজনক। সৌর শুকানো পদ্ধতিতে ফল-সবজি শুকালে সবজির ওজন মূল ওজনের ১/৪ অংশ থেকে ১/৯ অংশে কমে যাওয়ার ফলে পরিবহন খরচ কমে যায়। আয়তনে কমে যাওয়ায় অল্প পরিসর জায়গাতেই সংরক্ষণ করা সম্ভব। এছাড়াও টিনজাতকরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াজাতকরণের তুলনায় শুকানোতে খরচ কম পড়ে।

এই যন্ত্রের মাধ্যমে সবজিগুলোকে ট্রে বা চালনিতে ছড়িয়ে দিয়ে ড্রায়ারের ভিতরে তলার উপরে বসিয়ে দেয়া হয়। এরপর পলিপ্রপিলিনের পর্দা দিয়ে ড্রায়ার ঢেকে দেয়া হয়। যন্ত্রটি রোদে সূর্যের দিকে মুখ করে বসিয়ে দেয়া হয়। পুরোপুরি না শুকানো পর্যন্ত এভাবেই রেখে দেয়া হয়।

চিত্র : বাক্স আকৃতির প্রত্যক্ষ সৌর শুকানো যন্ত্র

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি জুস নিষ্কাশন যন্ত্র

(ক) বাস্কেট প্রেস
(খ) লাইম জুস এক্সট্রাক্টর
(গ) লাইম জুস স্কুইজার
(ঘ) উপরের সবগুলো

২. নিচের কোনটি বোতলজাতকরণ যন্ত্র

(ক) ক্রাউন কর্কিং মেশিন
(খ) ক্যাপ সিলার
(গ) নিউমেটিক ক্যাপ সিলার
(ঘ) উপরের সবগুলো

৩. নিচের কোনটি ক্যান তৈরির যন্ত্র

(ক) ডাবল ক্যান সিমার (স্থির ধরনের)
(খ) ডাবল সিমার (ঘূর্ণনশীল ক্যানের ক্ষেত্রে)
(গ) ক্যান বডি রিফরমার
(ঘ) উপরের সবগুলো

৪. ড্রাম ড্রায়ারের সাহায্যে কোন ধরনের খাদ্যদ্রব্য শুষ্ক করা যায়–

(ক) দুধ
(খ) শাক-সবজির রস
(গ) কলা
(ঘ) উপরের সবগুলো

৫. স্প্রে ড্রায়ারের সাহায্যে কোন ধরনের খাদ্যদ্রব্য শুষ্ক করা যায়–

(ক) ডিম
(খ) ডিমের কুসুম
(গ) দুধ
(ঘ) উপরের সবগুলো

৬. টানেল ড্রায়ারের সাহায্যে কোন ধরনের খাদ্যদ্রব্য শুষ্ক করা যায়–

(ক) ফল

(খ) শাক-সবজি

(গ) উভয়টি

(ঘ) কোনোটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। খাদ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানায় ব্যবহৃত কয়েকটি যন্ত্রের নাম লেখ।

২। জুস নিষ্কাশনের জন্য কয়েকটি যন্ত্রের নাম লেখ।

৩। কয়েকটি বোতলজাতকরণ যন্ত্রের নাম লেখ।

৪। কয়েকটি শুষ্ককরণ যন্ত্রের নাম লেখ।

৫। সৌর শুকানো যন্ত্রের সুবিধা লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। চিত্রসহ রিফ্রাক্টোমিটারের বর্ণনা দাও।

২। কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত ড্রায়ার এবং ড্রায়ারের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের নাম উল্লেখ কর।

৩। টানেল ড্রায়ারের বর্ণনা দাও।

৪। স্প্রে ড্রায়ারের বর্ণনা দাও।

৫। সোলার-কাম যান্ত্রিক ড্রায়ারের বর্ণনা দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ফল ও সবজি সংরক্ষণ

২.১ ফল ও সবজি সংরক্ষণের কারণ :

ফল ও সবজি স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ ফল ও সবজি হতে মানুষের শরীরে আসে এবং রোগের আক্রমণ হতে রক্ষা করে বলে এদেরকে প্রতিরক্ষাকারী খাদ্য (Protective Foods) বলা হয়। সারা বছর ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ পেতে ফল ও সবজি সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মতো ফল ও সবজি সাধারণ অবস্থায় রেখে দিলে বেশিদিন ভালো থাকে না। বাইরে থেকে মোল্ড, ইস্ট ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদির আক্রমণে এবং ভেতর থেকে এনজাইমের ক্রিয়া এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে ফল ও সবজি নষ্ট হয়ে যায়। মোল্ড বা ছাত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির জন্য আলো, বাতাস, পানি, পুষ্টি উপাদান এবং উপযুক্ত তাপমাত্রার প্রয়োজন। এই প্রয়োজনগুলোর এক বা একাধিক একসাথে নিয়ন্ত্রণ করে জীবাণু ধ্বংস ও এনজাইমের ক্রিয়া রোধ করা সম্ভব। বাস্তবেও এসবের পরিপ্রেক্ষিতে ফল ও সবজি সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। ফল ও সবজি পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করলে তা থেকে বহুল পরিমাণে অপদ্রব্য এবং জীবাণু অপসারিত হয় এবং কিছু সময়ের জন্য এগুলো ভালো থাকে। গুণগতমান অটুট রেখে দীর্ঘদিন ফল ও সবজি সংরক্ষণের জন্য আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

২.২ ফল ও সবজি সংরক্ষণের পদ্ধতিসমূহ :

১. কোল্ড স্টোরেজ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ
২. ফ্রিজিং তাপমাত্রায় সংরক্ষণ
৩. ক্যানিং বা উচ্চ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ
৪. শুষ্ককরণ
৫. চিনি দিয়ে সংরক্ষণ
৬. লবণ দিয়ে সংরক্ষণ
৭. রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে সংরক্ষণ
৮. ইরেডিয়েশন বা গামা রশ্মির মাধ্যমে সংরক্ষণ।

২.৩ কোল্ড স্টোরেজ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ :

কোল্ড স্টোরেজ পদ্ধতিতে ফল ও সবজি সংরক্ষণের জন্য ফ্রিজিং তাপমাত্রা বা $^{\circ}$ সে. তাপমাত্রার উপরে এগুলো সংরক্ষণ করা হয়। এই তাপমাত্রাকে চিলিং তাপমাত্রা বলে। সাধারণ তাপমাত্রায় ফল ও সবজি পচে নষ্ট হয়ে যায়। নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ হলো :

১. জীবাণুর আক্রমণ, যেমন- মোল্ড, ইস্ট ও ব্যাকটেরিয়া
২. এনজাইমের ক্রিয়া, যেমন- দ্রুত পেকে নরম হয়ে যাওয়া

৩. পানি অপসারণের কারণে শুকিয়ে যাওয়া।

ফল ও সবজিকে কোল্ড স্টোরেজ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে উপরে উল্লিখিত কারণসমূহ রোধ করা যায় এবং দীর্ঘদিনের জন্য তাজা অবস্থায় রাখা যায়। চিলিং তাপমাত্রায় জীবাণু মরে না কিন্তু তাদের বৃদ্ধি ও কার্যকারিতা থেমে যায়। ফল ও সবজির শ্বসন প্রক্রিয়ার গতি কম তাপমাত্রায় মন্থর হওয়ার কারণে এগুলো সংরক্ষিত হয়।

২.৪ ফল ও সবজি সংরক্ষণে ওয়াক্সিং (Waxing) পদ্ধতি :

জীবাণু প্রতিরোধকারী রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে ফলে ও সবজির পচন বন্ধ করা যায়। এছাড়াও মোমের সাথে ফাংগিসাইড ও ব্যাকটেরিসাইড মিশিয়ে ফলের উপর প্রলেপ দিলে ফলে অবস্থিত জীবাণু ধ্বংস হয় এবং ফলের গায়ে যে সমস্ত সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে সেগুলো বন্ধ হওয়ার কারণে ফল শুকিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।

জীবাণু প্রতিরোধক দ্রব্যসমূহ নিম্নলিখিত উপায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে–

১. পানিতে গুলে স্প্রে আকারে ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে।
২. মোমের দ্রবণে চুবিয়ে নেয়া যেতে পারে অথবা
৩. ধূমায়িত করা যেতে পারে।

মাইক্রো ক্রিস্টালাইন প্যারাফিন ওয়াক্স-এর সাথে ফাংগিসাইড ও ইমালসিফাইং এজেন্ট মিশিয়ে প্রলেপ দিয়ে পচন রোধ করা যায়। নিচে এরূপ একটি ফর্মুলা দেওয়া হলো–

মাইক্রো ক্রিস্টালাইন প্যারাফিন ওয়াক্স	৪০ ভাগ
রেজিন–	৩১ ভাগ
অলেইক অ্যাসিড–	৭ ভাগ
ট্রাই ইথানোলামিন–	১৭ ভাগ
সোডিয়াম অর্থো ফিনাইল ফিনেট–	৫ ভাগ

সাধারণত এই ফর্মুলার ৬% ভাগ ব্যবহার করাই যথেষ্ট। তবে এর ব্যতিক্রম আছে। নিচে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো–

আম–	৬%
পেঁপে–	৬%
আপেল–	৮%
লেবু–	৪%
গাজর–	১২%
আলু–	১২%

২.৫ ফ্রিজিং তাপমাত্রায় ফল ও সবজি সংরক্ষণের মূলনীতি :

ফল এবং সবজিতে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে। এই পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে বিভিন্ন ধরনের জৈব এবং অজৈব পদার্থ। কাজেই খাদ্যস্থিত পানির ফ্রিজিং পয়েন্ট খাঁটি পানির ফ্রিজিং পয়েন্ট-এর চেয়ে কম হয়। অর্থাৎ কম তাপমাত্রায় খাদ্যস্থিত পানি জমে বরফে পরিণত হয়। অথবা আরও অন্যভাবে বলা যায় যে, খাদ্যস্থিত পানি জমলে তার তাপমাত্রা বরফের চেয়ে কম হয়। কিছু খাদ্যদ্রব্যের ফ্রিজিং পয়েন্ট নিচে দেয়া হলো :

পানি	০° সে.
কলা	-৩.৯° সে.
আলু	-২.২° সে.
ফুলকপি	-০.৬° সে.

খাদ্যে উপস্থিত পানি দুইরকম– মুক্ত পানি এবং সংযুক্ত পানি। মুক্ত পানিকে ঠাণ্ডা করলে সহজেই বরফে পরিণত হয়। কিন্তু সংযুক্ত পানি– ২০° সে. তাপমাত্রায়ও জমে না। কাজেই মুক্ত পানির পরিমাণ কমিয়ে খাদ্যদ্রব্যকে ফ্রিজিং করলে তার মান ভালো থাকবে। মুক্ত পানির পরিমাণ যতই কমবে ফ্রোজেন ফুডের মান ততই ভালো হবে। ফ্রোজেন ফল এবং শাকসবজি দেখতে প্রায় টাটকা ফল এবং শাকসবজির মতো লাগে। মানের দিক থেকেও প্রায় একই রকম হবে।

২.৬ ফ্রিজিং পদ্ধতিতে ফল ও সবজি সংরক্ষণ :

ফ্রিজিং হচ্ছে খাদ্য সংরক্ষণের এমন একটি স্বল্পতাপ পদ্ধতি যেখানে তাপমাত্রা ০° সে. এর নিচে রাখা হয়। এ পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, খাদ্য বা তার আশপাশে অবস্থানকারী অণুজীবসমূহের কার্যকলাপকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা, যাতে তারা তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে খাদ্যকে নষ্ট করতে না পারে। ফলমূল ও শাকসবজিকে প্রায় সতেজভাবে পাবার জন্য বা ভোক্তাদের কাছ পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এ পদ্ধতির প্রয়োগ। এ পদ্ধতিতে রাখা খাদ্যসামগ্রীর বর্ণ, ঘ্রাণ ও স্বাদ সাধারণত অটুট থাকে। ফ্রিজিং পদ্ধতির কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

ক. ফ্রিজিং-এর ফলে এনজাইমের ক্রিয়াকলাপ নিষ্ক্রিয় হয়। ব্লাঞ্চিং ক্লোরোফিলের কিছুটা পরিবর্তন ঘটায়। এজন্য ব্লাঞ্চিং-এর সময়কাল যথাসম্ভব কম রাখা প্রয়োজন।

খ. ফ্রিজিং-এ মুক্ত পানি জমতে শুরু করে। ফ্রিজিং-এ মুক্ত পানি বরফের স্ফটিকে পরিণত হয়। বদ্ধ পানি (bound water) জমাট বাঁধে না।

গ. ফ্রিজিং কোষীয় পদার্থের সান্দ্রতা বৃদ্ধি করে।

ঘ. ফ্রিজিং সাইটোপ্লাজমিক গ্যাস যেমন o_2 ও CO_2 এর পরিমাণ কমায়।

ঙ. এটি কোষীয় পদার্থের pH পরিবর্তন করে। অনেকের মতে, এই পরিবর্তন মাত্রা প্রায় ০.৩-২ pH।

চ. এটি কোষীয় ইলেক্ট্রোলাইটের ঘনীকরণ প্রভাবিত করে।

ছ. কোষের প্রোটোপ্লাজমের কলয়ডাল (colloidal) পর্যায় পরিবর্তন করে।

জ. ফ্রিজিং কিছু কোষীয় প্রোটিনের মূল গুণাবলি নষ্ট করে।

ঝ. এটি কিছু অণুজীবের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাজনক তাপমাত্রা পেতে বাধা সৃষ্টি করে। এ ঘটনা থার্মোফিলিক ও মেসোফিলিক অণুজীবের জন্য প্রযোজ্য।

ঞ. ফ্রিজিং-এ সুডোমনাস (Pseudomonas) প্রজাতিসহ অন্যান্য অণুজীবের বিপাকীয় কার্যকলাপ বাধাগ্রস্ত হয়।

বিভিন্ন ধরনের ফ্রিজিং পদ্ধতি

(ক) শার্প ফ্রিজিং বা স্লো ফিজিং : এ পদ্ধতিতে ফল ও সবজি ফ্রিজ করতে ৩-৭২ ঘণ্টা সময় লাগে। ধীরে ধীরে বরফ জমে বলে বরফের দানা বড় হয়। সাধারণত এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তাপমাত্রা -১৫° সে. থেকে -২৯° সে. হয়ে থাকে।

(খ) কুইক ফ্রিজিং : এ ক্ষেত্রে ৩০ মিনিটের মধ্যে ফ্রিজিং সম্পন্ন করা হয়। কম সময়ে ফ্রিজিং করা হয় বলে বরফের দানা খুব ছোট ও মসৃণ হয়। ফলে খাদ্যদ্রব্যের গঠনের কোনো ক্ষতি হয় না বললেই চলে। এক্ষেত্রে তাপমাত্রা ব্যবহার করা হয় -১৮° থেকে -৪০° সে.। এ পদ্ধতিতে খাদ্যের রং, গন্ধ, স্বাদ এবং বুনট ভালো থাকে। এনজাইম এবং জীবাণুর কার্যকারিতা বহুলাংশে কমে যায়। তাই এ পদ্ধতি স্লো ফ্রিজিং-এর চেয়ে বেশি উপযোগী। এছাড়াও আরও বিভিন্ন ভাবে ফল ও সবজি হিমায়িত করা যায়। যেমন–

(গ) এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজিং : এ ক্ষেত্রে ফল ও সবজি প্রথমে নির্দিষ্ট নিয়মে প্যাকেট করার পর তার উপর -১৮° থেকে -৩৪° সে. তাপমাত্রার শীতল বাতাস প্রবাহিত করে হিমায়িত করা হয়। এতে ফল ও সবজি শুষ্ক হতে পারে না।

(ঘ) হিমায়কের পরোক্ষ সংস্পর্শে ফ্রিজিং : ফল ও সবজি প্যাকেট করার পর সেগুলোকে একটা ফাঁপা প্লেটের উপর রেখে ঐ প্লেটের মধ্য দিয়ে -১৮° থেকে -৪৫° সে. তাপমাত্রার শীতল হিমায়ক প্রবাহিত করে ফল ও সবজি হিমায়িত করা হয়।

(ঙ) হিমায়কের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে ফ্রিজিং : এক্ষেত্রে ফল ও সবজি সরাসরি তরল হিমায়ক যেমন, লিকুইড নাইট্রোজেন অথবা লিকুইড কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্যে ডুবিয়ে বা স্প্রে করে হিমায়িত করা হয়। হিমায়িত হতে ২-৩ মিনিট সময় লাগে।

(চ) ডি-হাইড্রো ফ্রিজিং : এ প্রক্রিয়ায় শুষ্ককরণ ও ফ্রিজিং একই সাথে এবং ধারাবাহিকভাবে করা হয়ে থাকে। খাদ্যের মুক্ত জলীয় কণা শুষ্ককরণ পদ্ধতিতে শতকরা ৫০ ভাগ দূর করার পর বাকি জলীয় কণা ফ্রিজিং পদ্ধতিতে হিমায়িত করা হয়। হিমায়িত ফল ও সবজি ১৮° সে. তাপমাত্রায় অনেক মাস পর্যন্ত ভালো থাকে।

নিচে ৪০° সে. তাপমাত্রায় রক্ষিত কিছু শাকসবজির স্টোরেজ লাইফ দেওয়া হলো-

সবজি	স্টোরেজ লাইফ (মাস)
অ্যাসপারাগাস	১২-১৮
বরবটি জাতীয় সবজি	১১-১২
ফুলকপি	১০-১২
সেলেরি	১০-১২
লেটুস	১০-১২
মটর	১১-১২

২.৭ রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে সংরক্ষণ :

ফল ও সবজি জাতীয় খাদ্য দ্রব্য নিম্নলিখিত রাসায়নিক সংরক্ষক দিয়ে সাধারণত সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। রাসায়নিক সংরক্ষক–

ক) সোডিয়াম বেনজয়েট
খ) সালফার-ডাই-অক্সাইড
গ) পটাশিয়াম মেটাবাই সালফাইট
ঘ) সোডিয়াম মেটাবাই সালফাইট
ঙ) বেনজয়িক অ্যাসিড ও তার লবণ
চ) প্রপায়নিক অ্যাসিড ও তার লবণ
ছ) সরবিক অ্যাসিড ও তার লবণ

(ক) সোডিয়াম বেনজয়েট : অম্লের উপস্থিতিতে সোডিয়াম বেনজয়েট ফল এবং শাকসবজি জাতীয় খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করতে পারে। এটা মোল্ড এবং ইস্ট-এর ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। এটা নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে। সবরকম ফলের রস, সিরাপ, নেকটার, স্কোয়াশ, টমেটো কেচাপ, টমেটো সস, জ্যাম, জেলি ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়।

(খ) সালফার ডাই-অক্সাইড এবং সালফাইটসমূহ : এগুলো ফল ও শাকসবজি জাতীয় খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হয়।

নিচে কিছু প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণে এদের ব্যবহার দেখানো হলো :

খাদ্যসামগ্রী	রাসায়নিক সংরক্ষক	ব্যবহারের মাত্রা (পিপিএম)
১) ফল, ফলের রস, ফলের পাল্প	সালফার-ডাই-অক্সাইড	২০০০-৩০০০
২) ফ্রুট জুস কনসেনট্রেট	সালফার-ডাই-অক্সাইড	১৫০০

৩) ড্রাইড ফ্রুটস- (ক) অ্যাপ্রিকট, আপেল নাশপাতি (খ) কিসমিস এবং সুলতানাস	 ঐ- ঐ-	 ২০০০ ৭৫০
৪) মারমালাড, জ্যাম, জেলি	ঐ-	৪০
৫) স্কোয়াস, ফ্রুটস সিরাপ-ককটেল, ফ্রুট জুস	বেনজয়িক অ্যাসিড	২০০
৬) ফল ও সবজির তৈরি আচার ও চাটনি	সালফার ডাই-অক্সাইড	৩৫০
৭) টমেটো এবং টমেটো সস	বেনজয়িক অ্যাসিড	৬০০
৮) সিরাপ এবং সরবত	বেনজয়িক অ্যাসিড	৬০০
৯) ড্রাইড জিনজার	সালফার ডাই-অক্সাইড	২০০০

২.৮ লবণ দ্বারা ফল ও সবজি সংরক্ষণ :

লবণ দিয়ে ফল ও শাকসবজি সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকে সল্ট পিকলিং বলে। এ পদ্ধতিতে ফলমূল ও শাকসবজি ছোট করে কেটে লবণ দ্রবণে (১৬-২৫%) ডুবিয়ে অথবা সরাসরি লবণ দিয়ে ঢেকে সংরক্ষণ করা হয়। পিকলিং পদ্ধতিতে কাঁচা আম সংরক্ষণ :

প্রবাহ চিত্র :

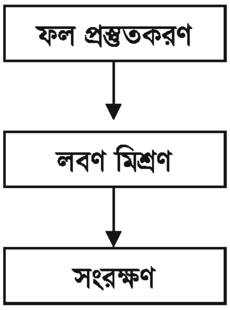

ফল প্রস্তুতকরণ

টাটকা এবং পরিপুষ্ট আম ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করার পর খোসাসহ বা খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরা করে নিতে হবে এবং আমের আঁটি ফেলে দিতে হবে।

লবণ মিশ্রণ ও সংরক্ষণ

একটি পরিষ্কার প্লাস্টিকের বালতি বা ড্রাম নিয়ে তাতে প্রথমে পাতলা লবণের স্তর বিছিয়ে তার উপর এক স্তর আমের টুকরা দিয়ে তার উপর আবার এক স্তর লবণ দিতে হবে। এভাবে বালতি বা ড্রাম না ভরা পর্যন্ত স্তরে স্তরে লবণ ও আম সাজাতে হবে এবং সর্বশেষে লবণের স্তর দিয়ে ড্রামের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। দু'দিন পর আম থেকে পানি বের হবে তখন তাতে আরও লবণ দিতে হবে। এভাবে লবণের পরিমাণ আমের

ওজনের ২৫% যোগ করা হলে ড্রামে রাখা আমের টুকরা যেন পানিতে ডুবে থাকে সে জন্য তার উপর একটি টুকরা দিয়ে চাপা দিতে হবে। ড্রামের ঢাকনা বন্ধ করে এভাবে ১০-১২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।
এই সংরক্ষিত আমের টুকরা দিয়ে বছরের যে কোনো সময় আচার, চাটনি ইত্যাদি প্রস্তুত করা যায়। তবে বার বার পানি দিয়ে ধুয়ে অথবা বেশি পরিমাণ পানিতে অনেক্ষণ ধরে ডুবিয়ে রেখে আমের টুকরা থেকে লবণের পরিমাণ প্রয়োজনমত কমিয়ে নিতে হয়। বার বার খেয়ে লবণের পরিমাণ পরীক্ষা করে নিতে হয়। এভাবে কাঁচা আম, কাঁঠাল ও বিভিন্ন রকম সবজি সংরক্ষণ করা হয়।

স্টিপিং প্রিজারভেশন পদ্ধতিতে কাঁচা ফলমূল ও সবজি সংরক্ষণ :
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত স্টিপিং প্রিজারভেশন পদ্ধতিটি বর্তমানে বিভিন্ন খাদ্য শিল্পে ব্যবহার হচ্ছে। এ পদ্ধতির সুবিধা এই যে, ফল-সবজির ভিতরে উচ্চমাত্রায় লবণ ঢুকতে পারে না। ফলে এ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত ফল-সবজি থেকে আচার, চাটনি তৈরি করতে গেলে অতিরিক্ত লবণ মুক্ত করার ঝামেলা নেই বরং সংরক্ষিত ফল সবজির টুকরোগুলোর বুনট ও ভালো থাকে। নিচে এ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

দুই বা ততোধিক সংরক্ষকের নির্দিষ্ট অনুপাতের মিশ্রণও সবুজ ফল সবজির দীর্ঘকালীন সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। এক পরীক্ষায় দেখা গেছে ৮ শতাংশ লবণ, ১.২৫ শতাংশ গ্লেসিয়াল এসেটিক এসিড ও ০.১ শতাংশ পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইটের জলীয় দ্রবণে সবুজ ফল ও সবজি দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা যায়। কোনো সংরক্ষক দ্রবণে ফল-সবজি ডুবিয়ে রেখে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকে স্টীপিং পদ্ধতিতে সংরক্ষণ বলা হয়। গ্লেসিয়াল এসেটিক এসিড, পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট (কে এম এস) ও লবণ নির্দিষ্ট অনুপাতে পানিতে মিশিয়ে সংরক্ষক দ্রবণ তৈরি করা হয়। কাঁচা আম, জলপাই, আমড়া, আমলকী ফল স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ৯-১২ মাস কাল পর্যন্ত স্টীপিং পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষিত ফলসমূহ পরবর্তীতে আচার, চাটনি তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। স্বল্প ব্যয় সম্পন্ন এ পদ্ধতিতে ফল সংরক্ষণের মাধ্যমে কৃষক তাঁর মূল্যবান ফলের দ্রুত কাটতির পথ খুঁজে পাবেন।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

১. বায়ুরোধ নিশ্চিতকারী ঢাকনাসহ প্লাস্টিক ড্রাম/ কনটেইনার
২. আঠাযুক্ত টেপ
৩. গ্লেসিয়াল এসেটিক এসিড।
৪. পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট (কেএমএস)
৫. লবণ।

সংরক্ষণের পদ্ধতি

ক) পরিপুষ্ট কাঁচা ফল সংগ্রহ করে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিন।

খ) ফলের আকার অনুযায়ী দুই বা চার টুকরোয় কাটা বা পুরোটাই এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায়। যেমন– অপুষ্ট বীজযুক্ত বড় আকারের আমের ক্ষেত্রে, আকার অনুযায়ী দুই বা চার টুকরায় কেটে নিতে হবে এবং বীজ ও বীজের খোসা ফেলে দিতে হবে। পুষ্ট বীজযুক্ত আমের ক্ষেত্রে আমগুলি লম্বালম্বিভাবে তিন টুকরো করতে হবে।

গ) স্টীপিং দ্রবণ তৈরির জন্যে ৮% লবণ, ১.২৫% গ্লেসিয়াল এসেটিক এসিড এবং ০.১% পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট ব্যবহার করা হয় (১ কেজি দ্রবণ তৈরির জন্য ৮০ গ্রাম লবণ, ১২.৫ গ্রাম গ্লেসিয়াল এসেটিক এসিড এবং ১ গ্রাম পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট ৯০৬.৫ গ্রাম পরিষ্কার পানিতে মিশ্রিত করা হয়)।

ঘ) প্লাস্টিক ড্রাম/কনটেইনারটি ভালোভাবে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে গরম (৮০-৯০°সেঃ তাপমাত্রার) পানিতে খলিয়ে (Rinse করে) জীবাণুমুক্ত করা হয়।

ঙ) ফল/ফলের টুকরো পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত ড্রাম বা কনটেইনারে রেখে স্টীপিং দ্রবণ যোগ করা হয় (প্রতি কেজি ফল/স্লাইসের জন্য আনুমানিক ১.২৫ থেকে ১.৫ কেজি স্টীপিং দ্রবণ প্রয়োজন)।

চ) দ্রবণ ও ফলে ভর্তি পাত্রের মুখে ঢাকনা লাগিয়ে দিয়ে সংযোগস্থলের উপর দিয়ে আঠাযুক্ত টেপ ভালোভাবে লাগিয়ে দিন যাতে পাত্রটি সম্পূর্ণরূপে বায়ুরোধী হয়।

ছ) পাত্রগুলো অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডাস্থানে রেখে দিন।

জ) ব্যবহারের পূর্বে স্টীপিং দ্রবণে সংরক্ষিত ফল/ফলের টুকরোগুলি পরিমিতভাবে পানিতে ধোয়া হয় এবং চুলার জ্বাল কমানো-বাড়ানোর মাধ্যমে ৮০° সে. তাপমাত্রা বজায় রেখে গরম পানিতে ৩ মিনিট ধরে হালকাভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে।

২.৯ চিনি দিয়ে ফল ও সবজি সংরক্ষণ পদ্ধতি :

চিনির ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা যায়। কোনো উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চিনির পরিমাণ শতকরা ৬৫ ভাগ বা তার চেয়ে বেশি থাকলে দ্রব্যটি কেবলমাত্র চিনি দিয়েই সংরক্ষিত হয়। বাড়তি কোনো কিছুর দরকার হয় না।

এমনিতে চিনি জীবাণুর জন্য ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু চিনি বা চিনির ঘন দ্রবণ জীবাণুর দেহ থেকে পানি শোষণ করে নেয়। তাই জীবাণু মারা যায়। এভাবেই চিনি দিয়ে ফল ও সবজি সংরক্ষিত হয়। যেমন- জ্যাম, জেলি, মারমালেড, আচার, মোরব্বা, চাটনি, নকুলদানা ইত্যাদি।

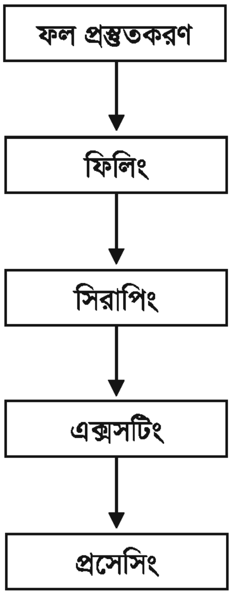

ফল প্রস্তুতকরণ

১.৫-২ কেজি ওজনের টাটকা, পরিপক্ব এবং রং ধরা আনারস সংগ্রহ করে তার খোসা এবং চোখ ছাড়িয়ে ভালো করে পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর স্টেইনলেস স্টিলের চাকু দিয়ে ফালি করে কেটে মাঝের কোর বাদ দিয়ে বাকি অংশ ১" মাপের কিউব বা ঘন আকারে টুকরো করে নিতে হবে।

ফিলিং বা বোতলে ভরণ : কাটা টুকরা স্টেরিলাইজ করা বোতলে নির্দিষ্ট পরিমাণে ভরতে হবে।

সিরাপিং : বোতল বা ক্যানে হেড স্পেস রেখে নিম্নলিখিত মাত্রায় সিরাপ দিয়ে আনারসের টুকরা ঢেকে দিতে হবে।

সিরাপ

চিনির দ্রবণ-	৪০%
সাইট্রিক অ্যাসিড	০.২৫%

এক্সসটিং

বোতল ভর্তি অবস্থায় স্টিম অথবা গরম পানিতে ৮-১০ মিনিট মুখ খোলা অবস্থায় রেখে বায়ুশূন্য করতে হয়।

প্রসেসিং

বোতল অথবা ক্যানকে বায়ুশূন্য অবস্থায় ঢাকনা দিয়ে এমনভাবে বন্ধ করতে হবে যেন কোনোভাবেই বাতাস প্রবেশ করতে না পারে। এরপর ফুটন্ত পানিতে ৩০ মিনিট ধরে বোতল বা ক্যান সিদ্ধ করতে হবে। সিদ্ধ হয়ে গেলে সাথে সাথে পানিতে ঠাণ্ডা করতে হবে। এতে করে আনারসের টুকরো সংরক্ষিত হবে।

২.১০ রেফ্রিজারেটেড গ্যাস স্টোরেজ :

সদ্য সংগৃহীত ফল ও সবজি জীবন্ত থাকে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস চালায় অর্থাৎ অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। হিমায়িত সংরক্ষণাগারে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাইরে থেকে যোগ করলে ফল ও সবজির শ্বসন প্রক্রিয়ার গতি কমে যায়। ফলে এদের স্টোরেজ লাইফ বেড়ে যায়। এটাই গ্যাস গুদামজাতকরণের আধুনিক পদ্ধতি।

রেফ্রিজারেটেড গ্যাস স্টোরেজের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

(১) ফল পাকার সময় বাড়ানো যায়।
(২) সবজির দৃঢ়তা নিয়ন্ত্রণ ও পাতা হলুদ হওয়া বন্ধ করা যায়।
(৩) পচনের প্রবণতা হ্রাস করা যায়।
(৪) ফল ও সবজির রোগ বিস্তার কমানো যায়।

রেফ্রিজারেটেড স্টোরেজ ফল ভালো থাকার সময়সীমা

ফল	স্টোরেজ তাপমাত্রা (° সে.)	আপেক্ষিক আর্দ্রতা	স্টোরেজ লাইফ (সপ্তাহ)
আপেল	-২ - ১	৮৫-৯০	১৮
কলা	১১ - ১৫	”	৩
আঙুর	- ২ - ১	”	৮
পেয়ারা	৮ - ১০	”	৪
কাগজি লেবু	১২ - ১৪	”	৬
লাইম	৭ - ৮	”	৮
আম	১০ - ১১	”	৪
আনারস	৪ - ৭	”	৬
পেঁপে	৭	”	২-৩
সফেদা	০ - ২	”	১০

অনেক রকম সবজি ১৪-২৫০ দিন পর্যন্ত রেফ্রিজারেটেড স্টোরেজ অবস্থায় ভালো থাকে। সাধারণত গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ৫^{o}-৭^{o} সে. তাপমাত্রায় সবজি গুদামজাত করা হয়। তবে শীতকালে একটু কম তাপমাত্রা অর্থাৎ ০^{o}-৩^{o} সে. তাপমাত্রায় গুদামজাত করা হয়ে থাকে। নিচে রেফ্রিজারেটেড তাপমাত্রায় কিছু শাকসবজি গুদামজাত করার অবস্থা দেখানো হলো। সমস্ত শাকসবজির ক্ষেত্রেই আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকে ৮৫-৯০%।

সবজি	স্টোরেজ তাপমাত্রা (^{o}সে.)	স্টোরেজ লাইফ (দিনে)
শিম জাতীয় সবজি	৭	১৪
বাঁধাকপি	০	৮০
ফুলকপি	০	৪০-৫০
পেঁয়াজ	০-২	২০০-২৫০
আলু	৩-৭	২৮০-২৫০
বেগুন	৭-১০	১০-১৫
শসা	৭-১০	১০-১৫
মিষ্টি আলু	১২-১৫	৯০-১০০
কাঁচা টমেটো	১২-২১	৩০-৪০

২.১১ ক্যানিং পদ্ধতিতে ফল ও সবজি সংরক্ষণের মূলনীতি :

তাপীয় প্রক্রিয়াজাতকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো টিনজাতকরণ। টিনজাতকরণ (Canning) হচ্ছে খাদ্য সংরক্ষণের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে সম্পূর্ণভাবে বায়ুরোধী করে সিল করা ধাতব পাত্রের মধ্যস্থিত খাদ্যে উচ্চতাপ প্রয়োগ করা হয়। যে কোনো ধরনের পচন বা নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে খাদ্যকে রক্ষা করার জন্য এমন করা হয়। খাদ্যে যদি সঠিকভাবে টিনজাতকরণ করা হয় তবে পাত্রের ঢাকনা না খুললে খাদ্য অনেকদিন পর্যন্ত খাওয়ার উপযোগী থাকবে। এমনকি দু'তিন বছর পর্যন্তও থাকতে পারে।

বাণিজ্যিকভাবে সব টিনজাত খাবার জীবাণুমুক্ত না হলেও সাধারণত ওগুলো নষ্ট হয় না। কারণ ক্যানের ভিতরের পরিবেশ এমন থাকে যে, সংশ্লিষ্ট জীবাণুর জন্য ঐ অবস্থা সহায়ক হয় না। হয়তো বা অম্লত্ব কম থাকে কিংবা অক্সিজেনের অভাব পড়ে। তাই জীবাণু অকার্যকর হয়ে যায়। এজন্য ক্যানড্ ফুডের ক্ষেত্রে 'স্টেরিলাইজেশন' না বলে 'প্রসেসিং' বলা হয়ে থাকে।

একই তাপমাত্রায় সব ধরনের খাদ্যদ্রব্য জীবাণুমুক্ত করা যায় না। বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় জীবাণুমুক্ত হয়। কারণ ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য ভিন্ন ভিন্ন জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়। লো অ্যাসিড ফুডে যেসব জীবাণু জন্মায় সেগুলো এবং তাদের স্পোর ধ্বংস করতে সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রার দরকার হয়। ফলে অম্লত্বের মাত্রা এমন পরিমাণে থাকে যে ঐ অবস্থায় সে সব জীবাণু বাঁচতে পারে সেগুলো ১০০^{o} সে. তাপমাত্রায় ১০ মিনিট ফুটালেই ধ্বংস হয়ে যায়। তাই বলা হয় যে, ফল, সবজির তুলনায় সহজে জীবাণুমুক্ত হয়। নিচে কিছু ক্যানড্ ফুডের pH মান দেখানো হলো :

খাদ্যের শ্রেণি	pH মাত্রা	ক্যান্ড ফুড
ক্ষারীয় ফুড	৭ এর চেয়ে বেশি	ক্যানড্, পাকা জলপাই
লো অ্যাসিড ফুড	৪.০-৬.৮	মটর, ভুট্টা, শিম, আলু
মিডিয়াম অ্যাসিড ফুড	৪.৫-৫	সুপ, ফিগস, গাজর, লাউ
অ্যাসিড ফুড	৩.৭-৪.৫	টমেটো, আনারস, কমলা, আপেল
হাই অ্যাসিড ফুড	৩.৭ এর চেয়ে কম	লেবুর রস, লাইম জুস, জ্যাম, জেলি ।

২.১২ ক্যানিং পদ্ধতিতে ফল এবং সবজি সংরক্ষণ :

প্রবাহ চিত্র :

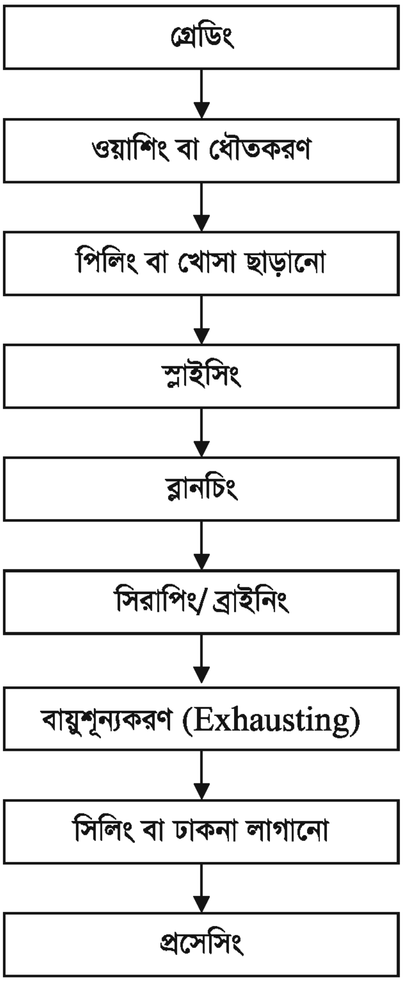

(১) গ্রেডিং প্রাথমিকভাবে বাছাই বা সর্টিং করার পর ফল ও সবজিকে আকার, আকৃতি, রং, পক্বতা, আঘাতজনিত ক্ষত, টেক্সার ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে গ্রেডিং করা হয়। গ্রেডিং হাতে অথবা নিম্নলিখিত যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়ে থাকে।

ক) স্ক্রিন গ্রেডার

খ) রোলার গ্রেডার

গ) ক্যাবল গ্রেডার।

(২) ওয়াশিং বা ধৌতকরণ : এ কাজটি প্রধানত ডুবিয়ে বা ধুয়ে করা হয়ে থাকে। যন্ত্রের সাহায্যেও করা যায়, এর ফলে ফল ও সবজি থেকে ধুলোবালি এবং জীবাণু অপসারিত হয়। ফল ও সবজি ধোয়ার পানি অবশ্যই পরিষ্কার ও অপদ্রব্যমুক্ত হতে হবে।

(৩) পিলিং বা খোসা ছাড়ানা : বেশিরভাগ ফল এবং সবজিই টিনজাত করার আগে খোসা ছাড়ানো হয়। এটা হাতে অথবা চাকুর সাহায্যে করা হয়ে থাকে। তবে যন্ত্রের সাহায্যেও করা যায়। যে সমস্ত ফল ও সবজির খোসা মোটা এবং শক্ত সেগুলো অবশ্যই পিলিং করতে হবে।

(৪) স্লাইসিং : টিনের কৌটায় পরিমাণমতো স্থান সংকুলানের জন্য ফল ও সবজিকে নির্দিষ্ট আকারে কেটে ছোট করে নিতে হবে। এতে করে সর্বত্র সমানভাবে তাপ পৌঁছাবে এবং সব টুকরা এক রকম সিদ্ধ হবে। কোনো কোনো ফল এবং সবজি কাটার পর ২-৩% লবণ দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা হয় যাতে ঐ ফলগুলোর রং কালো বা বাদামি না হয়। যেমন– আপেল, আলু এমনি কেটে রাখলে কালো বা বাদামি হয়। কিন্তু লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখলে কালো হয় না।

(৫) ব্লানচিং : সবজিকে ফুটন্ত পানিতে ২-৫ মিনিট ফুটিয়ে সাথে সাথে ঠাণ্ডা পানিতে চুবিয়ে ঠাণ্ডা করার প্রক্রিয়াকে ব্লানচিং বলে।

ব্লানচিং করার উদ্দেশ্য :

(ক) ফল ও সবজিতে উপস্থিত এনজাইমকে ধ্বংস করা।

(খ) খারাপ গন্ধ দূর করা।

(গ) খাদ্য দ্রব্যের টিস্যু থেকে গ্যাস দূর করা এবং

(ঘ) পরিষ্কার করা।

ব্লানচিং-এর পর সবজিকে পরিষ্কার এবং স্টেরাইল ক্যানে পরিমাণমতো ভর্তি করা হয়। ফল ব্লানচ করা হয় না। কারণ পাকা ফল থেকে রস আলাদা হয়ে যেতে পারে এবং সাথে সাথে পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহ ও অপচয় হয়ে যেতে পারে। নিচে সবজির ব্লানচিং করার সময় এবং তাপমাত্রা দেওয়া হলো :

সবজি	সময়	তাপমাত্রা (° সে.)
পালংশাক	২ মিনিট	৭৭°
আলু	৫ মিনিট	৩৮°
বাঁধাকপি	২ মিনিট	৩৮°
মটর	২ মিনিট	৮৮°

(৬) সিরাপিং/ ব্রাইনিং : ফলের সাথে ৭৯°- ৮২° সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত চিনির সিরাপ এবং সবজির সাথে একই তাপমাত্রার লবণ দ্রবণ দিয়ে ক্যান পূর্ণ করার সময় সিরাপ বা লবণ দ্রবণের উপরিভাগে ১/৮ ইঞ্চি থেকে ৩/১৬ ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা খালি রাখা হয়। এই খালি জায়গাকে হেড স্পেস বলে।

সিরাপ বা লবণ যোগ করার উদ্দেশ্য :

১) প্রস্তুত খাবারের স্বাদ ও গন্ধ উন্নত করা;

২) প্রসেসিং-এর সময় তাপ পরিচলনে সুবিধা হওয়া;

৩) ইন্টার সেলুলার স্পেস থেকে অক্সিজেন দূর করে রাসায়নিক ক্ষয় রোধ করা।

নিচের বিভিন্ন ফল ও শাকসবজিতে ব্যবহৃত সিরাপ ও লবণ দ্রবণের শক্তি উল্লেখ করা হলো–

ফল	সিরাপের শক্তি (° ব্রিক্স)
আম	আপেল ৪০ (০.২৫% সাইট্রিক অ্যাসিড)
কমলা	৫০ (০.২৫% সাইট্রিক অ্যাসিড)
আনারস	৪০ (০.২৫% সাইট্রিক অ্যাসিড)
নাশপাতি	৪০ (০.২৫% সাইট্রিক অ্যাসিড)
পেয়ারা	৪০ (০.১২৫% এসকরবিক অ্যাসিড এবং ০.৬% সাইট্রিক অ্যাসিড।
আপেল	হালক সিরাপ।

(৭) বায়ুশূন্যকরণ (Exhausting) : এ পদ্ধতিতে হেড স্পেসে স্টিম পরিচালনা করে অথবা পূর্ণ ক্যানের ডাকনা আলতোভাবে বসিয়ে ক্যানগুলো ফুটন্ত পানিতে গরম করে সেই বাষ্প দিয়ে বাতাসকে অপসারিত করে বায়ুশূন্য করাকে এক্সসটিং বা বায়ুশূন্যকরণ বলে।

বায়ুশূন্যকরণের উদ্দেশ্য–

(১) অক্সিজেন গ্যাস অপসারিত করে ক্যানকে রাসায়নিক ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করা।

(২) আকাঙ্ক্ষিত পরিমাণ ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করা, যাতে এরোবিক জীবাণুর বৃদ্ধি প্রতিরোধ হয়।

(৩) খাদ্যকে ওভার হিটিং-এর হাত থেকে রক্ষা করা।

(৪) কনটেন্ট এবং কনটেইনারের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রবণতা কমানো।

এক্সসটিং-এর সময় তাপমাত্রা নির্ভর করে ফল ও শাকসবজির প্রকৃতির উপর। তবে ক্যান গরম করার সময় তার ভেতরের তাপমাত্রা ৭৯° সে. হওয়ার পর ৫-৮ মিনিট ধরে এক্সসট করাই যথেষ্ট। কিন্তু শাকসবজির ক্ষেত্রে ১০-১৫ মিনিট ধরে এক্সসট করা উচিত।

(৮) সিলিং বা ঢাকনা লাগানো : এক্সসটিং-এর পর ডাবল সিমার মেশিনের সাহায্যে ক্যানের ঢাকনা সিল করা বা ঢাকনা জোড়া দেয়াকে সিলিং বলে। এমনভাবে সিল করতে হবে যেন কৌটাটি সম্পূর্ণরূপে বায়ু নিরোধক হয়।

(৯) প্রসেসিং : খাদ্যে উপস্থিত জীবাণুকে ধ্বংস করার জন্য বন্ধ টিনের কৌটাকে স্টেরিলাইজারের মধ্যে স্টিম-এর সাহায্যে ৩০-৪০ মিনিট ধরে তাপ দেয়া হয়। ফল এবং ফলজাত দ্রব্য সাধারণত ১০০° সে. এবং শাকসবজিজাত দ্রব্য ১১৬° সে. তাপমাত্রায় ৩০-৪০ মিনিট ধরে তাপ দেওয়া হয়। তাপ দেওয়া শেষ হলে সাথে সাথে পানিতে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করা হয় এবং পরে গুদামজাত করা হয়।

ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের সময়ের তালিকা

ফল	১০০° সে. তাপমাত্রায় ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় (মিনিটে)	
	ক্যান সাইজ-২ নম্বর ক্যান	ক্যান সাইজ এ-২ $\frac{১}{২}$ ক্যান
আম	২০	২৫
কমলা	১৮ (৮৮° সে.)	-
আনারস	২০	২০
আপেল	১০	১২
পেয়ারা	২০	২৫
নাশপাতি	২৫	৩৫

সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের সময়ের তালিকা

ফল	১০০° সে. তাপমাত্রায় সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় (মিনিটে)	
	ক্যান সাইজ-২ নম্বর ক্যান	ক্যান সাইজে এ-২ $\frac{১}{২}$ ক্যান
বিনস্	২০	৪০
বাঁধাকপি	৪০	৪০
গাজর	২৫	৩০
ফুলকপি	২০	২০
মটর দানা	৪০	৪৫
আলু	৪০	৪৫

বিভিন্ন ফলে উপস্থিত চিনি, অম্ল, এসকরবিক অ্যাসিডের পরিমাণ নিচের ছকে দেখানো হলো

ফল	চিনি %	অম্ল %	ফল এসকরবিক অ্যাসিড মিলিগ্রাম/ ১০০ গ্রাম
আপেল	১২.৫	০.৭০	৫
কলা	২৩	০.৩৯	১০
জাম	১১.৫	০.৯১	-
আঙুর	১৪.৯	০.২১	১০
পেয়ারা	১২.৫	০.৮২	৩০০
কাঁঠাল	১৮.৫	০.২৪	৫২
লেবু	২.২	৫.০৭	৪৫
লাইম	২.৫	৫.৯	২৭
আম	১৪.৫	০.৩২	৬২
কমলা	১০.৯	০.৯৩	৩১
পেঁপে	৯.৫	০.২৫	৪৬
আনারস	১৩.৭	০.৭২	২৪
কুল	১২.৯	১.৬	৫
তরমুজ	৬.৯	০.০৩	৬
স্ট্রবেরি	৮.১	১.০৯	৬০

বিভিন্ন ফলে উপস্থিত পেকটিনের পরিমাণ ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো

ফল	পেকটিন/১০০ গ্রাম
আপেল	০.৮
কলা	২.০
পেয়ারা	২.২
কাঁঠাল	৬.০
লেবুর খোসা	৬.০
কমলার খোসা	২.২
নাশপাতি	১.৮
তেঁতুল	২.০
মিষ্টি আলু	১.৭
কাঁচা পেঁপে	০.২
আনারস	০.৪
টমেটো	১.৪

২.১৩ ফল ও শাকসবজি সংরক্ষণে লবণের ভূমিকা :

লবণ দিয়ে ফল শাকসবজি সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকে পিকলিং বলে। এ পদ্ধতিতে ফলমূল ও শাকসবজি ছোট করে কেটে লবণ দ্রবণে (১৬-২৫%) ডুবিয়ে অথবা সরাসরি লবণ দিয়ে ঢেকে সংরক্ষণ করা হয়।

(ক) লবণ খাদ্যদ্রব্য থেকে মুক্ত পানি শোষণ করে নেয়। ফলে জীবাণুর জন্য প্রয়োজনীয় জলীয় কণা দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়।

(খ) লবণ জীবাণুনাশকের কাজ করে।

(গ) লবণ জীবাণুর কোষ থেকে পানি বের করে আনে। ফলে জীবাণুর মৃত্যু ঘটে।

২.১৪ শুষ্ককরণ বা ডিহাইড্রেশন প্রক্রিয়ায় ফল ও সবজি সংরক্ষণের মূলনীতি :

জলীয় কণা বা আর্দ্রতা ছাড়া জীবাণু বাঁচাতে পারে না বলে ফল ও সবজিকে উপযুক্তভাবে শুষ্ক করতে পারলে তা সংরক্ষিত হয়।

এছাড়াও শুকালে এনজাইমের ক্রিয়া প্রতিহত হয়। ফলে সবজি ও ফল পচনের হাত থেকে রক্ষা পায়। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ ফল ও সবজি সংরক্ষণ করে আসছে। সূর্যতাপে ফল ও সবজিকে শুকিয়ে সংরক্ষণ করাকে ড্রাইং এবং কৃত্রিম উপায়ে বাতাসকে ১১৫.৫° সে. তাপমাত্রায় গরম করে সেই বাতাস শাকসবজির উপর প্রবাহিত করে শুষ্ক করার পদ্ধতিকে ডিহাইড্রেশন বলে। এভাবে আপেল, কুল, নাশপাতি, কিসমিস, আমচুর, আমসত্ত্ব, বাঁধাকপি, আলু, করলা, ডুমুর ইত্যাদি শুষ্ক করা হয়ে থাকে।

২.১৫ ডিহাইড্রেশন প্রক্রিয়ায় ফল সংরক্ষণ :

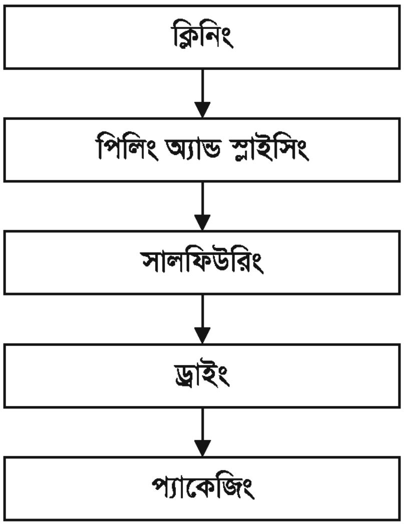

এখানে কিছু ফল ডিহাইড্রেশন প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করার উপযুক্ত অবস্থা দেখানো হলো–

ফল প্রস্তুতকরণ	**সাফিউরিং (মিনিট)**	**ড্রাইং**	
		তাপমাত্রা ° সে.	সময় (ঘন্টা)
আপেল-পিলিং, কোরিং, স্লাইসিং	২০-২৫	৬৩-৭১	৭-১০
অ্যাপ্রিকট-সম্পূর্ণ গোটা অবস্থায় অথবা কেটে অর্ধেক করে	২০-৩০	৬০-৭১	১২-১৮
আঙুর-গোটা	২০-৩০	৬৮-৭৯	২২-৮
পিচেস-কেটে অর্ধেক করে	১৫-২০	৬৩-৬৮	১৬-২২

এখানে কিছু সবজি ডিহাইড্রেশন প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করার উপযুক্ত অবস্থা দেখানো হলো-

সবজি	ব্যবস্থা গ্রহণ	ড্রাইং তাপমাত্রা- (°সে.)	শুকাবার সময় (ঘণ্টা)
বাঁধাকপি	স্টিম অথবা ফুটন্ত পানিতে ৫-১০ মিনিট ব্লাঞ্চিং করার সময় প্রতি কেজি সবজির সাথে ৫ গ্রাম করে পটাসিয়াম মেটাবাই সালফাইট (KMS) মিশ্রিত করতে হবে।	৬০-৬৬	১১-১৫
গাজর	গাজর ফুটন্ত পানিতে ৬-৮ মিনিট ধরে সিদ্ধ করার সময় প্রতি কেজি গাজরের সাথে ৫ গ্রাম করে পটাসিয়াম মেটাবাই সালফাইট যোগ করতে হবে।	৬০-৬৮	১৩-১৫
আলু	ঐ	৬০-৬৮	৭-৯

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ফল ও সবজি নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ হলো–

(ক) জীবাণুর আক্রমণ, যেমন- মোল্ড, ইস্ট, ব্যাকটেরিয়া
(খ) এনজাইমের ক্রিয়া
(গ) পানি অপসারণের কারণে শুকিয়ে যাওয়া
(ঘ) সবগুলো

২. চিলিং তাপমাত্রার সীমা-

(ক) ৩° সে. - ১০° সে.
(খ) ৫° সে. - ৭° সে.
(গ) -১৫° সে. - ২৯° সে.
(ঘ) -১৮° সে. - ৪০° সে.

৩. কোন উক্তিটি সঠিক?

(ক) শার্প ফ্রিজিং-এ ব্যবহৃত তাপমাত্রা ০° সে.
(খ) কুইক ফ্রিজিং- এ ব্যবহৃত তাপমাত্রা ০° সে.
(গ) এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজিং-এ ব্যবহৃত তাপমাত্রা ০° থেকে -৩০° ফা.
(ঘ) কোনোটিই নয়

৪. কোনটি সাইট্রাস ফ্রুট?

(ক) কালোজাম
(খ) আঙুর
(গ) কাগজি লেবু
(ঘ) কোনোটিই নয়

৫. কোনটি ডাল জাতীয় সবজি?

(ক) চেরি
(খ) সয়াবিন
(গ) বাদাম
(ঘ) লেটুস

৬. কোনটি রাসায়নিক সংরক্ষক?

(ক) সালফার ডাই-অক্সাইড (খ) কার্বন-ডাই অক্সাইড

(গ) হাইড্রেজেন সালফাইড (ঘ) ড্রাইড জিনজার

৭. শ্বাস প্রশ্বাস-এর সময় গাছপালা কোন গ্যাস গ্রহণ করে?

(ক) কার্বন-ডাই-অক্সাইড (খ) বাতাস

(গ) অক্সিজেন (ঘ) নাইট্রোজেন

৮. ক্যান বায়ুশূন্য করলে তার অভ্যন্তরীণ চাপের কী পরিবর্তন হয়?

(ক) চাপ বেড়ে যায়

(খ) চাপের কোনো পরিবর্তন হয় না

(গ) চাপ কমে যায়

(ঘ) চাপের সমতা হয়।

৯. বোতলজাত ফলের রস কত তাপমাত্রায় প্রসেস করা হয়?

(ক) ১০০° সে.

(খ) ২৪০° সে.

(গ) যে কোনো তাপমাত্রায়

(ঘ) কোনোটিই নয়

১০. শাকসবজি প্রসেস করা হয়–

(ক) ১০০° সে. তাপমাত্রায়

(খ) ২৪০° সে. তাপমাত্রায়

(গ) ১১৬° সে. তাপমাত্রায়

(ঘ) ° সে. তাপমাত্রায়

শূন্যস্থান পূরণ কর।

(ক) ফল ও সবজি ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করলে তা থেকে বহুল পরিমাণে................ ও .... অপসারিত হয়।

(খ) গ্যাস স্টোরেজের মাধ্যমে ফল .... সময় বেড়ে যায়।

(গ) খাদ্যস্থিত পানির ফ্রিজিং পয়েন্ট খাবার পানির ফ্রিজিং পয়েন্টের চেয়ে............. হয়।

(ঘ) খাদ্যদ্রব্যকে টিনের কৌটা বা ক্যানে ভরে উচ্চ তাপমাত্রায় ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করার পদ্ধতিকে ...... বলে।

(ঙ) ক্ষারীয় ফুডের pH -মাত্রা............ এর কম।

(চ) সবজিকে ফুটন্ত পানিতে ২-৫ মিনিট ফুটিয়ে সাথে সাথে পানিতে চুবিয়ে ঠাণ্ডা করার প্রক্রিয়াকে .... বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. প্রতিরক্ষাকারী খাদ্য বলতে কী বুঝায়?
২. ফল ও সবজি সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ ।
৩. ওয়াক্সিং বলতে কী বোঝ?
৪. চিলিং তাপমাত্রা বলতে কি বোঝ?
৫. রেফ্রিজারেটেড গ্যাস স্টোরেজের সুবিধা কী কী?
৬. বিভিন্ন ফ্রিজিং পদ্ধতির নাম লেখ ।
৭. ডিহাইড্রেশন প্রক্রিয়ায় ফল ও সবজি সংরক্ষণের প্রবাহ চিত্র দাও ।
৮. চিনি দিয়ে ফল ও সবজি সংরক্ষণ করা হয় কেন?
৯. সংরক্ষক হিসাবে লবণের ভূমিকা লেখ ।
১০. কয়েকটি রাসায়নিক সংরক্ষকের নাম লেখ ।
১১. হেড স্পেস বলতে কী বোঝ?
১২. বায়ুশূন্যকরণ বলতে কী বোঝ?
১৩. সবজিকে ব্লানচিং করার উদ্দেশ্য কী?
১৪. স্টেরিলাইজেশনের সংজ্ঞা দাও ।
১৫. ফল ও সবজির সাথে সিরাপ বা লবণ যোগ করার উদ্দেশ্যগুলো লেখ ।
১৬. কুইক ফ্রিজিং এবং স্লো ফ্রিজিং-এর পার্থক্য লেখ ।
১৭. এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজিং বলতে কী বোঝ?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. ফল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর ।
২. ফল ও সবজি সংরক্ষণের কোল্ড স্টোরেজ পদ্ধতির বর্ণনা দাও ।
৩. চিনির দিয়ে আনারসের টুকরা বোতলজাতকরণের পদ্ধতি বর্ণনা কর ।
৪. ফ্রিজিং বা কম তাপমাত্রায় ফল ও সবজি সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা কর ।
৫. ফল সংরক্ষণের ওয়াক্সিং পদ্ধতিতে কীভাবে পচন রোধ করা যায় বর্ণনা কর ।
৬. প্রবাহ চিত্রসহ ক্যানিং পদ্ধতিতে ফল সংরক্ষণের বিভিন্ন ধাপ সংক্ষেপে বর্ণনা কর ।
৭. লবণ দিয়ে ফল ও শাকসবজি সংরক্ষণের পদ্ধতি প্রবাহ চিত্রসহ বর্ণনা কর ।
৮. শুষ্ককরণ পদ্ধতিতে ফল ও সবজি সংরক্ষণের পদ্ধতি প্রবাহ চিত্রসহ বর্ণনা কর ।
৯. কাঁচা ফল ও সবজি সংরক্ষণের জন্য স্টিপিং প্রিজারভেশন পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

তৃতীয় অধ্যায়
মাছ

৩.১ মাছ (Fish) :

মাছ পানিতে বসবাসকারী শীতল রক্তবিশিষ্ট একটি মেরুদণ্ডী প্রাণী, যা স্বাভাবিকভাবে ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য পরিচালনা করে এবং পাখনার সাহায্যে পানিতে চলাফেরা করে। আকার, আকৃতি জীবনযাপনের পরিপার্শ্বিক অবস্থা ও ধরনের ওপর ভিত্তি করে মাছকে বিভিন্ন জাতে ভাগ করা হয়েছে। প্রায় ১৫ শত জাতের খাওয়ার উপযোগী মাছ পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে বাজারজাত করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড়, সমুদ্র ইত্যাদিতে প্রচুর মৎস সম্পদ রয়েছে। প্রাপ্ত মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, শিং, মাগুর, পুঁটি, কই, টাকি, বোয়াল, ভেটকি, পোয়া, লইট্যা, কোরাল, ইলিশ, চিংড়ি, রূপচান্দা, বেলে, ছুরি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৩.২ ভালো মাছের বৈশিষ্ট্য :

জলীয় অংশ	৮০-৮৫%
প্রোটিন	১৩-২২%
লিপিড	১.৫-৩০%
খনিজ লবণ	১-১.৮%

এছাড়াও অল্প পরিমাণে ভিটামিন ও শর্করা থাকে।

মাছের প্রকারভেদ

ব্যাপক অর্থে মাছকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা (১) ফিন ফিশ (Fin Fish) এদের কাঁটা বা অস্থিময় কাঠামো (Skeleton) আছে। যেমন– শার্ক, সারডিন, টুনা, রুই, কাতলা, মাগুর ইত্যাদি। (২) শেল ফিশ (Shell Fish) এদের দেহের উপরিভাগ খোসা দ্বারা আবৃত থাকে। যেমন– ছোট চিংড়ি, গলদা চিংড়ি ইত্যাদি।

এছাড়াও মাছকে আরও বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে। যেমন–

১. (ক) পেলাজিক ফিশ বা পানির উপরিভাগের মাছ (Pelagic Fish)
   (খ) পানির তলদেশের মাছ (Middle water Fish)

২. (ক) স্বাদ বা মিঠা পানির মাছ
   (খ) লোনা পানির মাছ
   (গ) আধা লোনা পানির মাছ

৩.৩ মৎস্য প্রোটিনের গুণগত বৈশিষ্ট্য :

১। প্রোটিনের মান সাধারণত নির্ভর করে তার পরিপাকের ধরন বা সহজপাচ্যতার ওপর এবং তা প্রকাশ করা হয় বায়োলজিকাল ভ্যালু (Biological Value-BV) হিসেবে। যে প্রোটিনের BV যত বেশি তার গুণগত মানও তত বেশি। এখানে কিছু দ্রব্যের বায়োলজিক্যাল ভ্যালু দেওয়া হলো–

দুধ	৯৯
কেজিন	৬৬
গরুর মাংস	১০৪
কড মাছ	৮৮

মাছের প্রোটিন অতি সহজেই হজম হয়, কারণ এতে কানেকটিভ টিস্যুর পরিমাণ কম থাকে এবং আঁশের দৈর্ঘ্য ছোট। মাছের প্রোটিনের প্রায় ৯৫% ভাগই সহজে হজম হয়।

২। প্রোটিনের মান প্রধানত নির্ভর করে তাতে উপস্থিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণের ওপর।

নিম্নে কিছু খাদ্যদ্রব্যে উপস্থিত অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণ দেখানো হলো :

খাদ্যদ্রব্য	আইসোলিউসিন	লিউসিন	লাইসিন	মেথিওনিন	ফিনাইল অ্যালামিন	থ্রিওনিন	ট্রিপটোফ্যান	ভ্যালিন
মাছ	৫.২৮	৮.৫০	৯.৭৬	২.৮৮	৪.১৬	৪.৮০	১.১২	১.৭৬
গরুর মাংস	৫.১২	৮.০০	৯.১২	২.৭২	৪.৪৮	৪.৫৫	১.২৮	৫.২৮
মুরগির মাংস	৪.৩৪	৭.৫২	৮.৯৬	২.৪০	৪.৪৮	৪.১৬	১.১২	৪.৮০
গম	৩.৩৬	৬.৭২	২.৪	১.৬০	৪.৪৮	২.৭২	১.১২	৪.৪৮
চাউল	৪.৮০	৮.০০	৩.৭	৩.৩০	৪.৪০	৩.৯০	১.৩০	১.১০

৩.৪ মৎস্য লিপিডের গুণগত বৈশিষ্ট্য :

লিপিডের মধ্যে ফ্যাটি অ্যাসিডের উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত উভয় প্রকার ফ্যাটি অ্যাসিডই বিদ্যমান থাকে। ফ্যাটের পুষ্টিমান তাতে উপস্থিত অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের ওপর নির্ভরশীল। মাছের তেলে লিনোলিথিক জাতীয় অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড বেশি থাকে যা দেহের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তবে অসম্পৃক্ততা থাকার কারণে মাছের তেল দ্রুত কটুত্ব বরণ করে।

মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ (Fish Processing)

মাছ বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করা যায়। যেমন–

১. শুষ্ককরণ পদ্ধতিতে

২. ফ্রিজিং পদ্ধতিতে

৩. টিনজাতকরণ পদ্ধতিতে

৪. পিকেলিং পদ্ধতিতে

৫. স্মোকিং পদ্ধতিতে

৬. রাসায়নিক পদ্ধতিতে

৩.৫ শুষ্ককরণ পদ্ধতি :

মাছ মারা যাওয়ার অল্প সময় পরেই তাতে পচন শুরু হয়। পচন প্রধানত রাসায়নিক, প্রাণ রাসায়নিক, এনজাইমেটিক এবং জীবাণুঘটিত বিভিন্ন ক্রিয়া ও আক্রমণের কারণেই ঘটে থাকে। মাছে উপস্থিত মুক্ত পানির পরিমাণ কমিয়ে বা অপসারিত করে উল্লেখিত বিক্রিয়াসমূহের গতি কমানো বা থামানো যায় এবং তা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব একমাত্র শুষ্ককরণ পদ্ধতিতে।

এ ক্ষেত্রে সাধারণত ৩৫$^{\circ}$-৩৭$^{\circ}$ সে. তাপমাত্রায় গরম বাতাস ব্যবহার করা হয়ে থাকে এর চেয়ে উচ্চ তাপমাত্রা ব্যবহারের ফলে কেস হার্ডেনিং হতে পারে। ব্যবহৃত বাতাস বেশ শুষ্ক হওয়া প্রয়োজন যাতে করে শুষ্ক মাছে উপস্থিত জলীয়কণার পরিমাণ ১৫% এর চেয়ে কম হয়। অন্যথায় এতে ছত্রাক জন্মাতে পারে। মাছ শুষ্ক করার আগে বিশেষ করে তার পেটের অংশ খুব ভালো করে পরিষ্কার করার পর পানি দিয়ে ধুয়ে শুষ্ক করলে তার গুণগত মান যেমন ভালো থাকে ঠিক তেমনি সংরক্ষিতও থাকে কিছু দিন। মাছ শুষ্ক করার জন্য সাধারণত টানেল ড্রায়ার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

শুষ্ক নোনা মাছ

লবণ যোগে মাছ শুকানো একটি অত্যন্ত ভালো পদ্ধতি। এতে করে মাছ বহুদিন সংরক্ষিত থাকে। এভাবে সংরক্ষিত মাছ (কড, হেরিং ও স্যালমন মাছ) ইউরোপে খুব সমাদৃত। আমাদের দেশেও ছোট বড় নানা ধরনের সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ এভাবে শুষ্ক করা হয়ে থাকে।

শুষ্ককরণ পদ্ধতি :

প্রবাহ চিত্র–

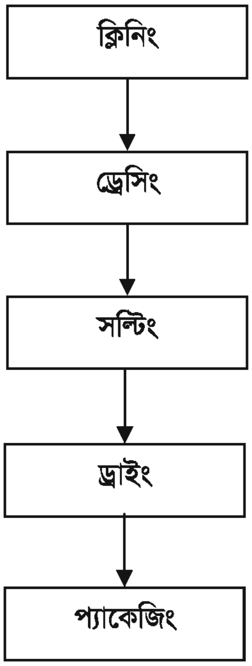

(১) ক্লিনিং – মাছের শরীরের ময়লা অপসারিত করার পর শরীরে লেগে থাকা আঠালো পদার্থ, খোসা, পাখনা কেটে পরিষ্কার করাকে ক্লিনিং বলে।

(২) ড্রেসিং – এক্ষেত্রে পরিষ্কার করার পর মাছের মাথা কেটে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং এ অবস্থায় মাছের মেরুদণ্ড বরাবর ছুরি দিয়ে কেটে দ্বিখণ্ডিত করে পেটের নাড়িভুঁড়ি ও ময়লা পরিষ্কার করা এবং প্রয়োজনমতো টুকরা করাকে ড্রেসিং বলে।

(৩) সল্টিং– ধোয়া, বাছা এবং ড্রেসিং করা মাছের মধ্যে পরিষ্কার গুঁড়া লবণ মাখানো হয়। সাধারণত লবণ এবং মাছের অনুপাত ১ : ৩ হয়ে থাকে। লবণের সাথে সংরক্ষক হিসাবে–

সোডিয়াম বেনজোয়েট	- ০.২%
পটাসিয়াম সরবেট	- ০.৫%
অ্যাসিড সোডিয়াম ফসফেট	- ০.৫% যোগ করা হয়।

লবণ মাখাবার কাজটি কক্ষ তাপমাত্রায় ৪৮ ঘণ্টা ধরে করা হয়ে থাকে। এরপর একবার ৫% লবণ দ্রবণ দিয়ে মাছ ধোয়া হয় এবং শরীরে লেগে থাকা অতিরিক্ত লবণ ঝেড়ে ফেলা হয়।

(৪) ড্রাইং– এবার লবণাক্ত মাছ রোগে অথবা ক্যাবিনেট ড্রায়ারে শুষ্ক করা হয়। এক্ষেত্রে বাতাসের প্রবেশ তাপমাত্রা ৮৫° সে. এবং মাছের আর্দ্রতা ২৫% রাখা হয়।

(৫) প্যাকেজিং – শুষ্ক মাছ সাধারণত পলিইথিলিন ব্যাগে এবং ওয়াক্সড পেপারে জড়িয়ে কাঠের বাক্সে প্যাকেট করা হয়।

ফ্রিজিং

ড্রেসিং করা টাটকা মাছ সেলোফেন অথবা পিভিসি/স্যারান ব্যাগে ভরে র‍্যাপিড ফ্রিজিং পদ্ধতিতে -৪০° সে. তাপমাত্রায় হিমায়িত করে সংরক্ষিত করা হয়। এ অবস্থায় মাছ ৬ মাস পর্যন্ত ভালো থাকে। এ ক্ষেত্রে নিম্নতাপমাত্রার প্রভাবে ব্যাকটেরিয়ার সব ধরনের কার্যকারিতা থেমে যায় ও এই প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে অনেক ব্যাকটেরিয়া মারা যায় এবং পরবর্তী পরিস্থিতিতে সংরক্ষণাগারে থাকা অবস্থায় ক্রামগতভাবে ধীরে ধীরে ব্যাকটেরিয়ার মৃত্যু ঘটতে থাকে। মাছে ৬০-৮০% ভাগ পানি থাকে এবং সেই পানি যখন ঠাণ্ডার প্রভাবে জমে বরফে পরিণত হয় তখন তা জীবাণুর বৃদ্ধির জন্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। কাজেই হিমায়িত খাদ্যদ্রব্য আপনা-আপনি সংরক্ষিত থাকে। সাধারণত মাছ হিমায়িত করার জন্য প্লেট ফ্রিজার এবং এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজার ব্যবহার করা হয়। তবে বর্তমান ইনডিভিজুয়াল কুইক ফ্রিজিং পদ্ধতির (IQF) প্রচলন শুরু হয়েছে। এতে প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আরও সহজ ও ব্যবসা সফল হয়েছে।

টিনজাতকরণ পদ্ধতি

টিনের কৌটায় মাছ ভরে বায়ুশূন্য অবস্থায় বন্ধ করার পর তাকে ১২১° সে. তাপমাত্রায় ৭৫ মিনিট ধরে তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করে সংরক্ষণ করা হয়।

টিনজাতকরণের প্রবাহ চিত্র :

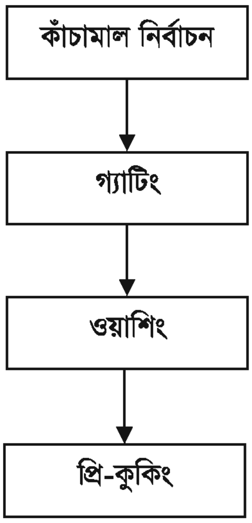

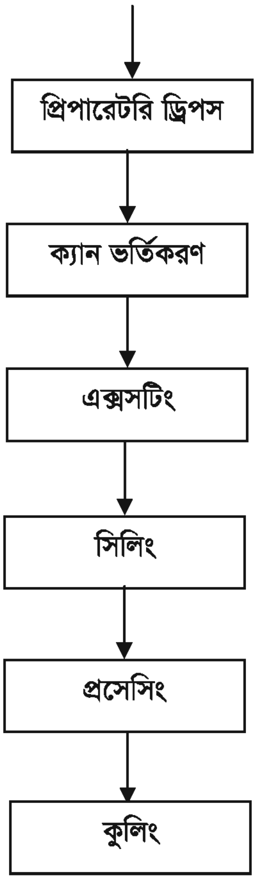

কাঁচামাল নির্বাচন

শুধুমাত্র পরিষ্কার নীরোগ এবং দৃঢ় অবস্থার মাছকেই টিনজাত করার জন্য নির্বাচিত করা উচিত। এজন্য টিনজাতকরণ শিল্প কারখানায় মাছ পৌঁছার সাথে সাথে তা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরিদর্শক দ্বারা পরীক্ষা করানো দরকার। এরপর পরীক্ষিত মাছকে তার সাইজ, কালার এবং টেক্সারের ভিত্তিতে বাছাই করার পর প্রাপ্ত বিভিন্ন মানের মাছ ভাগে ভাগে আলাদাভাবে প্রক্রিয়াজাত করা উচিত।

গ্যাটিং বা পেট পরিষ্কারকরণ

মাছের মাথা কেটে গলা দিয়ে পেটের নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করে পরিষ্কার করার এই পদ্ধতিকে গ্যাটিং বলে। আসলে নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করে পরিষ্কার করার এই পদ্ধতি খুব কার্যকর নয়। কারণ এতে করে পেটের কোথাও ময়লা কিছু থেকে গেলে সহজেই মাছ পচে যায় এবং টিনজাত মাছের গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। কাজেই খুব সতর্কতার সাথে মাছের পেট কেটে এমনভাবে পরিষ্কার করতে হবে যেন নাড়িভুঁড়ির কোনো অংশ পেটের মধ্যে না থাকে।

ওয়াশিং বা ধৌতকরণ

মাছ কাটা, বাছা, আঁইশ ছাড়ানো, চামড়া ছাড়ানো এবং আনুষাঙ্গিক কাজ করার জন্য সর্বদা খাওয়ার উপযোগী পানি অথবা সমুদ্রের পরিষ্কার পানি ব্যবহার করা উচিত। পরিষ্কার করার কাজটি এমনভাবে করতে হবে যেন তাতে কোনো প্রকার ময়লা, রক্ত বা আঠালো দ্রব্য না থাকে অর্থাৎ মাছ এবং অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হতে হবে। তাছাড়া উৎপন্ন দ্রব্যের রং বিবর্ণ হয়ে যেতে পারে।

প্রি-কুকিং বা রান্নার পুর্বে করণীয়

রান্না করার পূর্বে প্রস্তুতকৃত মাছকে উত্তপ্ত পানি অথবা লবণ দ্রবণ, স্টিম, উপ্তপ্ত বাতাস অথবা উতপ্ত তেলে কিছু সময় গরম করার প্রক্রিয়াকে প্রি-কুকিং বলে। সাধারণত নিম্নলিখিতভাবে প্রি-কুকিং করা হয়–

(ক) মাছের শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় তরল পদার্থ অপসারিত করার জন্য প্রি-কুকিং করা হয়। এতে করে মাছের আঁশটে গন্ধ দূর হয়।

(খ) মাছে যদি অত্যাধিক তেল থাকে অথবা মাছের তেলে যদি কড়া গন্ধ থাকে তাকে দূর করার জন্য।

(গ) মাছের গাঠনিক বৈশিষ্ট্য উন্নত করার জন্য।

(ঘ) বিশেষ ধরনের টেক্সার এবং ফ্লেভার উৎপন্ন করার জন্য যেমনটি হয়ে থাকে তেলে ভাজা মাছের ক্ষেত্রে।

(ঙ) মাছকে দৃঢ় করার জন্য।

প্রিপারেটরি ডিটস

মাছ রান্না বা প্রসেস করার সময় প্রায়ই লবণ পানি অথবা বিভিন্ন ধরনের মসলার নির্যাস এবং কন্ডিশনিং দ্রব্যের মধ্যে চুবিয়ে রাখা হয়। এর মধ্যে লবণ দ্রবণে চুবানো একটি সাধারণ ব্যবস্থা। এরূপ করার কারণ–

(ক) লবণের ঘন দ্রবণ মাছের উপরিভাগের পেশিকে দৃঢ় করে।

(খ) জৈবিক অ্যাসিড অ্যামোনিয়াম এবং কপার আয়নকে বেঁধে ফেলে।

(গ) অন্যান্য উপাদান সুগন্ধির কাজে ব্যবহৃত হয়।

ক্যান ভর্তিকরণ

মাছ টিনজাতকরণের জন্য ব্যবহৃত ক্যান প্রধানত টিন প্লেট, অ্যালুমিনিয়ামের সংকর অথবা কাচের দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে সালফার প্রতিরোধক ক্যানই সচরাচর ব্যবহার করা হয়। মাছ সাধারণত হাত দ্বারা অথবা ফিলিং যন্ত্রের সাহায্যে ক্যানে ভরা হয়।

টিনজাত মাছ প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াজাত করার সময় বহু রকমের উপকরণ ব্যবহার করা হয়। মাছকে সুস্বাদু করার জন্য তাতে লবণ ও বিভিন্ন ধরনের মসলা যোগ করা হয়। খাদ্যের টেক্সার, অ্যাসিডিটি এবং কোয়ালিটি উন্নত করার জন্য তাতে নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য, তেল, সস এবং ফিলারও যোগ করা হয়। ক্যানে মাছ ভর্তি করার সময় তাতে উপযুক্ত পরিমাণ খালি জায়গা (Head Space) রাখা হয়।

বায়ুশূন্যকরণ

মুখ বন্ধ করার পর ক্যানে আংশিক বায়ুশূন্যতা বজায় রাখার জন্যই তা থেকে বাতাস অপসারিত করা হয়। তাছাড়াও বায়ু শূন্য করার আরও দুটি প্রধান কারণ হলো :

(ক) ক্যানের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় কোন বাতাস থাকলে হিট প্রসিসিং-এর সময় তার চাপে ক্যান ফেটে যেতে পারে।

(খ) বায়ুশূন্যতা, উষ্ণ আবহাওয়া এবং নিম্ন বায়বীয় চাপে গুদামজাতকরণের ক্ষেত্রে ক্যান ফুলে ওঠা রোধ করে।

ক্যানের মুখ বন্ধকরণ

ক্যানের মুখ সাধারণত ডাবল সিমিং মেশিন বা ডাবল সিমারের সাহায্যে বন্ধ করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে উপযুক্তভাবে ক্যানের মুখ জোড়া লাগানো হলে তা খুবই নিখুঁত, শক্তিশালী এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়।

প্রসেসিং

মাছ একটি লো-অ্যাসিড ফুড। এতে পচনকারী ও স্পোর উৎপাদক জীবাণু জন্মাতে পারে। কাজেই উচ্চ তাপমাত্রায় এবং দীর্ঘ সময় মাছভর্তি ক্যান সিদ্ধ করা দরকার যাতে ক্লোসট্রিডিয়াম বটুলিনাম নামক জীবাণুর স্পোর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এজন্য কৌটাভর্তি মাছ ১২১° সে. বা ২৫০° ফা. তাপমাত্রায় কমপক্ষে ৫০-৬০ মি. ধরে প্রসেস করা হয়ে থাকে।

ঠাণ্ডাকরণ

প্রসেসিং শেষে উত্তপ্ত ক্যানকে ঠাণ্ডা পানির প্রবাহে ৩৮° সে. তাপমাত্রায় কমিয়ে আনা হয় এবং মেঝেতে সাজিয়ে রাখা হয়। এতে করে ক্যান আপনা-আপনি শুকিয়ে যায় এবং পরে কার্টন বক্সে প্যাকেট করা হয়।

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. মাছ শ্বাসকার্য পরিচালনা করে–

(ক) পাখনার সাহায্যে
(খ) ফুলকার সাহায্যে
(গ) ফুসফুসের সাহায্যে
(ঘ) নাসিকার সাহায্যে

২. মাছের প্রোটিন খুব সহজে হজম হয়, কারণ–

(ক) এতে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি
(খ) এর বায়োলজিক্যাল ভ্যালু কম
(গ) কানেকটিভ টিস্যুর পরিমাণ কম
(ঘ) আঁশের দৈর্ঘ্য বেশি ।

৩. মাছের তেল দ্রুত কটুত্ব বরণ করে কেন?

(ক) ফ্যাটি অ্যাসিডের কারণে
(খ) সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের কারণে
(গ) অসম্পৃক্ত অ্যাটি অ্যাসিডের কারণে
(ঘ) BV এর পরিমাণ বেশি ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাছ বলতে কী বোঝ? বিভিন্ন জাতের মাছের নাম লেখ ।
২. মাছের উপাদানগুলোর নাম লেখ ।
৩. মাছের প্রকারভেদ উল্লেখ কর ।
৪. মৎস্য লিপিডের গুণগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর ।
৫. মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মৎস্য প্রোটিনের গুণগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর ।
২. মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের শুষ্ককরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর ।
৩. মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের ফ্রিজিং পদ্ধতি বর্ণনা কর ।
৪. মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের টিনজাতকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

চতুর্থ অধ্যায়
মাংস

৪.১ মাংসের সংজ্ঞা :

খাওয়ার যোগ্যপ্রাণি ও পাখির পেশি কানেকটিভ টিস্যু ও ফ্যাটকে একত্রভাবে মাংস বা Flesh বলা হয়।

৪.২ মাংসের উৎস :

মাংসের প্রধান উৎস হলো–

(১) গরু ও মহিষ --------- এদের মাংসকে বলা হয় বিফ (Beef)

(২) ভেড়া ও ছাগল -------- এদের মাংসকে বলে মাটন (Mutton)

(৩) শূকরের মাংসকে বলে পর্ক (Pork) বা হ্যাম (Ham)

(৪) মুরগি ও হাঁস -------- এদের মাংসকে বলে চিকেন মিট বা (Poultry Meat)

৪.৩ উপজাত দ্রব্য :

১) চামড়া ------- এ থেকে উৎপন্ন হয় পাকা চামড়া বা লেদার।

২) হাড় ------- এ থেকে উৎপন্ন হয় জেলাটিন ও সার।

৩) নাড়ি-ভুঁড়ি -------- এ থেকে উৎপন্ন হয় খাবার।

৪) ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে উৎপন্ন হয় সসেজের প্রাকৃতিক আবরণ এবং অপারেশনে সেলাই করার সুতা।

৫) লিভার থেকে উৎপন্ন লিভার এক্সট্রাক্ট।

৬) লোম থেকে উৎপন্ন হয় ব্রাশ, উল (Wool)।

৭) রক্ত থেকে উৎপন্ন হয় সার।

৮) শিং ও খুর --------- গ্লু তৈরিতে ব্যবহার হয়।

৯) চর্বি ------- সাবান তৈরিতে ব্যবহার হয়।

১০) লেজ ------- এর লোম ব্রাশ প্রস্তুতিতে ব্যবহার হয়।

৪.৪ মাংসের গাঠনিক উপাদান :

প্রাণীর বয়স, পুষ্টিমান এবং শরীরের কোনো অংশ থেকে মাংস গৃহীত হয়েছে তার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে মাংসের গাঠনিক উপাদান। প্রাণীর কঙ্কালের সাথে সংযুক্ত মাংসপেশির পরিমাণ হলো তার শরীরের

ওজনের প্রায় ৪৫% । এই মাংসপেশি অনেকগুলো লম্বা আঁশের সমন্বয়ে গঠিত একেকটি আঁটি বা বান্ডেলের মতো যার উপরিভাগ আবৃত থাকে কানেকটিভ টিস্যু দ্বারা । এছাড়াও মাংসের মধ্যে আরও থাকে গ্লাইকোজেন এবং ফ্যাট । নিচে মাংসের গাঠনিক উপাদান দেওয়া হলো

পানি	৭৫.৫%
প্রোটিন	১৪%
ফ্যাট	৩%
নাইট্রোজেনঘটিত দ্রব্য-	১.৫%
দ্রবণীয় নন প্রোটিন জাতীয় দ্রব্য-৩.৫%	
এই দ্রবণীয় নন প্রোটিন অংশে থাকে	
ল্যাকটিক অ্যাসিড-	০.৭%
গ্লাইকোজেন-	০.১%
গ্লুকোজ-	০.১%
গ্লুকোজ ও ফসফেট-	০.১৭%
ছাই বা খনিজ উপাদান-	১.২%

প্রোটিন

মাংসের প্রোটিনকে প্রধানত দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে । যেমন–

(১) প্রোটোপ্লাজমিক বা কোষ অভ্যন্তরীণ প্রোটিন এবং

(২) স্ট্রাকচারাল বা গাঠনিক প্রোটিন

১. কোষ অভ্যন্তরীণ প্রোটিন

সামগ্রিকভাবে মাংসে উপস্থিত প্রোটিনের পরিমাণ হলো ১২-১৮% । এর মধ্যে কোষ অভ্যন্তরীণ প্রোটিন যা থাকে ৮৩-৯০% । এই প্রোটিনের প্রধান অংশকে বলা হয়-

(১) মাইয়সিন (Myosin) এবং

(২) অ্যাকটিন (Actin) । এদের তাপ দিলে ঘনীভূত হয় ।

২। গাঠনিক প্রোটিন

এ জাতীয় প্রোটিন কানেকটিভ টিস্যু হিসেবে পরিচিত । মাংসের মোট প্রোটিনের ১০-১৭% হলে গাঠনিক প্রোটিন এবং এর প্রধান অংশকে বলা হয় কোলাজেন (Collagen) একে তাপ দিলে ধীরে ধীরে তা পরিণত হয় জেলাটিনে ।

৪.৫ মাংসে উপস্থিত রঞ্জক পদার্থ (Pigments) :

মাংসে উপস্থিত স্বাভাবিক রঞ্জক পদার্থ যার কারণে মাংসকে লালচে দেখায় তাকে বলে মাইয়গ্লোবিন। এছাড়াও হিমোগ্লোবিনের কারণেও মাংসের রং লাল হয়। মাংসে মাইয়গ্লোবিন থাকে ০.৪৬% এবং এর মধ্যে ৪-২০% রঞ্জক উপদান আসে হিমোগ্লোবিন থেকে।

কার্বোহাইড্রেট

মাংসে উপস্থিত কার্বোহাইড্রেটকে বলা হয় গ্লাইকোজেন। গ্লাইকোজেন প্রধানত যকৃৎ এবং স্থির মাংসপেশিতে জমা থাকে। কিন্তু জবাই করার পর মৃতদেহ শক্ত হওয়ার সময় সংকুচিত হওয়ার কারণে সমস্ত গ্লাইকোজেন রূপান্তরিত হয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

ফ্যাট

মাংসের মধ্যে প্রায় ৩% ফ্যাট থাকে। এই ফ্যাটের মধ্যেই থাকে প্রাকৃতিক লিপিড, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল এবং আরও কিছু গৌণ উপাদান। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে গরুর চর্বির রং ধীরে ধীরে সাদা থেকে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এর প্রধান কারণ ক্যারোটিনয়েডেস-এর উপস্থিতি। গরুর চর্বিকে ট্যাল্লো (Tallow) এবং শূকরের চর্বিকে লার্ড (Lard) বলা হয়।

৪.৬ মাংসের পুষ্টিমান :

মাংসের পুষ্টিমান বা খাদ্যমান কোনোটিই অন্যান্য খাবারের চেয়ে কম নয় বরং বেশি। এতে প্রায় সব ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড, ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স, ভিটামিন 'এ' এবং প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস পাওয়া যায়। মাংস যে কেবলই পুষ্টিমানের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা নয় বরং এটা খাবার হিসেবেও খুবই জনপ্রিয়। কারণ মাংস দিয়ে প্রস্তুত খাবার হয় আকর্ষণীয়, সুস্বাদু, বিশেষ স্বাদ ও গন্ধযুক্ত এবং অতিশয় তৃপ্তিদায়ক। রান্না করার পর সাধারণত মাংসের সকল বৈশিষ্ট্য হয় উন্নত এবং খেতে হয় নরম, মুখরোচক ও সহজপাচ্য।

৪.৭ মাংস জীবাণু আক্রান্ত হওয়ার বিভিন্ন দিক :

মাংস একটি অতি উত্তম খাবার। এতে প্রায় সব রকমের পুষ্টি উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ ও জাতির মানুষই মাংস খেতে পছন্দ করে। খেতে যতই ভালো হোক না কেন এতে কিন্তু জীবাণু আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে খুবই বেশি। জীবাণুর উপস্থিতির কারণেই সাধারণত মাংসের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে থাকে। আমরা জানি সুস্থ প্রাণীর মাংসে জীবাণু খুব কমই থাকে। লিমফ নোড, হাড়ের মজ্জা এবং অসুস্থ প্রাণীর দেহে রোগজীবাণু থাকা খুবই স্বাভাবিক। মাংস প্রধানত কলুষিত (Contamination) হয় গোয়ালে, কসাইখানায়, জবাই করার স্থানে এবং প্রসেসিং-এর সময়।

৪.৮ মাংস কলুষিত হওয়ার উৎস :

নিম্নলিখিত উৎস থেকে প্রধানত মাংস কলুষিত হয়ে থাকে। যেমন–

(১) জীবন্ত অবস্থায় গোয়ালে থাকাকালীন সময় মেঝের সংস্পর্শে।

(২) চামড়ার সংস্পর্শে।

(৩) নাড়িভুঁড়ির বর্জ্যদ্রব্য থেকে।

(৪) মাংস কাটার ছুরি, রাখার পাত্র, ট্রলি ইত্যাদি যন্ত্রপাতির মাধ্যমে।

(৫) হাত থেকে।

(৬) বাতাস থেকে।

(৭) ব্যবহারের কাপড় থেকে এবং পানি থেকে।

৪.৯ মাংসে উপস্থিত জীবাণু :

মাংসের প্রধানত নিম্নলিখিত জীবাণুসমূহ উপস্থিত থাকতে পারে :
যেমন–

(১) স্ট্যাফাইলো কক্কাস

(২) মাইক্রো কক্কাস

(৩) ব্যাসিলাস

(৪) ফ্লাভো ব্যাকটিরিয়াম

(৫) ইকলাই

(৬) এরো ক্যাকটার

(৭) এরোমোনাস

(৮) স্ট্রেপটো কক্কাস

(৯) ক্লোসট্রিডিয়াম বটুলিনাম

(১০) ক্লোসট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেন্স

(১১) স্যালমোনিলা ইত্যাদি।

৪.১০ মাংসের জীবাণু নিয়ন্ত্রণ :

নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মাংসের জীবাণু নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। যেমন-

(১) গোশালায় অল্প সংখ্যক প্রাণী এক সাথে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এতে করে পুনঃকলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

(২) নিয়মিতভাবে গোশালা ধুয়ে পরিষ্কার রাখা এবং জবাই করার পূর্বে প্রাণীকে গোসল করানো ।

(৩) স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে চামড়া ছাড়ানো, নাড়িভুঁড়ি অপসারণ, ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মাঝে মাঝে হাত ধোয়া এবং গরম পানি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ছুরি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ধুয়ে পরিষ্কার করা ।

(৪) মাংস, চামড়া, চর্বি, হাড়ের অংশ ইত্যাদি বর্জ্যদ্রব্য ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করার পর মেঝে ক্লোরিন ওয়াটার দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা প্রয়োজন ।

(৫) কাজের শেষে চাকু এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি সোডিয়াম কার্বোনেট অথবা সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড-এর গরম দ্রবণে ডুবিয়ে রেখে পরিষ্কার করা উচিত । এতে করে চর্বি জাতীয় পদার্থ সহজেই অপসারিত হয় ।

(৬) ২৫০ পি পি এম ক্লোরিনসমৃদ্ধ সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড-এর দ্রবণ খুবই কার্যকরভাবে জীবাণু ধ্বংসকারক হিসেবে কাজ করে ।

৪.১১ স্বাস্থ্যবান প্রাণী নির্বাচন :

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ওপর ভিত্তি করে স্বাস্থ্যবান পশু নির্বাচন করা হয়-

(১) প্রাণীর সাধারণ অবস্থা, যেমন– পশুটি মোটা-তাজা কিনা ।

(২) প্রাণীর দাঁড়ানো এবং হাঁটার ধরন ।

(৩) পরিবেশের প্রতি আচরণ ।

(৪) প্রাণীর চামড়া এবং লোমের প্রকৃতি ।

(৫) প্রাণীর পরস্পরের প্রতি আচরণ ।

(৬) প্রাণীর রোগাক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ ।

(৭) প্রাণীর শ্রেণি, লিঙ্গ, রং এবং বয়স ।

(৮) শরীরের তাপমাত্রা ।

(৯) প্রাণীর ঠোঁট, মুখ, গ্লান্ড, নাকের ছিদ্র, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষাকরণ ।

(১০) প্রতিটি সন্দেহজনক প্রাণীকে পৃথক করে 'জবাই-এর অযোগ্য' বলে শনাক্তকরণ ।

৪.১২ জবাইকৃত প্রাণীর শরীর পরীক্ষাকরণ পদ্ধতি :

জবাই করার পর প্রাণীর চামড়া ও নাড়িভুঁড়ি অপসারিত করে পরিষ্কার অবস্থায় প্রতিটি মৃতদেহকে নিয়মিত ভাবে পরীক্ষা করা উচিত । এজন্য মৃতদেহ এবং তার অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ, যেমন–

(১) প্রাণীর মাথা বা Head

(২) ফুসফুস বা Lungs
(৩) হৃৎপিন্ড বা Heart
(৪) যকৃৎ বা Liver
(৫) পাকস্থলী এবং অন্ত্র বা Stomach and Intestine
(৬) বৃক্ক বা Kidney
(৭) প্লীহা বা Splin
(৮) জরায়ু বা Uterus
(৯) স্ত্রী প্রাণীর স্তন বা Breast
(১০) সার্বিকভাবে সম্পূর্ণ মৃতদেহ পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

১. প্রাণীর মাথা

এক্ষেত্রে খুরা রোগ, নেকরোটিক এবং অন্যান্য ধরনের স্টমাটাইটস ও অ্যাকটিনো- মাইকোসিস রোগ নির্ণয়ের জন্য পশুর ঠোঁট, দাঁতের মাড়ি এবং জিহবা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এছাড়াও যক্ষ্মা রোগের জন্য লিম্ফনোড পরীক্ষা করা উচিত।

২. ফুসফুস

এক্ষেত্রে নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা এবং হাইডেটিড সিস্ট নির্ণয় করার জন্য ফুসফুস পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

৩. হৃৎপিণ্ড

যক্ষ্মা এবং পেরিকারডিটিস রোগ নির্ণয়ের জন্য হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করা দরকার।

৪. যকৃৎ

এক্ষেত্রে লিভার অ্যাবসিস এবং হাইডেটিড সিস্ট নির্ণয়ের জন্য যকৃৎ পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

৫. পাকস্থলী এবং অন্ত্র

অন্ত্রের যক্ষ্মা নির্ণয়ের জন্য মেসেটিক লিম্ফনোড পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

৬. বৃক্ক

এক্ষেত্রে রেনাল লিম্ফনোড পরীক্ষা করা হয়।

৭. প্লীহা

এক্ষেত্রে যক্ষ্মা, অ্যানথ্রাক্স এবং হিমাটোমা রোগ নির্ণয়ের জন্য প্লীহা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

৮. স্ত্রী প্রাণীর স্তন

এক্ষেত্রে যক্ষ্মা এবং অ্যাবসিস নির্ণয়ের জন্য স্তন পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

৯. সম্পূর্ণ মৃতদেহ

এক্ষেত্রে মৃতদেহের উপরিভাগ পরীক্ষা করে দেখা হয় যে তাতে কোনো প্রকার ক্ষতচিহ্ন আছে কিনা।

পরিষ্কারকৃত মৃতদেহ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

(১) আর্থিকভাবে লাভনজক ও বেশি পরিমাণে মাংস পাওয়া যায়। এমন শ্রেণির পশু খুঁজে বের করা।

(২) এমন কোয়ালিটির মৃতদেহ বা Carcass খুঁজে বের করা যাতে করে সংরক্ষক, খুচরা বিক্রেতা এ ভোক্তাদের সবাই তা পছন্দ করে এবং

(৩) প্রাণীর জাত ও বংশের উন্নতি সাধন করে মাংসের উৎপাদন বাড়ানো।

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. গরুর মাংসকে বলা হয়-

ক. মাটন খ. পর্ক
গ. বিফ ঘ. চিকেন

২. ভেড়া ও ছাগলের মাংসকে বলা হয়-

ক. বিফ খ. পর্ক
গ. মাটন ঘ. চিকেন

৩. শূকরের মাংসকে বলা হয়-

ক. পর্ক খ. বিফ
গ. মাটন ঘ. চিকেন

৪. মুরগির মাংসকে বলা হয়-

ক. মাটন খ. বিফ
গ. পর্ক ঘ. চিকেন

৫. পশুর কঙ্কালের সাথে সংযুক্ত মাংপেশির পরিমাণ হল তার শরীরের ওজনের–

ক. ৫০% খ. ৬০%
গ. ৪৫% ঘ. কোনোটিই সত্য নয়

৬. মাংসপেশির উপরিভাগ আবৃত থাকে-

ক. চর্বি দ্বারা খ. হাড় দ্বারা
গ. কানেকটিভ টিস্যু দ্বারা ঘ. উপরের সবগুলো

৭. কোষ অভ্যন্তরীণ প্রোটিনের প্রধান অংশকে বলা হয়–

ক. মাইয়সিন খ. অ্যাকটিন
গ. পেকটিন ঘ. ক ও খ উভয়ই

৮. রঞ্জক পদার্থ হিসেবে মাংসে থাকে–

ক. মাইয়গ্লোবিন খ. গ্লোবিউলিন
গ. হিমোগ্লোবিন ঘ. ক ও গ উভয়ই

৯. গরুর চর্বিকে বলা হয়–

ক. লার্ড খ. ট্যাল্লো

গ. লিপিড ঘ. কোনোটিই নয়

১০. শুকরের চর্বিকে বলা হয়–

ক. ফ্যাট খ. বিফ

গ. লার্ড ঘ. ট্যাল্লো

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাংস বলতে কী বোঝায়?
২. মাংস উৎস কী?
৩. মাংসের উপজাত হিসেবে কী কী দ্রব্য পাওয়া যায়?
৪. মাংসের গাঠনিক উপাদান কীরূপ?
৫. মাংসের কোষ অভ্যন্তরীণ প্রোটিন কীরূপ?
৬. মাংসের গাঠনিক প্রোটিন কীরূপ?
৭. মাংসের রঞ্জক পদার্থ কী কী নিয়ে গঠিত?
৮. মাংসে উপস্থিত কার্বো-হাইড্রেটের প্রকৃতি কেমন হয়?
৯. মাংসের চর্বি বা ফ্যাটের গাঠনিক প্রকৃতি লেখ।
১০. মাংসের পুষ্টিমান কীরূপ?
১১. কী কী উৎস থেকে মাংস কলুষিত হয়?
১২. মাংসে উপস্থিত থাকে এমন ৫টি জীবাণুর নাম লেখ।
১৩. মাংসের জীবাণু কী করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়?
১৪. জবাই পূর্ববর্তী প্রাণী পরীক্ষাকরণ কীভাবে করা হয়?
১৫. জবাই পরবর্তী প্রাণীর শরীর পরীক্ষা করার সময় কী কী অঙ্গ পরীক্ষা করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জবাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রাণির শরীর পরীক্ষাকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

মাংস সংরক্ষণ

৫.১ মাংস বা মাংসজাত দ্রব্য হিমায়ন পদ্ধতিতে সংরক্ষণ :

টাটকা মাংস এবং মাংসজাত দ্রব্য সাধারণত নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। কারণ ০° সে. থেকে -১৮° সে. তাপমাত্রার মাঝে খাবারে উপস্থিত সব রকমের এনজাইমের ক্রিয়া এবং ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। আমরা এও জানি যে, যত কম তাপমাত্রায় মাংস গুদামজাত করা হয় তত দীর্ঘায়িত হয় তার সংরক্ষণ কাল। কাজেই যতটা সম্ভব নিম্ন তাপমাত্রায় মাংস এবং মাংসজাত দ্রব্য সংরক্ষণ করা উচিত। নিচে মাংস এবং কিছু মাংসজাত দ্রব্যের তাপমাত্রা এবং সংরক্ষণকাল দেওয়া হলো–

মাংস এবং মাংসজাত দ্রব্য	১-৪° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণকাল	-১৮° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণকাল
গরু মহিষ ছাগল ভেড়া	২-৪ দিন	৬-১২ মাস
গরু মহিষের মাংসের কিমা ছাগল ভেড়া	১-২ দিন	৬-৮ মাস
মাংসের কিমা	১-২ দিন	১-৩ মাস
যেকোনো ধরনের মাংসের সসেজ	১ সপ্তাহ	২ মাস
ধূমায়িত সসেজ	১ সপ্তাহ	২ মাস
ধূমায়িত গরুর মাংস	১ সপ্তাহ	২ মাস
কর্নড বিফ	১ সপ্তাহ	২ মাস
রান্না করা মাংস	৪-৫ দিন	২-৩ মাস
বিরিয়ানি বা মাংসের তৈরি অন্য শুকনো খাবার		
অন্যান্য শুকনো খাবার		৩-৪ মাস

৫.২ কিউরিং ও স্মোকিং বা ধূমায়িত পদ্ধতিতে মাংস সংরক্ষণ :

কিউরিং পদ্ধতি

কিউরিং একটি পদ্ধতি যা প্রয়োগে খাদ্যের (এখানে মাংস) সংরক্ষণ, ফ্লেভার, কালার ও নরম অবস্থা সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। মাংসতে কিউরিং পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে মাংসের সংরক্ষণকাল বেড়ে যায়, চমকপ্রদ ফ্লেভার তৈরি হয় এবং রান্নার পরেও মাংসের লাল বর্ণ বজায় থাকে।

নিম্নলিখিতভাবে কিউরিং করা হয়–

১. সোডিয়াম ক্লোরাইড, যা মধ্য সারির সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে এবং মাংসে ফ্লেভার যোগ করে।
২. সোডিয়াম নাইট্রেট অথবা সোডিয়াম নাইট্রাইট যা মাংসের সুন্দর ফ্লেভার যোগ করে, সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে, বটুলিনামবিরোধী কাজ করে এবং মাংসের লাল বর্ণ ঠিক রাখে।
৩. চিনি, যা ফ্লেভার যোগ করে এবং মাংসের কালারে স্থিতিশীলতা আনয়ন করে।
৪. মসলা যা সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে এবং ফ্লেভার যোগ করে।

বাজারে এসব উপাদান সহজেই বাণিজ্যিকভাবে পাওয়া যায়।

স্মোকিং বা ধূমায়িতকরণ পদ্ধতি

কিউরিং করার পর সাধারণত মাংসকে ধূমায়িত করা হয়। পূর্বে ধূমায়িতকরণকে সংরক্ষণকারী পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করা হতো; বর্তমানে এটি মাংসে ফ্লেভার যোগ করার মাধ্যম হিসেবে ব্যাবহৃত হয়। পূর্বে বড় ধোঁয়া যোগকারী মাধ্যমের উপরে মাংসকে ঝুলিয়ে রেখে ধোঁয়া প্রয়োগ করা হতো। ধোঁয়া কক্ষ যদি ব্যবহার হয় সেখানকার তাপমাত্রা হওয়া উচিত ৫৭^{o} সে. যাতে মাংসের ভেতরের তাপমাত্রা পাওয়া যায় ৫২^{o} সে. ধূমায়িত করতে সময় লাগতে পারে ১৮-২৪ ঘণ্টা। বর্তমানে তরল ধোঁয়া পাওয়া যায় যা ধোঁয়া থেকে সংগ্রহ করা হয়। এটি ধোঁয়ার পরিবর্তে সরাসরি মাংসে ব্যবহার করা হয়।

৫.৩ মাংস সংরক্ষণে ক্যানিং বা টিনজাতকরণ পদ্ধতি :

মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হলো ক্যানিং বা টিনজাতকরণ। উপযুক্তভাবে টিনজাতকৃত মাংস কয়েক বছর পর্যন্ত ভালো অবস্থায় থাকতে পারে। যেহেতু এক্ষেত্রে বোতল বা টিনের পাত্রে মাংসভর্তি করে তাপ প্রয়োগ করা হয়, আবার ঢাকনা লাগিয়ে সিল করে দিয়ে আবার তাপপ্রয়াগ করা হয় সেহেতু ক্যানের মাঝে অণুজীব, এনজাইম সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং বায়ু সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয়। মাংস টিনজাতকরণের বিভিন্ন ধাপ নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. **নির্বাচন :** সুস্থ মাংসল পশু যাদের বয়স খুব বেশি নয় এমন পশু নির্বাচন করা হয়।
২. **জবাই করা :** উত্তম নিয়মে জবাই করে, চামড়ামুক্ত করে পশুর মাংসকে আকাঙ্ক্ষিত আকারে টুকরো করা হয়। চর্বি, হাড় কলিজা, বৃক্ক, মস্তিস্ক পরিহার করা হয়।

৩. **ধৌতকরণ :** মাংস উত্তমরূপে পরিষ্কার পানিযোগে ধুয়ে নেওয়া হয় ও চাপে পানি বের করে নেওয়া হয়।

৪. **ক্যানে ভর্তিকরণ :** মাংস দ্বারা ক্যান সাজিয়ে ভর্তি করা হয়। যাতে ক্যানের উপরের দিকে এবং মাংসগুলোর মাঝে সামান্য খালি জায়গা থাকে।

৫. **দ্রবণ যোগকরণ :** ২% লবণ ও ২% চিনির দ্রবণ এমনভাবে ক্যানে যোগ করা হয় যাতে ক্যানের উপরের দিকে সামান্য খালি জায়গা থাকে যা মাথার পরিসর (Head Space) অংশ হিসেবে পরিচিত।

৬. **একজসটিং :** ফুটন্ত পানিতে ক্যানের ২/৩ অংশ ডুবিয়ে অথবা বাষ্পের সাহায্যে তাপ প্রয়োগ করা হয় (প্রায় ১০ মিনিটকাল)। এ প্রক্রিয়ায় ক্যানের ভিতর থেকে বায়ু সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয়।

৭. **ঢাকনা লাগানো :** একজসটিং করার পরপরেই ঢাকনা লাগিয়ে সম্পূর্ণ বায়ুরোধী করে সিল করে দেয়া হয়।

৮. **স্টেরিলাইজেশন :** সিল করা ক্যান প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা যাবত ১২১° সে. তাপমাত্রায় স্টেরিলাইজেশন করা হয়।

৯. **ঠাণ্ডা করা :** এরপর ক্যান দ্রুত ঠাণ্ডা করা হয়।

১০. **লেবেল লাগানো :** ঠাণ্ডা ক্যানে লেবেল লাগানো হয়।

১১. **গুদামজাতকরণ :** সবশেষে ক্যান বিক্রির উদ্দেশ্যে নিম্ন তাপমাত্রায় গুদামজাত করা হয়।

৫.৪ ফ্রিজ ড্রাইং পদ্ধতিতে মাংস সংরক্ষণ :

খাদ্যদ্রব্য শুষ্ককরণের এই পদ্ধতিতে ফ্রিজিং এবং ড্রাইং একই সাথে এবং পর্যায় ক্রমিকভাবে করা হয়ে থাকে। খাদ্যদ্রব্যে উপস্থিত জলীয়কণার ৫০% ভাগ শুষ্ককরণ পদ্ধতিতে এবং বাকি জলীয়কণা হিমায়ন পদ্ধতিতে বরফে পরিণত করার পর তাতে নিম্নচাপের কোন প্রকোষ্ঠে রেখে কম তাপমাত্রায় (৪৩° সে.) উর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়ায় অপসারণ করে শুষ্ক করার পদ্ধতিকে ফ্রিজ-ড্রাইং করা হয়। এর সুবিধাগুলি নিম্নরূপ :

১. দ্রব্যের গুণগত মান ভালো থাকে।

২. দ্রব্য পুড়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে না।

৩. স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণের কোনো পরিবর্তন হয় না।

৪. পুষ্টিমানেরও কোনো পরিবর্তন হয় না।

পদ্ধতি

এ ক্ষেত্রে মাংসের টুকরাকে প্রথমে কুইক ফ্রিজিং এর মাধ্যমে হিমায়িত করে বা জমিয়ে ৪৩° সে. তাপমাত্রার একটি প্রকোষ্ঠে রেখে তাকে ৪ মি.মি. পারদচাপে বায়ুশূন্য করা হয়। এতে করে জমানো বরফ উর্ধ্বপাতন

প্রক্রিয়ায় কঠিন অবস্থা থেকে সরাসরি বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হয়। অর্থাৎ মাংসের টুকরো নিম্নচাপের কারণে কম তাপমাত্রায় শুকিয়ে যায়। এ পদ্ধতিতে ১.৫ সে. মি. পুরু মাংসের ফালিকে ৪ ঘণ্টায় শুকিয়ে তার জলীয় কণার পরিমাণ ২% ভাগে পরিণত করা যায়।

৫.৫ শুকনো খাবার প্যাকেটকরণ :

আমরা জানি যে খাদ্যদ্রব্য শুকনো করার সাথে সাথে পানির পরিমাণ যতই কমতে থাকে এটি ততই পানিগ্রাহী বা Hygroscopic হয়। অর্থাৎ চারপাশের বাতাস থেকে জলীয়কণা গ্রহণ করার প্রবণতাও বেড়ে যায়। কাজেই ঐ অনাকাঙ্ক্ষিত জলীয়কণা রোধের জন্য সুষ্ঠু প্যাকেজিং-এর প্রয়োজন হয়। নতুবা খাদ্যে জলীয়কণার পরিমাণ বেড়ে অনুজীব জন্মানোর আশঙ্কা সৃষ্টি হয় এবং তা খাদ্যের গাঠনিক বৈশিষ্ট্যগুলো নষ্ট করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাদ্য জমাট বেঁধে যায়। যেমন তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুতযোগ্য কফি, গুঁড়ো দুধ ইত্যাদি। মচমচে ভাব থাকে না– যেমন বিস্কুট, মুড়ি, চিপস ইত্যাদি। এক্ষেত্রে টিন কনটেইনার, প্লাস্টিক কনটেইনার বা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে প্রস্তুত ব্যাগে প্যাকেট করা হয়ে থাকে। কারণ এসব জলীয় কণা প্রতিরোধক।

৫.৬ কর্নড বিফ (Corned Beef) প্রস্তুতকরণ :

এ খাবারটি প্রধানত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং ভালো কোয়ালিটির মাংস থেকে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। তবে প্রতিটি মাংস প্রসেসিং শিল্প প্রতিষ্ঠানে কিন্তু কর্নড বিফ প্রস্তুত করা হয় না। শুধুমাত্র যে সমস্ত কারখানায় বিফ এক্সট্রাক্ট প্রস্তুত করা হয় সেখানেই কেবল কর্নড বিফ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। কারণ কর্নড বিফ প্রস্তুত করার পূর্বে যখন মাংস প্রি-কুক করা হয় তখন তা থেকে ক্রিয়েটিনিন এবং অন্যান্য দ্রবণীয় পদার্থের একটি নির্যাস বেরিয়ে আসে। মাংসের এই নির্যাসকে বিফ-এক্সট্রাক্ট বলে। বিফ-এক্সট্রাক্ট একটি মূল্যবান দ্রব্য। এটি অণুজীব বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে বিভিন্ন ধরনের মিডিয়া প্রস্তুতকরণের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হাড় ছাড়া মাংস এক থেকে দেড় ইঞ্চি পুরু ফালি করে কেটে তাকে প্রি-কুক করে তা থেকে পরিমাণমতো নির্যাস সংগ্রহ করে ঐ মাংসের সাথে ১.৫% ভাগ সোডিয়াম নাইট্রেট যোগ করে পানিসহ ক্যানে ভরা হয়। তারপর পরিমাণমত হেড স্পেস রেখে বায়ুশূন্য করার পর ক্যানের মুখ এমনভাবে বন্ধ করা হয় যেন বাতাস ঢুকতে না পারে।

এ অবস্থায় ক্যান আড়াই ঘণ্টা ধরে ১২১° সে. তাপমাত্রায় প্রসেস করার পর ঠাণ্ডা করে গুদামজাত করা হয়।

৫.৭ মাংস রান্না করার প্রয়োজনীয়তা :

এক সময় ছিল যখন মানুষ রান্না করতে জানত না। তারা যা খেত সবই কাঁচা খেত। এরপর মানুষ যখন ধীরে ধীরে আগুনের ব্যবহার শিখল তখন হঠাৎ একদিন উপলব্ধি করল যে, আগুনে ঝলসানো খাবার বিশেষ করে মাছ-মাংস খেতে নরম ও সুস্বাদু হয়। সেদিন থেকেই তারা রান্নার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারল

এবং খাদ্যদ্রব্যকে সুস্বাদু করতে রান্নার প্রথা প্রচলিত হলো। সেই থেকে আজও মানুষ দেশে দেশে নতুন নতুন পদ্ধতিতে বিভিন্ন স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণের আকষর্ণীয় খাবার প্রস্তুত করেই চলছে। রান্না করা খাবার যে শুধুই সুস্বাদু হয় তাই নয় বরং এর ফলে খাবার হয় নরম, সহজপাচ্য, উপকারী ও মুখরোচক। তাছাড়াও সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে, রান্না করার ফলে খাবার হয় জীবাণুমুক্ত ও নিরাপদ।

৫.৮ মাংস রান্না করার বিভিন্ন পদ্ধতি :

বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাংস রান্না করা হয়ে থাকে। যেমন-

১. অল্প তাপে রান্না করা (Stewing)

২. বেশি তাপে ফুটিয়ে সিদ্ধ করা (Boiling)

৩. ভাপে সিদ্ধ করা (Steaming)

৪. আগুনে ঝলসানো (Roasting)

৫. ভাজা (Frying)

১. অল্প তাপে সিদ্ধকরণ :

এ ক্ষেত্রে মাংসকে প্রয়োজনীয় আকারে কেটে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করার পর পানি সহযোগে ১০০° সে. তাপমাত্রার নিচে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করে সিদ্ধ করা হয়। এর প্রধান সুবিধা হলো–

১. মাংসের প্রাকৃতিক গন্ধ বজায় থাকে;

২. পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না;

৩. নরম হয় কিন্তু সংকুচিত হয় না;

৪. প্রোটিন সহজপাচ্য হয়;

৫. পুষ্টিমান বজায় থাকে।

২. বেশি তাপে ফুটিয়ে সিদ্ধ করা :

এ পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা মাংসকে পানি সহযোগে ১০০° সে. তাপমাত্রার উপরে ফুটিয়ে সিদ্ধ করা হয়। এর বৈশিষ্ট্য হলো–

১. ফুটন্ত পানির মাধ্যমে তাপ সহজেই সর্বত্র সমভাবে প্রবাহিত হতে পারে।

২. মাংসপেশির কোলাজেন দ্রবীভূত হয়ে খাবারকে গাঢ় করে, স্বাদ ও গন্ধ বৃদ্ধি করে।

৩. চর্বি গলে যায় বলে খাবার মুখরোচক হয়।

৪. পুষ্টিমান বিশেষ করে ভিটামিন বি ও সি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩. ভাপে সিদ্ধ করা :

এক্ষেত্রে পানি থেকে উৎপন্ন বাষ্পের সাহায্যে মাংসকে উত্তপ্ত করে সিদ্ধ করা হয়। এর জন্য প্রেসার কুকার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যাতে করে উচ্চ চাপে ও কম সময়ে মাংস সিদ্ধ করা যায়। এর সুবিধা হলো :

১. কম সময়ে মাংস সিদ্ধ হয়।

২. খরচ কম পড়ে

৩. প্রেসার কুকারের ভেতরে বায়ুমন্ডলীয় অক্সিজেন থাকে না বলে পুষ্টিমান বজায় থাকে।

৪. পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না

৫. স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট হয় না।

৪. আগুনে ঝলসিয়ে বা সেঁকে রান্না করা :

এ ক্ষেত্রে মাংসকে সরাসরি আগুনের সংস্পর্শে লাগিয়ে ঝলসানো হয়ে থাকে। এর ফলে মাংসের উপরিভাগ পুড়ে যায় এবং সাথে সাথে একটু পোড়া গন্ধ হয়ে থাকে। এটাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য যার কারণে মানুষ আকৃষ্ট হয়। সেঁকা পদ্ধতিতে ওভেনের মাধ্যমে চারদিক থেকে মাংসকে উত্তপ্ত করা হয়। ফলে খাদ্যস্থিত পানি দ্রুত বাষ্পায়িত হয় এবং মাংসের আঁশসমূহ নরম ও আলগা হয়। এক্ষেত্রে মাংসের ধাতব লবণের কোনো অপচয় ঘটে না। তবে ভিটামিনের অপচয় ঘটতে পারে।

৫. ভেজে রান্না করা :

এক্ষেত্রে মাংস পাতলা করে কেটে (১-১.৫ সে.মি. পুরু) তেলে বা চর্বিতে উচ্চ তাপে ভাজা বা ফ্রাই করা হয়। এই পদ্ধতি দুই রকম :

১. অল্প তেলে ভাজা (Pan frying)

২. ডুবন্ত তেলে ভাজা (Deep fat frying)

১. অল্প তেলে ভাজা (Pan frying) :

এক্ষেত্রে ফ্রাইং প্যানে ০.৫ সে.মি. পুরু তেলের স্তরে মাংসের টুকরো ভাজা হয়। মাংস ভাজার সময় তেলের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কারণ এর ওপর নির্ভর করে মাংসের গন্ধ, বর্ণ ও স্বাদের মাত্রা। অল্প তাপে ধীরে ধীরে ভাজলে মাংস পুড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে না কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে সিদ্ধ হয় এবং পরিমিত মাত্রায় স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণের উদ্ভব ঘটে। ফলে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ না করলে মাংস সিদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তার উপরিভাগ পুড়ে যায় যা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই মাংসের টুকরার বর্ণের প্রতি খেয়াল রেখে কিছুক্ষণ পর পর তা উল্টিয়ে উপযুক্ত পরিমাণে ভাজতে হয়।

২. ডুবন্ত তেলে ভাজা (Deep fat frying)

এ ক্ষেত্রে এমন পরিমাণে তেল নেয়া হয় যাতে ভাজার সময় মাংসের টুকরো তেলের মাঝে ডুবে থাকে। এক্ষেত্রেও তেলের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কারণ উচ্চ তাপমাত্রায় মাংসের উপরিভাগ দেখতে ভাজা হয়েছে বলে মনে হলেও তখনও অভ্যন্তরভাগ পুরোপুরি সিদ্ধ হয় না। কাজেই এমন তাপমাত্রায় মাংস ভাজা উচিত যাতে করে মাংসের রং ও গন্ধ আকর্ষণীয় হওয়ার সাথে তা যথাযথভাবে সিদ্ধও হয়।

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কত তাপমাত্রায় খাদ্যে উপস্থিত সব ধরনের এনজাইম ও ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়?

ক. 0^{o} - -১৮^{o} সে. | খ. 0^{o} - ১০^{o} সে.

গ. ১০^{o} - ১২^{o} সে. | ঘ. 0^{o} - ১৮^{o} সে.

২. ফ্রিজ-ড্রাইং পদ্ধতির সুবিধা হলো–

ক. দ্রব্যের গুণগত মান ভালো থাকে | খ. দ্রব্য পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না

গ. স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণের কোনো পরিবর্তন হয় না | ঘ. উপরের সবগুলি।

৩. কোনটি রান্না করার পদ্ধতি নয়?

ক. Frying | খ. Balaching

গ. Boiling | ঘ. Roasting

৪. মাংসকে স্মোকিং বা ধূমায়িত করতে সময় লাগে-

ক. ১০-১২ ঘণ্টা | খ. ১৮-৪৮ ঘণ্টা

গ. ১৮-২৪ ঘণ্টা | ঘ. ১-২ ঘণ্টা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাংস সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।
২. মাংস সংরক্ষণে টিনজাতকরণ পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে লেখ।
৩. শুকনো খাবার প্যাকেট করার মূলনীতি লেখ।
৪. মাংস রান্না করার বিভিন্ন পদ্ধতির নাম লেখ।
৫. মাংস রান্না করার প্রয়োজনীয়তা কী?
৬. অল্প তাপে মাংস রান্না করার সুবিধা কী?
৭. বেশি তাপে ফুটিয়ে মাংস রান্না করার বৈশিষ্ট্য কী?
৮. মাংস ঝলসিয়ে রান্না করার বৈশিষ্ট্য কী?
৯. ভাঁপে সিদ্ধ করা বলতে কী বোঝ? এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
১০. মাংস ভেজে কীভাবে রান্না করা হয়?
১১. অল্প তেলে মাংস কীভাবে ভাজা হয়?
১২. বেশি তেলে মাংস কীভাবে ভাজা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাংস সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
২. মাংস রান্না করার প্রয়োজনীয়তা কী? মাংস রান্না করার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়
ডিম ও ডিমজাত দ্রব্য

৬.১ ডিমের পরিচিতি :

ডিম একটি অতি উত্তম খাবার। একে আদর্শ খাবারও বলা হয়ে থাকে। কারণ এতে প্রায় সব ধরনের প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড, ভিটামিন, ফ্যাট ও মিনারেলস থাকে। তাছাড়াও অন্যান্য খাবারের তুলনায় ডিম আপনা আপনি অধিক সময় ধরে সংরক্ষিত থাকে। তাই সব কিছু মিলিয়ে ডিম দুধের চেয়েও বেশি উপযোগী।

খাদ্য হিসেবে সাধারণত মুরগি ও হাঁসের ডিমই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডিম থেকে নানা ধরনের সুস্বাদু, উপাদেয় ও মুখরোচক খাবার প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। ডিমের তৈরি সব খাবারই তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গন্ধের কারণে আকর্ষণীয় হয়ে থাকে।

৬.২ ডিমের গঠন (Structure of an Egg) :

গঠনের দিক দিয়ে অন্য যেকোনো খাবারের চেয়ে ডিম ভিন্ন ধরনের। একটি পূর্ণ গঠিত ডিমের প্রধান অংশ হলো–

১) খোসা বা (Shell)

২) পাতলা পর্দা বা (Lining Membranes)

৩) ডিমের সাদা অংশ বা (Egg white)

৪) ডিমের কুসুম বা (Yolk)

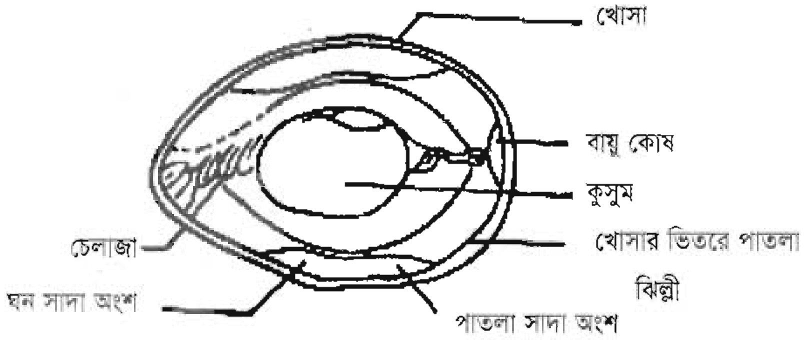

চিত্র : ডিমের অভ্যন্তরীণ গঠন

৬.৩ ডিমের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা :

নিম্নে ডিমের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দেওয়া হলো–

১. ডিমের খোসা বা Shell

খোসা ডিমের প্রাকৃতিক আবরণ হিসেবে কাজ করে। এটা শক্ত মসৃণ এবং অদ্রবণীয় চুনা পাথর জাতীয় পদার্থ দ্বারা তৈরি। তাছাড়াও এতে অল্প পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট এবং কিছু জৈব পদার্থ থাকে।

গঠনের দিক দিয়ে ডিমের খোসা ছিদ্রময় (Porous) হলেও নতুন অবস্থায় এর উপরে এক ধরনের আঠালো পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকার কারণে ছিদ্রসমূহের মুখ অস্থায়ীভাবে বন্ধ থাকে। এতে করে ডিমের ভেতরে কোনো গ্যাসের আদান প্রদান হতে পারে না। তবে ডিম পুরনো হওয়া বা তার বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই আঠালো পদার্থ শুকিয়ে যায় এবং ডিম ছিদ্রযুক্ত হয়ে পড়ে।

ডিম পাড়ার সময় নরম এবং স্বচ্ছ থাকে কিন্তু অল্প সময়ের ভেতরে তা শুকিয়ে অস্বচ্ছ হয়ে যায়। ডিমের খোসা নানা বর্ণের হয়ে থাকে। তবে সাদা এবং বাদামি খোসাই বেশি দেখা যায়। খোসার রং যাই হোক না কেন এর সাথে ডিমের গুণগত মানের কোনো সম্পর্ক নেই। খোসার রং সাধারণত নির্ভর করে মুরগির জাতের ওপরে। এছাড়াও কোনো কোনো ডিমের উপরিভাগ হতে পারে খসখসে বা মসৃণ।

নতুন অবস্থায় ডিমের উপরে আঠালো পদার্থের আবরণ থাকে তাকে মিউসিন বলে। এই মিউসিনের জীবাণু প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে। কাজেই ডিম গুদামজাত করার পূর্বে ধুয়ে পরিষ্কার করা ঠিক নয়। এতে খোসার ছিদ্রমুখ খুলে যায়। ফলে ডিমের ভিতরটা শুকিয়ে যাওয়া ও সেই সাথে জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।

২. পাতলা পর্দা বা (Lining Membranes)

ডিমের খোসার ভিতরের পাশে দুটি পাতলা পর্দা খুব কাছাকাছি থাকে এবং প্রায় সমগ্র ডিম জুড়ে অবস্থান করে। তবে ডিমের মোটা পাশের অল্প জায়গা যেখানে বাতাসের অবস্থান বা Air Space থাকে সেই স্থান বাদে। এই Air Space এর উৎপত্তি প্রধানত ডিম পাড়ার সময় মুরগির শরীরের তাপমাত্রা ও বাইরের তাপমাত্রার তারতম্য ও ডিমের ভিতরের বস্তুসমূহের সংকোচনের ফলেই হয়ে থাকে। উপরের পর্দাকে Outer membrane বা Sheel membrane এবং ভিতরের পর্দাকে ডিমের পর্দা বা Egg membrane বলা হয়। শেল মেমব্রেন খোসার সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে কাজেই তা দেখা যায় না। শুধুমাত্র একটি পর্দাই দেখা যায়। এটাই হলো ডিমের পর্দা। শেল মেমব্রেন কোলাজেন তৈরি এবং তা খোসার সাথে মিশে থাকে।

ডিমের ভোঁতা অংশে একটি Air Space বা ফাঁকা জায়গা থাকে। যে স্থান বাদ এই Air Space-এর আকার এবং আকৃতি নির্ভর করে নিচের বিষয়গুলোর ওপর :

১. খোসার বায়ু প্রবেশ্যতার ওপর

২. খোসার বয়সের ওপর

৩. পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার ওপর

৪. গুদামের আর্দ্রতার ওপর।

৩. ডিমের সাদা অংশ (Egg White)

ডিমের সাদা অংশ প্রধানত পাতলা পর্দা (Egg membrane) থেকে শুরু করে কুসুম (Yolk) পর্যন্ত চারদিকে বিস্তৃত থাকে। এর পরিমাণ ডিমে উপস্থিত বস্তুসমূহের ৬৩% ভাগ। গাঠনিকভাবে ডিমের সাদা অংশ ৩ থেকে ৪টি স্তরে বিভক্ত থাকে। যেমন-

১. বাইরের পাতলা বা তরল অ্যালবুমিন।

২. মাঝের ঘন অ্যালবুমিন স্তর বা স্যাক (Sac)।

৩. ভিতরের পাতলা বা তরল অ্যালবুমিন স্তর।

৪. চ্যালাজা (Chalaza)

চ্যালাজা

এটি মিউসিন দ্বারা তৈরি একধরনের সূক্ষ্ম আঁশ। এই আঁশ মধ্যভাগের ঘন অ্যালবুমিন স্তর হয়ে ডিমের কুসুমের চারদিকে এমনভাবে বিস্তৃত থাকে যে তাতে করে কুসুম সব সময় ডিমের মাঝখানে অবস্থান করে। এর ফলে ডিম ফুটাবার সময় বা তাপমাত্রার সমতা রক্ষার জন্য ডিম ঘুরালেও কোনো ক্ষতি হয় না। ডিমের সাদা অংশকে বলা হয় এগ অ্যালবুমিন। এটি প্রধানত নিম্নলিখিত প্রোটিন দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে। যেমন-

১) ওভা মিউসিন (Ova Meausin) : এ জাতীয় প্রোটিন প্রধানত ডিমে উপস্থিত বিভিন্ন অ্যালবুমিন স্তরের গাঠনিক পার্থক্য সৃষ্টির কাজ করে। এটি সমগ্র প্রোটিনের ১.৯%।

২) ওভা অ্যালবুমিন (Ova Albumin) : এই প্রোটিন পানিতে দ্রবণীয় এবং সমগ্র প্রোটিনের ৫৪%। এটি তাপ প্রয়োগে সহজেই স্বভাবচ্যুত হয়।

৩) কন-অ্যালবুমিন (Con Albumin) : এটা সমগ্র প্রোটিনের ১৩.৮%। এটি ডিমে উপস্থিত লোহার সাথে জটিল যৌগ সৃষ্টি করে এবং তা জীবাণুর জন্য দুষ্প্রাপ্য করে তোলে।

৪) ওভা মিউকয়েড : সমগ্র প্রোটিনের ৯.২%। এটি এন্টি ট্রিপসিন হিসেবে কাজ করে।

৫) লাইসোজাইম (Lysozyme) : এটা সমগ্র প্রোটিনের প্রায় ৩.৪%। এটা গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে এবং এন্টি ব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট হিসেবে কাজ করে।

৬) এভিডিন (Avidin) : সমগ্র প্রোটিনের ০.১%। এটি বায়টিনের সাথে জটিল যৌগ উৎপন্ন করে।

৪. ডিমের হলুদ অংশ বা কুসুম (Egg Yolk)

ডিমের হলুদ অংশ বা কুসুম একটি পাতলা আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে যাকে বলা হয় ভেটেলিন মেমব্রেইন। এর কাজ হলো কুসুমকে একত্রে ধরে রাখা। ডিমের হলুদ অংশে অনেক ধরনের প্রোটিন থাকে। যেমন-

১. ফসভিটিন (Phosvitin)-এটা ফসফো প্রোটিন।
২. লাইপোভিটেলিন (Lipovitellins)-এটা লাইপো প্রোটিন
৩. লিভেটিন (Livetin)- এটা গ্লাইকো প্রোটিন।

ডিমের হলুদ অংশের লিপিড (Fats and Oils) : ডিমের হলুদ অংশে সাধারণত ৩১% লিপিড থাকে। যেমন-

১. ট্রাই গ্লিসারাইডস (৬৬%)।
২. ফসফোলিপিড (২৮%)।
৩. কোলেস্টেরল (৫%)।

এবং আরও কিছু লিপিড আছে যাদের পরিমাণ খুবই কম থাকে। তবে কুসুমের লিপিড অতিমাত্রায় অসম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তা সহজেই জারিত হয়ে খারাপ গন্ধের সৃষ্টি করে। ডিমের কুসুম সাধারণত জ্যানথোফিল, ক্যারোটিন এবং ক্রিপটোজ্যানথিন এর উপস্থিতির কারণে হলুদ হয়ে থাকে।

৬.৪ ডিমের গাঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন অংশের কাজ :

নিচে একটি ডিমের গাঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন অংশের কাজ বর্ণনা করা হলো–

ডিমের খোসার কাজ

১. খোসার অভ্যন্তরীণ বস্তুসমূহকে ধারণ করা।
২. বাহ্যিক চাপ প্রতিরোধ করা।
৩. এমন পরিমাণ ছিদ্রের ব্যবস্থা করা যেন বাচ্চার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস আদান প্রদান করতে পারে।
৪. এমন আকার এবং আকৃতির ছিদ্র থাকা যেন জীবাণু প্রবেশ করতে না পারে।
৫. বাচ্চার বৃদ্ধির জন্য কিছু প্রয়োজনীয় লবণ সরবরাহ করা।

ডিমের পাতলা পর্দার কাজ : শেল মেমব্রেন কোলাজেন তৈরি করে এবং তা খোসার সাথে মিশে থাকে।

ডিমের সাদা অংশের কাজ

১. ডিমের বীজকে ঝাঁকুনির হাত থেকে রক্ষা করে।
২. কুসুমকে ডিমের মাঝখানে ধরে রাখে।
৩. ভ্রুণকে প্রয়োজনীয় জলীয় কণা সরবরাহ করে।
৪. জীবাণু আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ডিমের হলুদ অংশের কাজ : বাচ্চা উৎপাদনের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান হলুদ অংশ ধারণ করে।

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নতুন অবস্থায় ডিমের উপর যে আঠালো আবরণ থাকে তাকে কী বলে?

ক. মিউকর খ. মিউসিন

গ. মিথেন ঘ. মিউটেশন

২. ডিমের ভিতরের পর্দাকে বলা হয়।

ক. শেল মেমব্রেন খ. এগ মেমব্রেন

গ. চ্যালাজা ঘ. কোনোটিই সত্য নয়

৩. ডিমের শতকরা কত ভাগ সাদা অংশ?

ক. ৫০ ভাগ খ. ৬৩ ভাগ

গ. ৭৫ ভাগ ঘ. ৪০ ভাগ

৪. ডিমের সাদা অংশকে কী বলা হয়?

ক. এভিডিন খ. লিভোডিন

গ. অ্যালবুমিন ঘ. ক্যারোটিন

৫. চ্যালাজা কিসের দ্বারা তৈরি?

ক. কোলোজেন খ. মিউসিন

গ. ট্রিকসিন ঘ. ট্যারামাইসিন

৬. ডিমের কুসুমের উপর যে পাতলা পর্দা তাকে কী বলে?

ক. এস মেমব্রেন খ. শেল মেমব্রেন

গ. ভেটেলিন মেমব্রেন ঘ. কোনোটিই সত্য নয়।

৭. সাধারণত একটি ডিমের কোন দিকে ফাঁকা জায়গা বা Air Space থাকে?

ক. ডিমের মাঝামাঝি অংশে খ. ডিমের সাদা অংশে

গ. ডিমের অভ্যন্তরে ঘ. ডিমের ভোঁতা অংশে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ডিমকে আদর্শ খাবার বলা হয় কেন?

২. একটি ডিমের প্রধান অংশ কী?

৩. সংক্ষেপে ডিমের খোসার বর্ণনা লেখ।

৪. ডিমের খোসার কাজ কী?

৫. ডিমের পর্দা বলতে কী বুঝায়? এর কাজ কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ডিমের সাদা অংশের বিভিন্ন গাঠনিক উপাদানের বর্ণনা দাও।

২. ডিমের হলুদ অংশের বিভিন্ন গাঠনিক উপাদানের বর্ণনা দাও।

সপ্তম অধ্যায়
ডিমের পুষ্টিমান

৭.১ ডিমের পুষ্টি উপাদান :

ডিম একটি শরীর রক্ষাকারী খাবার। এতে প্রায় সব ধরনের প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল এবং ফসফোলিপিড সুষম অবস্থায় থাকে। তাই মা ও শিশুর জন্য এটি একটি উত্তর খাবার। মানুষের জন্য উপকারী সব ক'টি অ্যামাইনো অ্যাসিড এতে থাকার কারণে ডিমকে অন্যান্য খাবারের প্রোটিন ভ্যালু নির্ণয়ের মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সর্বোপরি এটি একটি আদর্শ খাবার।

ডিমের ফ্যাট

ডিমে যে তেল বা চর্বি থাকে তা সহজেই হজম হয় এবং তাতে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস এবং প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড থাকে। এটি ফ্যাটি অ্যাসিড তেল বা চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন "এ" এবং "ডি" কে বহন করে। ফসফলিপিড যেমন- লেসিথিন, সেফালিন এবং স্ফিংগোমাইলিন ইমালসিফাইং এজেন্ট হিসেবে সালাদ ড্রেসিং আইসক্রিম, মেয়োনেজ, বেকারি ক্রিম ইত্যাদি প্রস্তুত করতে লাগে।

ভিটামিন

ডিমে প্রধানত ভিটামিন "এ" এবং এবং "ডি" এবং রিবোফ্লাভিন প্রচুর পরিমাণে থাকে। মাছের তেলের পরেই ভিটামিন "ডি" এর বৃহত্তম উৎস হলো ডিম।

মিনারেল

ডিমে প্রচুর আয়রন থাকে এবং তা সহজেই গ্রহণযোগ্য। এছাড়াও ডিমে ফসফরাস, কপার, আয়োডিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম থাকে।

প্রোটিন

প্রোটিনের গুণগত মান নিম্নলিখিত মানদণ্ডে প্রকাশ করা হয় :

১. প্রোটিন ইফিনিয়েন্সি রেশিও (PER)।

২. বায়োলজিকাল ভ্যালু (BV)

৩. ডাইজেস্টিবিলিটি কো ইফিসিয়েন্ট (DC)।

ডিমের প্রোটিন ইফিসিয়েন্সি রেশিও	-	৪.৪
ডিমের বায়োলজিকাল ভ্যালু	-	৯৫
ডিমের ডাইজেস্টিবিলিটি কো-ইফিসিয়েন্ট-		০.৯

যে খাবারে এদের মান যত বেশি সেই খাবার তত ভালো।

৭.২ ডিমের প্রোটিন এফিসিয়েন্সি রেশিও (PER) :

কোনো প্রোটিনের এক গ্রাম খেলে বাচ্চা বয়সের কোনো বাড়ন্ত প্রাণীর শারীরিক ওজন যতটুকু বাড়ে তাকে ঐ প্রোটিনের প্রোটিন এফিসিয়েন্সি রেশিও (PER) বা প্রোটিন দক্ষতা অনুপাত বলে। ডিমের প্রোটিন ইফিসিয়েন্সি রেশিও হলো সবচেয়ে বেশি এবং তার মান = ৪.৪ ।

৭.৩ ডিমের ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য :

যে কোনো ধরনের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতিতেই ডিম ব্যবহার করা যায়। ডিম খাবারের মান বৃদ্ধি করে। খাবারকে মুখরোচক, সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় করে তোলে। এছাড়াও ডিমের অনেক কার্যকরী ধর্ম আছে। যেমন–

১. ডিম নিজে বা অন্য উপাদানের সাথে ফেটলে তা ফুলে ফেঁপে-ওঠে এবং ঐ অবস্থায় দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান করে ও তাপ দিয়ে জমানো যায়। যেমনটি ঘটে কেকের ক্ষেত্রে।
২. ডিমের হলুদ অংশ, সাদা অংশ অথবা সম্পূর্ণ ডিম খুব ভালো ইমালসিফাইং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ তেল এবং পানি একসাথে মিশ্রণ করতে সাহায্য করে। যেমনটি ঘটে মেয়োনেজ প্রস্তুতিতে। এক্ষেত্রে তেল থাকে ৬৫% এবং ইমালসিফাইং এজেন্ট হিসেবে শুধুমাত্র ডিম ব্যবহার করা হয়।
৩. ডিম ভাপানো খাবারকে করে মসৃণ, রসালো এবং বিশেষ গাঠনিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।
৪. ভাপানো খাবারের ক্ষেত্রে ডিম জলীয়কণা ধরে রাখতে সাহায্য করে।
৫. ডিম খেতে ভালো। এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গন্ধ আছে। তাছাড়াও বিশেষ বিশেষ খাবারে ডিম আকর্ষণীয় গন্ধের সৃষ্টি করে। যেমন ডিমের পুডিং, বিস্কুট, কেক ইত্যাদি।
৬. ডিম খাবারের রং সুন্দর করে। যেমন ডিমের নুডলস, পুডিং, ডিমের জর্দা, কেক ইত্যাদি।

৭.৪ ডিমের রাসায়নিক গঠন (Chemical Composition of Egg) :

১. খোসা :

ডিমের খোসার রাসায়নিক উপাদান হলো–

ক. $CaCO_3$	৯৩.৭০%
খ. $MgCO_3$	১.৩৯%
গ. P_2O_5	০.৭৬%
ঘ. জৈব পদার্থ	৪.১৫%

২. ডিমের হলুদ অংশ :

ক. পানি	৫১%
খ. ফ্যাট	৩০.৬%
গ. প্রোটিন	১৬.০%

৩. ডিমের সাদা অংশ :

এতে থাকে

ক. পানি	৮৭.৬%
খ. প্রোটিন	১০.৯%
গ. গ্লুকোজ	০.৫%

৪. ডিমের লিপিড :

ডিমের হলুদ অংশে লিপিডের পরিমাণ ৩১% এবং এর মাঝে থাকে-

ক. ট্রাই গ্লিসারাইড	৬৬%
খ. ফসফোলিপিড	২৮%
গ. কোলেস্টেরল	৫%
ঘ. অন্যান্য লিপিড	অল্প পরিমাণে

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ডিমের প্রোটিন ইফিসিয়েন্সি রেশিও (PER) কত?

ক. ৪.৮ খ. ৪.৪
গ. ৮.৪ ঘ. ২.৪

২. ডিমের বায়োলজিকাল ভ্যালু (BV) কত?

ক. ৮০ খ. ৯০
গ. ০.৯ ঘ. ৪.৪

৩. ডিমের ডাইজেস্টিবিলিটি কো ইফিসিয়েন্ট (DC) কত?

ক. ০.৮ খ. ০.৭
গ. ০.৯ ঘ. ০.৬

৪. ডিমকে কোন ভিটামিনের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস হিসেবে ধরা হয়?

ক. ভিটামিন 'এ' খ. ভিটামিন 'সি'
গ. ভিটামিন 'ডি' ঘ. ভিটামিন 'কে'

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ডিমের প্রোটিন ইফিসিয়েন্সি রেশিও (PER) বলতে কী বুঝায়?
২. ডিমে কোন কোন ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে?
৩. প্রোটিনের গুণগতমান কী কী মানদণ্ডে প্রকাশ করা হয়?
৪. ডিমের কোন অংশে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ডিমের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের বর্ণনা দাও।
২. ডিমের ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
৩. ডিমের রাসায়নিক গঠন বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়
দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ

৮.১ দুধের সংজ্ঞা :

সকল স্তন্যপায়ী স্ত্রী প্রাণী তাদের শিশু বাচ্চাদের খাওয়াতে যে তরল পদার্থ প্রদান করে তাকে দুধ বলে, যথা গাভীর দুধ। দুধে প্রায় সব ধরনের খাদ্যোপাদান যথা প্রোটিন, শর্করা, চর্বি, খনিজ লবণ, পানি প্রায় সকল প্রকার ভিটামিন থাকে। শিশুর জন্য দুধ একটি পূর্ণ খাদ্য। গাভীর দুধ ব্যাপকভাবে মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। ডেইরি বিজ্ঞানে দুধ বলতে গাভীর দুধ বোঝায়।

দুধের উপাদান :

গরুর দুধের উপাদান মোটামুটি নিম্নরূপ :

উপাদান	গড় শতকরা হার
পানি	৮৭.৫৫
প্রোটিন	৩.৪০
চর্বি	৩.৬০
ল্যাকটোজ	৪.৭০
খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য	০.৭৫

মায়ের দুধের উপাদান :

উপাদান	গড় শতকরা হার
পানি	৮৭.৪০
প্রোটিন	২.৩০
চর্বি	৩.৮০
ল্যাকটোজ	৬.২০
খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য	০.৩০

দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ :

আধুনিক দুগ্ধ শিল্পে দুধের গুণগত মান ঠিক রাখার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। দুধ সংগ্রহ, পরিবহন, গ্রহণ, পাস্তুরিকরণ, হোমোজেনাইজেশন, ছাঁকন, শীতলীকরণ, হিমায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে দুধের

গুণগত মান ঠিক রেখে দুধ সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করা হয়। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুধের গুণগত মান রক্ষা করে দুধ বাজারজাতকরণ করা হয় বলে পদ্ধতিগুলোকে সার্বিকভাবে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ বলে।
দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপসমূহ–

দুগ্ধ পরিবহন
↓
কারখানায় দুগ্ধ গ্রহণ
↓
কাঁচা দুধ সংরক্ষণ
↓
দুগ্ধ শোধন ও ছাঁকন
↓
ননী পৃথকীকরণ
↓
দুগ্ধ প্রমিতকরণ
↓
স্টেরিলাইজেশন
↓
পাস্তুরিকরণ
↓
ভ্যাকিউয়ামাইজেশন
↓
সমকরণ

দুগ্ধ পরিবহন :

বাংলাদেশে বড় বড় ডেইরি ফার্ম নেই। ছোট ছোট কৃষকের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করে দুগ্ধ পরিবাহক তা হিমায়ন কেন্দ্রে নিয়ে যায়। দুধের মান সঠিকভাবে নির্ণয় করা, সুষ্ঠু ও বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে দুধ সংগ্রহ করা, সুষ্ঠু ভাবে দুধ ট্যাংকে স্থানান্তর করা বা পরিবহন করা, দুধ সুষ্ঠুভাবে গন্তব্য স্থানে পৌছানো ইত্যাদি বিষয়ে দুগ্ধ পরিবাহককে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

কারখানায় দুগ্ধ গ্রহণ :

দুগ্ধ ট্যাংক-ট্রাক কারখানায় পৌছাবার পর পর যান্ত্রিক আলোড়ক দ্বারা দুধ আলোড়ন করা হয়। তারপর ট্রাইটেবল অ্যাসিডিটি পরীক্ষা এবং বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়। অতঃপর দুগ্ধ ট্যাংকার হতে পাম্পের সাহায্যে দুধ খালাস করা হয়। দুধের পরিমাণ যান্ত্রিক মিটারের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়।

কাঁচা দুধ সংরক্ষণ :

কারখানায় সাইলো-টাইপ ট্যাংক এ দুধ সংরক্ষণ করা হয়। কাঁচা দুধ ২ হতে ৪ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়।

দুধ শোধন ও ছাঁকন :

দুধ হতে অদ্রবণীয় ঝুলন্ত দ্রব্য অপসারণ করার জন্য শোধন ও ছাঁকন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। শোধনযন্ত্র হিসেবে সেন্ট্রিফিউজ ব্যাবহার করা হয়। শোধন যন্ত্র ঠাণ্ডা (৪°-১০° সে.) বা গরম (৬০° সে.) দুধ দ্বারা পরিচালনা করা হয়। শোধন যন্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে ঝুলন্ত দ্রব্য জমা হয়। দুধ শোধনের পর ঠাণ্ডা করা হয়।

ননী পৃথকীকরণ :

স্নেহ পদার্থ স্নেহ কণা হিসেবে দুধে থাকে। ননী পৃথকীকরণ যন্ত্র বা ক্রীম সেপারেটরের মাধ্যমে দুধ হতে ননী পৃথক করা হয়। কেন্দ্র বিমুখী শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ননী পৃথকীকরণ যন্ত্রে ননী পৃথক করা হয়। ননী পৃথকীকরণের মাধ্যমে দুধের স্নেহ পদার্থ এর পরিমাণ প্রমিত করা হয়। সরকারি আইন দ্বারা দুধে ন্যূনতম স্নেহ পদার্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। অতিরিক্ত স্নেহ পদার্থ পৃথক করে তা বাজারজাত করা হয়। ননী পৃথকীকরণ যন্ত্রে কেন্দ্র বিমুখী শক্তি প্রয়োগের পর উপরের যে অংশে স্নেহ কণার পরিমাণ বেশি হয় একে ননী বা ক্রিম বলা হয় এবং নিচের যে অংশে এর পরিমাণ কম তাকে টান দুধ বা স্কিম মিল্ক বলে। বর্তমানে উন্নত ননী পৃথকীকরণ, শোধন এবং যথাস্থানে পরিষ্কারকরণ ব্যবস্থা সংবলিত একক যন্ত্র বিভিন্ন দুগ্ধ শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দুধ প্রমিতকরণ :

বাংলাদেশের উৎপাদিত দুধের স্নেহ পদার্থ গড়ে ৪% এর উপরে থাকে। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী দুধে এর পরিমাণ রাখতে হয় ন্যূনতম ৩.৫% মাত্র। আধুনিক দুগ্ধ শিল্পে প্রধানত তিন উপায়ে দুধ প্রমিত করা হয়।

১. প্রমিতকরণ বা অবিচ্ছিন্ন ননী পৃথকীকরণ যন্ত্র দ্বারা নির্ণেয় স্নেহ পদার্থ অপসারণ করে।
২. দুধের কিছু অংশের স্নেহ পদার্থ সম্পূর্ণ অপসারণ করার পর টানা দুধ সম্পূর্ণ দুধের সাথে মিশিয়ে।
৩. টানা দুধের সাথে ননী মিশিয়ে।
৪. বর্তমানে আধুনিক দুগ্ধ শিল্পে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত দুধ প্রমিতকরণ প্রণালি ব্যবহৃত হচ্ছে। পাইপ লাইনে ক্রিম এবং টানা দুধ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে মিশিয়ে দুধ প্রমিতকরণ করা হয়ে থাকে।

স্টেরিলাইজেশন :

অধিক তাপ ব্যবহার করে কাঁচা দুধকে জীবাণুমুক্ত করা যায়। জীবাণুমুক্ত করার দুটি পদ্ধতি আছে। ১০০° সে. তাপমাত্রায় কোনো দ্রব্য ৩০ থেকে ৬০ মিনিট রাখলে অথবা ১৩০° সে. তাপমাত্রায় অধিক চাপে কোনো দ্রব্য কয়েক মিনিট রাখলেই জীবাণুমুক্ত হয়। কোনো দ্রব্যকে এভাবে জীবাণুমুক্ত করার পদ্ধতিকে

স্টেরিলাইজেশন বলে। দুধকে চাপের সাহায্যে ১৩০° সে. তাপে কোনো সূক্ষ্ম নলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করলেই দুধের অংকুরবাহী জীবাণু ছাড়া অন্য সব জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। ঠাণ্ডা গুদামে জীবাণুমুক্ত দুধ কয়েক সপ্তাহ রাখা যায়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে দুধের স্বাদ ও খাদ্যগুণ নষ্ট হয়।

পাস্তুরিকরণ :

দুধের প্রত্যেক কণাকে (১) ৬২.৮° সেঃ (৪৫° ফা) হতে ৬৫.৫° সে. (১৫০° ফা) তাপে ৩০ মিনিট সময়কাল (নিম্নতাপ দীর্ঘ সময় পদ্ধতি) অথবা (২) ৭২.২° সে. (১৬১° ফা) তাপে ১৫ সেকেন্ড (উচ্চতাপ সংক্ষিপ্ত সময় পদ্ধতি অথবা (৩) ১৩৭.৮° সেঃ ২ সেকেন্ড সময়কাল (অতিতাপ স্বল্প সময় পদ্ধতি) রেখে সঙ্গে সঙ্গে ৪° সে. তাপে ঠাণ্ডা করলে দুধের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ও এনজাইমসমূহ ধ্বংস হয় এবং দুধের গুণাগুণ স্বাভাবিক অবস্থার কাছাকাছি থাকে। এই পদ্ধতিকে দুধের পাস্তুরিকরণ বলে। দুধ সংরক্ষণের এই পদ্ধতি আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য। ইউরোপ ও আমেরিকায় এই পদ্ধতি বাধ্যতামূলক।

পাস্তুরিকরণের সুবিধা :

১. পাস্তুরিকৃত দুধে রোগ উৎপন্নকারী জীবাণু ধ্বংস হয় বলে এটি সম্পূর্ণ নিরাপদ।
২. দুধকে পাস্তুরিকৃত করলে এর সংরক্ষণকাল দীর্ঘ হয়।
৩. এই পদ্ধতিতে ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রস্তুতকারী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা অনেক কমে যায়।
৪. পাস্তুরিকৃত দুধের এনজাইমসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বলে এর সংরক্ষণকাল বেড়ে যায়।
৫. পাস্তুরিকৃত দুধে ব্যাকটেরিয়া গণনা ৯৯% কমে যায়।
৬. পাস্তুরিকৃত দুধে পুষ্টিমান ঠিক থাকে এবং কোনো বিস্বাদেরও সৃষ্টি হয় না।

পাস্তুরিকরণের অসুবিধাসমূহ :

১. পাস্তুরিকরণের প্রক্রিয়া আদর্শ উপায়ে করতে না পারলে অতিরিক্ত আলোড়নে ননী পৃথক হতে পারে।
২. তাপে সংবেদনশীল ভিটামিনসমূহ এবং কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড নষ্ট হতে পারে।
৩. উচ্চতাপে তাপজনিত বিস্বাদ সৃষ্টি হতে পারে।

ভ্যাকিউয়ামাইজেশন :

দুগ্ধ কারখানায় ভ্যাকিউয়াম বা বায়ুশূন্যকারী পদ্ধতিতে দুধ হতে উদ্বায়ী দুর্গন্ধ দূর করা হয়। এই পদ্ধতিকে ভ্যাকিউয়ামাইজেশন বা বায়ুশূন্যকরণ পদ্ধতি বলে।

সমকরণ :

সমকরণ যন্ত্রের সাহায্যে দুধের বড় আকারের স্নেহকণাগুলোকে (২ হতে ৬ মিলি মাইক্রন) ভেঙ্গে অতি ছোট আকারে দুধের সাথে ভালোভাবে মিশানোর পদ্ধতিকে সমকরণ বলা হয়।

সমকরণের সুবিধা :

১. উক্ত পদ্ধতিতে স্নেহ কণা সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত হয় এবং সারা দুধে সমানভাবে বিস্তৃত থাকে।

২. সমকরণে দুধের স্বাদ বৃদ্ধি পায়।

৩. সমকরণে দুধের রং উন্নত হয়।

৪. সমকৃত দুধ সহজে হজম হয়।

সমকরণের অসুবিধা :

১. সমকরণ যন্ত্র খুবই ব্যয়বহুল।

২. যন্ত্রপাতি ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের অতিরিক্ত উৎস হতে পারে।

৩. গারবার পদ্ধতিতে স্নেহ পদার্থের পরিমাণ কম দেখায়।

৪. সমকৃত দুধের সংরক্ষণ কাল অতি অল্প।

৫. অবিক্রীত সমকৃত দুধের সুষ্ঠু ব্যবহার সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

দুগ্ধ শীতলীকরণ ও হিমায়ন :

শূন্য হতে ৪° সে. তাপে খুব কম সংখ্যক ব্যাকটেরিয়াই বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য শীতলীকরণ ও হিমায়িতকরণের মাধ্যমে সংরক্ষিত করা হয়। নিম্ন তাপমাত্রায় দুধ ভালো থাকে।

দুধের মাধ্যমে রোগ বিস্তার ও প্রতিরোধ :

পুষ্টি বৃদ্ধিতে দুধ যেমন বিশেষ ভূমিকা পালন করে তেমনি রোগ বিস্তারেও দুধ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। দুগ্ধ বাহিত রোগের মধ্যে টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, সেপ্টিক সোর থ্রোট, ডিপথেরিয়া ও স্টারলেট ফিভার উল্লেখযোগ্য। যক্ষ্মা রোগও কোনো কোনো সময় গাভী হতে মানুষের মাঝে সংক্রমিত হতে পারে। গো যক্ষ্মা জীবাণু মানুষের শরীরেও যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য যক্ষ্মা জীবাণু যেন দুগ্ধে না থাকতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

স্ট্যাফাইলো কক্কাস নামক জীবাণু দুগ্ধে বা খাদ্যে থাকলে এক ধরনের টক্সিন প্রস্তুত করে। এ দুধ পান করলে অস্বাভাবিক পরিমাণে পায়খানা, বমি ও পেট ব্যথা হয়। যাতে এই জীবাণু দুধের ভেতরে বংশ বিস্তার করতে না পারে সেই জন্য দুধের জীবাণু ধ্বংস করার ব্যবস্থা নেওয়া এবং দুধকে হিমাগারে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

এক প্রকার রক্তক্ষয়ী স্ট্রেপটোকক্কাস জীবাণু দ্বারা দূষিত দুধের মাধ্যমে গলাদাহ বা সোর থ্রোট রোগ হতে পারে। স্ট্রেপটোকক্কাস পায়োজেনেসে নামক জীবাণু দ্বারা দূষিত দুধের মাধ্যমে স্কারলেট ফিভার হতে পারে। কোরাইনি ব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরিই নামক জীবাণু দ্বারা দূষিত দুধের মাধ্যমে ডিপথেরিয়া রোগ হতে পারে। সালমুনেলা নামক জীবাণু দ্বারা দুধ দূষিত হলে প্যারাটাইফয়েড রোগ সংক্রমিত হতে পারে। আমাশয় রোগের জীবাণু দ্বারাও দুধ দূষিত হয়ে আমাশয় রোগের সৃষ্টি করতে পারে। ক্লসট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেন্স এবং

প্রোটিয়াস ভলগারিস নামক জীবাণু দ্বারা দূষিত দুধ পান করলে শিশুর ভয়ানক দাস্ত ও পেটের পীড়া হতে পারে। দুগ্ধ পরিশোধন এবং জীবাণু ধ্বংস করার ব্যবস্থাসমূহ অনুসরণ করে দুগ্ধবাহিত রোগ বিস্তার প্রতিরোধ করা যায়। উচ্চ চাপ, বিকিরণ ও রাসায়নিক বিশোধনের মাধ্যমে দুধের জীবাণু ধ্বংস করা হয়।

দুধের বিনষ্টতা (Spoilage of Milk) :

দুধ অতি পচনশীল দ্রব্য। বিভিন্ন কারণে দুধ নষ্ট হয়। জীবাণু তার মধ্যে অন্যতম কারণ। দুধে জীবাণুর প্রবেশ বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। যথা :

১. গরুর ওলানে রোগাক্রান্ত গরুর দুধ জীবাণু পূর্ণ হয়ে থাকে। সুস্থ গরুর দুধও সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত নয়। ওলান ফুলা রোগে আক্রান্ত গরুর দুধে এবং অগ্র দুধে জীবাণুর সংখ্যা অনেক বেশি হয়। রোগাক্রান্ত গাভীর দুধ এবং অগ্রদুধ বর্জন করা উচিত।

২. সিক্ত দোহন দ্বারা এবং গাভীর বহিরাংশ বিশেষ করে ওলান, পাঁজর ও পশ্চাৎভাগ হতে ময়লা দুধের সাথে সংমিশ্রণ ঘটলে দুধ জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। সিক্ত দোহন পরিহার করে ছোট মুখ বিশিষ্ট বালতি ব্যবহার করে ওলান ও বাট ভালোভাবে ধৌত করে ও মুছে, গাভীর পশ্চাৎ ভাগের লোম কিছু দিন পর পর ছেঁটে জীবাণুর সংক্রমণ এড়ানো যেতে পারে।

৩. গো-শালার বাতাস ও ধুলাবালি হতে জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। গোশালার চারদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ধুলাবালি মুক্ত রেখে জীবাণুর সংক্রমণ কমানো যেতে পারে।

৪. দূষিত পানি সরবরাহ থেকে দুধে জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। দুগ্ধ খামারে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. মাছি ও ইঁদুর জাতীয় প্রাণী থেকে জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। দুগ্ধ খামারের আশপাশে মাছি ইত্যাদি দমন করে, দুধ মাপার কক্ষ ও দোহন কক্ষে জাল দ্বারা আবৃত রেখে, খামারে ইঁদুর তেলাপোকা ইত্যাদি ধ্বংস করে দুধে জীবাণুর সংক্রমণ পরিহার করা যেতে পারে।

৬. দোহনকারী হতে দুধে জীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে। দোহনকারীর হাত, মুখ, শরীর, মাথা, নাক, কাপড়- চোপড় ইত্যাদি পরিষ্কার রেখে দুধে জীবাণুর সংক্রমণ এড়ানো যেতে পারে।

৭. দুগ্ধ পাত্রের মাধ্যমে জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। দুগ্ধ পাত্র সঠিক নিয়মে ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। দুধ ছাঁকার সময় বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

দুগ্ধ বিনষ্টতার চারটি স্তর পরিলক্ষিত হয়ে থাকে–

প্রথম স্তর : দুগ্ধ দোহনের প্রথম ৮-৬ ঘণ্টা পর্যন্ত জীবাণু বিশেষ বৃদ্ধি পায় না।

দ্বিতীয় স্তর : দুগ্ধ দোহনের ৪/৬ ঘণ্টা পর স্ট্রেপটোকক্কাস ল্যাকটিস জীবাণু দ্রুত বৃদ্ধি পায়। দুধ জমে যায়। লেকটিক অ্যাসিড ও মুক্ত অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। ক্যালসিয়াম কেজিনোজিনেটের সাথে লেকটিক অ্যাসিড ক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম অকটেট তৈরি হয়। এরূপে টক দধি, পনির ইত্যাদি প্রস্তুত করা যায়।

তৃতীয় স্তর : অ্যাস্তরে কেজিন জমে যায়। মুক্ত অ্যাসিডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। ল্যাকটিক এসিড জীবাণুর বৃদ্ধি স্থগিত হয় এবং এদের সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে। ইস্ট, মোল্ড ইত্যাদি সুপ্ত জীবাণুগুলো সক্রিয় হয় এবং বাড়তে থাকে। এস্তরে অম্লত্ব হ্রাস পায় এবং প্রোটিন হজমকারী জীবাণুর জন্ম হয়। এ অবস্থায় দুধ ক্ষারীয় অবস্থায় থাকে।

চতুর্থ স্তর : প্রোটিন হজমকারী জীবাণু বিভিন্ন প্রোটিন বিশ্লিষ্ট করে। ফলে অপ্রীতিকর গন্ধযুক্ত ছানা পানি গঠিত হয়।

দুগ্ধজাত দ্রব্য

দুধ হতে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য তৈরি করা যায়, যা নিচে দেওয়া হলো–

১. দধি বা দৈ বা ইওগার্ট
২. মাঠা
৩. এসিডোফিলাস মিল্ক
৪. মাখন
৫. ঘি বা বাটার অয়েল
৬. পনির
৭. বাষ্পীভূত দুধ বা মিষ্টি ঘন দুধ
৮. শুষ্ক গুঁড়া দুধ
৯. আইসক্রিম
১০. মারজারিন
১১. বিভিন্ন রকমের মিষ্টি ইত্যাদি

৮.২ দই প্রস্তুত :

বাংলাদেশ ও ভারতে দই একটি উৎকৃষ্ট দুগ্ধজাত খাদ্য। এটি জমলে জেলির মতো। চূড়ান্ত দইয়ের ঘনত্ব নির্ভর করে ব্যবহৃত দুধের মান, প্রক্রিয়াহাতকরণ পদ্ধতি ও সময়ের উপর।

নিচে দই তৈরির ধাপগুলো উল্লেখ করা হলো–

ক. দুধ ছেঁকে পাত্রে নিতে হয়।

খ. দুধ প্রাকৃতিকভাবে টক করার জন্য ২৪-২৮ ঘণ্টা রেখে দেওয়া হয়। কোনো কোনো দেশে দুধকে ৩০ মিনিট যাবত তাপ প্রয়োগ করা হয় এবং স্টার্টার কালচার যোগ করতে হয়।

কাঁচা দুধ

৩০ মিনিট পাস্তুরাইজেশন করা হয় | প্রাকৃতিকভাবে টক করা

ইনোকুলেশন ↓ ফারমেন্টেশন ↓ আলাদা আলাদাভাবে পাত্রে ঢালা ↓ তরল দই

আলাদা আলাদাভাবে পাত্রে ঢালা ↓ ইনোকুলেশন ↓ ফারমেন্টেশন (৪২-৪৫° সে.) ↓ জমাট বাঁধা দই

প্রবাহ চিত্র : দই তৈরি

গ. স্টার্টারের মধ্যে Lactobacillus ও Streptococus এবং কিছু Yeast উল্লেখযোগ্য।

ঘ. ফারমেন্টেশনের পর দুধ সরাসরি পানের যোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় অন্যান্য উপাদান যেমন প্রাকৃতিক ফুড কালার, ফ্লেভার ইত্যাদি যোগ করতে হয়। দই তৈরির প্রবাহচিত্র উপরে উপস্থাপিত হলো।

৮.৩ পনির প্রস্তুত :

পনির হচ্ছে একটি ঘনীভূত খাদ্য, যা তরল দুধের প্রায় সব খাদ্য উপাদান বহন করে। পনির সতেজ হতে পারে অথবা পরিপক্ব হতে পারে। দুধকে জমাট বাঁধিয়ে এবং ঘোল বা পানীয় অংশ অপসারণ করে এটি তৈরি করা হয়। দুধ জমাট বাঁধা বিভিন্নভাবে হতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দুধের জমাট বাঁধায় রেনেট ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসিড যোগ করে জমাট বাঁধানো হয়। যেমন এসিটিক এসিড বা ভিনেগার অথবা ভেজিটেবল এনজাইম নির্যাস। চূড়ান্ত পনিরের গুণগত মান নির্ভর করে দুধ জমাট বাঁধায় কী ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর। পৃথিবীতে এক হাজারেরও বেশি ধরনের পনির আছে। কয়েকটি ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সেগুলোকে শ্রেণিবিভাগ করা যায়– যেমন, ফ্যাটের পরিমাণ, দুধের উৎস, জমাটকরণ পদ্ধতি এবং পরিপক্বকরণ বা পরিপক্ব না করা। একটি সাধারণ শ্রেণি বিভাগ যা জলীয় অংশ ভিত্তিতে করা হয়েছে। তা নিচে দেখান হলো :

আর্দ্রতার ভিত্তিতে পনিরের শ্রেণি বিভাগ :

শ্রেণি	জলীয় অংশ (%)	চর্বি (%)	বুনট (texture)	আয়ুষ্কাল
নরম পনির	৪৫-৭৫	৪০ (সর্বোচ্চ)	নরম, ছড়িয়ে দেওয়া যায়।	কয়েকদিন
অর্ধ-শক্ত পনির	৩৫-৪৫	৩৫ (সর্বোচ্চ)	শক্ত থেকে ভঙ্গুর, টুকরা করা যায়।	কয়েক মাস
শক্ত পনির	৩০-৪০	৩০ (সর্বোচ্চ)	বেশ শক্ত, ঘন কখনও দানাদার।	এক বছর বা তার বেশি।

পনির তৈরি (Cheese Making) :

পনির পৃথিবীব্যাপী একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখলকারী দুগ্ধজাত সামগ্রী প্রচলিত ও আধুনিক উভয় পদ্ধতিতেই পনির তৈরি করে হয়ে থাকে। প্রচলিত পদ্ধতিতে পনির তৈরির ধাপগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

ক. পনির তৈরির প্রথম ধাপ হচ্ছে– দুধকে চুলায় নিয়ে তাপ দেওয়া। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুধকে ফুটানো হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৫০° সে. পর্যন্ত তাপ প্রয়োগে দুধকে গরম করা হয়। দুধে তাপ দেয়া না দেয়া, কত তাপমাত্রা ইত্যাদির উপর নির্ভর করবে চূড়ান্ত পনিরের বৈশিষ্ট্য, অণুজৈবিক ক্রিয়া ও ফ্লেভার। যদি তাপ প্রয়োগ করা হয়, তবে পরবর্তী ধাপ শুরুর আগে ঠাণ্ডা করে নিতে হবে।

প্রচলিত পদ্ধতিতে পনির তৈরির ধাপ :

কাঁচা দুধ

↓

পাস্তুরাইজেশন
(৬৩° সেন্টিগ্রেড ৩০ মিনিট ←ঠাণ্ডা করা

↓ জমাট বাঁধা (এসিড অথবা ভেজিটেবল নির্যাস দ্বারা)
↓
পানি ঝরানো
(Draining)

↓ ফারমেন্টেশন (স্টার্টার যোগ করে ৩০ মিনিট রেখে দেওয়া হয়)
↓
জমাট বাঁধা
(৩০° সে. এ রেনেট যোগ করে)

↓
লবণ যোগ করা
↓
মোল্ডে স্থাপন
↓
ফ্রেশ পনির

↓
কাটা ও নাড়াচাড়া করা
↓
পানি ঝরানো
লবণ যোগ করা
(শুষ্ক লবণ : ৩০ গ্রাম/কেজি)
↓
মোল্ডে স্থাপন ও চাপ প্রয়োগ
↓
পরিপক্ককরণ (ripening)
(১২-২০° সে. ৮৫.৫% আঃ আর্দ্রতা)
↓
পরিপক্ক পনির
(Ripened cheese)

খ. দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে-জমাট বাঁধায় এমন পদার্থ বা উপাদান দুধে যোগ করা। এতে দুধের কার্ড আলাদা হয়ে যায়। বর্তমানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তৈরি রেনেট পাওয়া যায় যা প্রচলিত পদ্ধতিতেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

গ. জমাট বাঁধার পর ঘোল থেকে কার্ড তুলে নেয়া হয়। অত্যাধিক জলীয় অংশ থাকার কারণে সফট পনিরের আয়ুষ্কাল খুব কম হয়।

ঘ. কার্ডের সাথে লবণ যোগ করা হচ্ছে পরবর্তী ধাপ। ১০% পর্যন্ত লবণ যোগ করা যেতে পারে। এতে পনিরের আয়ুষ্কাল বেড়ে যায় ও ফ্লেভার বৃদ্ধি পায়। লবণ অণুজীবের জন্য পানির প্রাপ্যতা কঠিন করে বিধায় ইহা একটি সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে।

দুধ জমাট বাঁধায় ব্যবহৃত পদার্থ বা উপাদান

জমাটকারী পদার্থ	ব্যবহৃত হার	ব্যবহারকারী দেশ
ব্রায়োফাইলাম স্টেম (Bryophylum stem)	১ লিটার দুধে ৪টি স্টেম	আফ্রিকা
ক্যালোট্রপিস প্রসেরা (Calotropis procera)	১ লিটার দুধে ২-৮ টি পাতা	বেনিন, নাইজেরিয়া
ব্রমেনিন (আনারস থেকে)	-	ইন্দোনেশিয়া

প্যাপাইন (পেঁপে থেকে)	-	
ল্যাকটিক এসিড (রাসায়নিক আকার)	২-২.৫ গ্রাম/লিটার দুধ	ইন্ডিয়া
সাইট্রিক এসিড অথবা লেবুর রস	দুধে ১-১.৫%	ইন্ডিয়া
রেনেট : ট্যাবলেট, পাউডার অথবা তরল	১ ট্যাবলেট/১০০ লিটার দুধ ১ চা চামচ/৪০ লিটার দুধ ২০-৩০ মিলি/১০০ লিটার দুধ	সারা পৃথিবী
ভিনেগার	২৫ মিলি/লিটার	ফিলিপাইন

পনির যখন কাঁচা দুধ থেকে তৈরি করা হয় FDA-এর মতে, চূড়ান্ত পনির তখন কমপক্ষে ৬০ দিন ধরে পরিপক্বকরণ করা হয়। এটি রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব থেকে পনিরকে রক্ষা করতে পারে।

ঙ. কার্ড থেকে যতদূর সম্ভব পানীয় অংশ ঝরিয়ে ফেলতে হয়। এতে কার্ডের জলীয় অংশ কমে যায়।

চ. কার্ডকে কাঠের মোল্ডে রেখে হাতের সাহায্যে চাপ প্রয়োগ করা হয়। চাপের ভিত্তিতে পাওয়া যাবে অর্ধকঠিন বা কঠিন পনির। এ অবস্থায় প্রাপ্ত পনিরকে ফ্রেশ পনির বলে।

ছ. পনির পরিপক্ব করতে চাইলে ১২-২০° সে. তাপমাত্রায় এবং ৮৫.৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় পরিপক্ব করা হয়। তবে সমাজে পরিপক্ব পনিরের চেয়ে ফ্রেশ পনিরের চাহিদা স্বাদ ও ঘ্রাণের জন্য বেশি হয়ে থাকে।

বিভিন্ন ধরনের পনির তৈরি

চেডার পনির (Cheddar Cheese): পাস্তুরিত দুধ থেকে এটি তৈরি করা হয়। পাস্তুরাইজেশনে অধিকাংশ ক্ষতিকর অণুজীব ও এনজাইম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। চেডার পনির তৈরির ধাপগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

দুধকে স্থির অবস্থায় নিয়ে আসা (setting the milk): পাস্তুরিত সম্পূর্ণ দুধ একটি পাত্রে নেওয়া হয় এবং তাপমাত্রা ৩১° সে.-এ আনা হয়, ল্যাকটিক এসিড সৃষ্টিকারী স্টার্টার *Streptococcus lactis* এর কালচার ১% হারে যোগ করা হয় (দুধের তুলনায়)। এ সময় প্রাকৃতিক রং যোগ করা যেতে পারে। ৩০ মিনিট পর প্রায় ০.২% এসিডিটি দুধে তৈরি হবে এবং তখন রেনেট যোগ করা হয়। মৃদু এসিডিটি রেনেটের জমাট বাঁধানো ক্ষমতা বাড়ায়। দুধ নাড়া বন্ধ করতে হয় এবং দুধকে স্থির হতে দেওয়া হয়। ৩০ মিনিটের মধ্যে সমস্ত পাত্র জুড়ে সুষমভাবে কার্ড উৎপন্ন হবে। এসিড ও রেনেটের কারণে কার্ড স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন হবে, যখন কার্ডে চাপ বা তাপ প্রয়োগ করা হবে।

কার্ড কেটে নেয়া : কার্ড কাটার ছুরি দিয়ে কার্ড ছোট ঘনকের আকারে কেটে নেয়া হয়। পাশ হবে প্রায় ০.২৫-০.৫"। ঘনক যত ছোট হবে, পানীয় অংশ তত দ্রুত বের হবে এবং ফলে পনির তত বেশি শুকাতে থাকবে।

তাপপ্রয়োগ : কেটে নেওয়া কার্ডগুলো স্টীম জ্যাকেটেড পাত্রে নেওয়া হয় ও আস্তে আস্তে নাড়া হয়। সেখানে ৩৮° সে. তাপমাত্রায় ৩০ মিনিটকাল তাপ দেওয়া হয় এবং ৩৮° সে. তাপমাত্রায় প্রায় ৪৫ মিনিট স্থির রাখা হয়। এর ফলে কার্ড থেকে পানীয় অংশ বের হয়ে আসে, এসিড উৎপন্ন হওয়ার হার বেড়ে যায় এবং কার্ডকে আকারে ছোট করে।

পানীয় অংশ বের করা : কার্ডের নাড়া বন্ধ করা হয় এবং স্থির হতে দেওয়া হয়। পাত্র থেকে পানীয় অংশ কার্ড থেকে বের হতে দেওয়া হয়। সমস্ত পানীয় অংশ বের হয়ে গেলে কার্ডের টুকরাগুলো (১৫ মিনিটকাল) পাকানো (mat) হয়। এ সময় পাত্র গরম থাকবে। কার্ডকে ব্লকের আকারে কেটে নেওয়া হয়। প্রায় ২ ঘন্টা যাবত ব্লকগুলো থেকে পানীয় অংশ বের করে নেওয়া হয়। এ সময় নিঃসৃত পানীয় অংশের এসিডিটি হবে ০.৫-০.৬।

লবণ যোগ করা : ব্লকগুলো মেশিনের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয় যেখানে সেগুলোকে ছোট ছোট টুকরায় কাটা হয় এবং কাটা টুকরাগুলোকে বিছিয়ে রাখা হয় এবং কার্ডের ওজন হিসেবে ২.৫% লবণ যোগ করে মেশানো হয়।

চাপ প্রয়োগ : লবণ যোগ করা টুকরাগুলোকে হাইড্রোলিক প্রেসের সাহায্যে সারারাত ২০ psi চাপ প্রয়োগ করা হয়। চাপ প্রয়োগ নির্ণয় করবে চূড়ান্ত পনিরে কতটুকু আর্দ্রতা থাকবে। এটি পনিরের চূড়ান্ত আকারও প্রদান করে।

পরিপক্বকরণ : এরপর পনিরকে চাপমুক্ত করে ১৬° সে. তাপমাত্রা ও ৬০% আঃ আর্দ্রতাবিশিষ্ট কক্ষে ৩-৪ দিন রাখা হয়। এ সময় বাইরের দিক কিছুটা শুকিয়ে যায়। মোল্ডের জন্ম বা বৃদ্ধি যাতে না হয় সেজন্য ভ্যাকুউম অবস্থায় প্যাকেজিং করা হয়। পনির বাক্সে নিয়ে পরিপক্বকরণের (ripening) জন্য কিউরিং কক্ষে নেওয়া হয় যেখানে তাপমাত্রা থাকবে ২° সে. ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকবে ৮৫%।

৬০ দিন ধরে পরিপক্বকরণের কাজ চলবে। ১২ মাস ও তার বেশি সময় ধরেও পরিপক্বকরণের কাজ চলতে পারে।

কটেজ পনির : কটেজ পনির হচ্ছে স্বল্প চর্বিযুক্ত নরম পনির যাকে ল্যাকটিক এসিড দিয়ে জমাট বাঁধানো হয়। কার্ডে চাপ প্রয়োগ করা হয় না এবং এটা পরিপক্বকরণও করা হয় না। পাস্তুরিত স্কীম মিল্ক থেকে এটা তৈরি করা হয়। ধাপগুলো উল্লেখ করা হলো :

১. পাস্তুরিত স্কীম মিল্ক একটি পাত্রে ২২° সে. তাপমাত্রায় গরম করতে হয়।

২. ১% হারে ল্যাকটিক স্ট্যার্টার যোগ করতে হয়।

৩. পাত্রটি স্থির রাখা হয় ও ১৪ ঘণ্টা যাবত দুধে ফারমেন্টেশন ঘটতে দিতে হয়।

৪. দুধ জমাট বাঁধে ও জমাট বাঁধা দুধ ছোট ছোট ঘনকের আকারে কাটতে হয়।

৫. নাড়াসহ ঘনকগুলোকে প্রায় ৯০ মিনিট তাপ দেওয়া হয়। তাপমাত্রা আস্তে আস্তে ৫০° সে. পর্যন্ত উঠাতে হয়।

৬. এরপর কার্ড থেকে পানীয় অংশ বের করা হয় এবং কার্ডগুলোকে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হয়।

৭. কার্ডে গর্ত করা হয় যাতে সমস্ত পানীয় অংশ বের হয়ে আসে।

৮. সামান্য লবণ যোগ করে মেশানো হয়। লবণ এখানে কিছুটা ফ্লেভার প্রদান করে ও সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে।

৯. মিষ্টি অথবা টক ক্রিম যোগে কার্ড গুলোকে ব্লেন্ডিং করা হয় যাতে ২-৪° চর্বি পাওয়া যায়।

১০. তৈরিকৃত পনির হালকাভাবে মোড়কে ভরা হয়। যেহেতু এটি খুব পঁচনশীল, তাই একে রেফ্রিজারেটরে রাখতে হয়।

সুইস পনির :

এটি একটি শক্ত ধরনের পনির। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বড় গর্ত, অথবা চক্ষু এবং সুমিষ্ট বাদামের মতো ফ্লেভার যা *Propionibacterium shermanii* এর কারণে উৎপন্ন হয়। প্রথমে ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেরিয়া ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন করে এবং উৎপন্ন এই ল্যাকটিক এসিড *Propionibacterium shermanii* দ্বারা ফারমেন্টেশন হয়ে প্রোপায়োনিক এসিড ও CO_2 উৎপন্ন হয়। এই CO_2 গ্যাসের জন্য কার্ডে গর্ত বা চক্ষু উৎপন্ন হয়।

সুইস পনির সাধারণত কাঁচা দুধ থেকে তৈরি করা হয়। স্টার্টার হিসেবে ব্যবহৃত ল্যাকটিক এসিড অণুজীব হচ্ছে *Lactabacillus bulgaricus* এবং তাপ সহিষ্ণু *Streptococcus thermophilus* যারা ৫৩° সে. তাপমাত্রায় ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন করে। প্রাথমিকভাবে ফারমেন্টেশনের পর দুধ জমাট বাঁধাতে রেনেট যোগ করা হয়। জমাটবাঁধা কার্ডকে ধারালো ছুরি দিয়ে ছোট ছোট আকারে কাটতে হয়। এ অবস্থায় কার্ড ও ঘোলসহ ৫৩° সে. তাপমাত্রায় ১ ঘণ্টা ধরে তাপ দিতে হয়। সমস্ত কার্ডকে পুরো একদিন ধরে চাপের মধ্যে রাখতে হয়। কার্ডকে ১০° সে. তাপমাত্রার লবণ দ্রবণে রাখতে হয়। তিনদিন ধরে কার্ডগুলো লবণ দ্রবণে বা ব্রাইনে ভাসতে থাকে। উপরের দিকে মাঝে মাঝে লবণ যোগ করা হয়। লবণ কার্ডের উপরিভাগ থেকে প্রচুর পানি অপসারণ করে। ব্রাইন থেকে তুলে নিয়ে পনিরকে ২১° সে. তাপমাত্রার এবং ৮৫% আঃ আর্দ্রতার কক্ষে পরিপক্বকরণের জন্য প্রায় ৫ সপ্তাহ রাখতে হয়। এ সময়ে পনিরে বড় বড় চক্ষু গঠিত হয়, যার ফলে

পনিরের আকার অনেকটা গোলাকার হয়। এরপর পনিরকে ৭° সে. এর ঠাণ্ডা কক্ষে রাখতে হয় যেখানে এটি ৪-১২ মাস অবস্থান করে এবং সুইস পনিরের পূর্ণ আকার ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।

পনিরের গুণগত মান, সংরক্ষণকাল, উৎপাদন সময়, মূল্য ও ভোক্তাদের রুচি, স্বাস্থ্যবিধি ইত্যাদির বিষয় বিবেচনায় আনলে আরও কয়েক ধরনের পনির তৈরি করা যেতে পারে।

১) ফ্রেশ পনির
২) ইকোলজিক্যাল পনির
৩) রিকোটা পনির
৪) পেস্ট্রি
৫) ক্যামেমবার্ট
৬) প্রসেস পনির।

পনির বা পনির তৈরির জন্য ভালো তাপমাত্রা হচ্ছে ১৫-২০° সে. এবং সংরক্ষণ তাপমাত্রা ১০° সে. এর নিচে হলে ভালো হয়। মনে রাখতে হবে, পনিরের উৎপাদন প্রক্রিয়া খুব সহজ, একটা বিষয় নয়। এখানে কাজের সময় যথেষ্ট যত্নবান ও সতর্কতা প্রয়োজন। উৎপাদনের কোন ধাপে যাতে দুধে অণুজীবের অনুপ্রবেশ ঘটতে না পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। বারবার চেষ্টার পরেই পনিরের গুণগত মান আকাঙ্ক্ষিত মাত্রায় আসতে পারে। নিচে চার ধরনের পনির সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

ফ্রেশ পনির :

ফ্রেশ পনিরের বর্ণ সুন্দর এবং স্বাদও ভালো। এটি কিছুটা স্থিতিস্থাপক, নরম এবং এতে দুধের ফ্লেভার বিদ্যমান। বাণিজ্যিক রেনেট (rennet) ব্যবহার করে এটি তৈরি করা হয়। উৎপন্ন থেকে বিক্রয় পর্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রা বজায় রাখা হয়। সাধারণত পাউরুটির টুকরার মাঝখানে এই পনির লাগিয়ে খাওয়া হয়।

ফ্রেশ পনির তৈরির ধাপ :

১) **দুধ সংগ্রহ :** সুস্থ গাভীর দুধ সংগ্রহ করা হয়। যে গাভী ওলান ফোলা রোগে (mastitis) আক্রান্ত তার দুধ কখনও ব্যবহার করা যাবে না। সংগৃহীত দুধের ঘনত্ব ও এসিডিটি পরিমাপ করতে হয়।

২) **ওজন নেয়া :** সংগৃহীত দুধের ওজন নিতে হয়।

৩) **ছাঁকা :** এরপর দুধ পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিতে হয়। ব্যবহৃত কাপড়, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত করে নেয়া হয়।

৪) **পাস্তুরাইজেশন :** দুধে তাপ দিতে হয় এবং ৬৫° সে. তাপমাত্রায় ৩০ মিনিটকাল তাপ প্রয়োগ করতে হয়। এতে অধিকাংশ ক্ষতিকর অণুজীব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাপ দেওয়ার সময় পাত্র পুরোপুরি খোলা রাখা ঠিক নয়।

৫) **ঠাণ্ডা করা :** পাস্তুরাইজেশনের পর দুধকে ৩৭° সে. তাপমাত্রা পর্যন্ত ঠাণ্ডা করা হয়। দ্রুত ঠাণ্ডা করা পনিরের জন্য ভালো পদ্ধতি। ০.২৫ গ্রাম/লিটার হিসেবে দুধে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) যোগ করে খুব আস্তে আস্তে নাড়তে হয়। এরপর দুধ জমাটকারী পদার্থ যেমন কাইমোসিন ১-৩ গ্রাম/১০০ লিটার হিসেবে ঠাণ্ডা পানিতে অল্প লবণের সাথে মিশিয়ে দুধে যোগ করতে হয়। কাইমোসিন (রেনেট) ও $CaCl_2$ একসাথে যোগ করতে হয় না, কারণ রেনেট জমাট বেঁধে যেতে পারে। $CaCl_2$ দুধে যোগ করলে দুধে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এটি দুধের কেসিনের (casein) সাথে বিক্রিয়া করে যে পদার্থ উৎপন্ন করে (ক্যালসিয়াম কেসিনেট) তা দুধের ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয়। ২১ লিটার দুধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় রেনেটের জন্য ৪ গ্রাম লবণ পানিতে মেশানো হয়েছিল। উপরে রেনেট ব্যবহারের যে হার দেখানো হলো এতে বোঝা যায় তাড়াতাড়ি দুধকে জমাট বাঁধতে চাইলে বেশি পরিমাণে রেনেট যোগ করতে হয়। রেনেটের কার্যকারিতা ঠিক রাখতে নিম্ন তাপমাত্রায় তা সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ফ্রিজিং তাপমাত্রা উত্তম।

৬) **জমাট বাঁধা :** দুধ থেকে ফেনা অপসারণ করতে হয়। ৩০-৪৫ মিনিট দুধকে সুস্থির রাখতে হয়। ভালোভাবে জমার জন্য এক ঘণ্টা পর্যন্ত সুস্থির রাখা যেতে পারে।

৭) **কাটা :** ১ সে.মি. × ১ সে.মি. সাইজে সম্পূর্ণ জমাট বাঁধা দুধকে কাটতে হয়। ভালো মানের পনির পেতে হলে টুকরাগুলোর আকার সুষম হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরপর ৫ মিনিট টুকরাগুলোকে সুস্থির (resting) রাখতে হয়।

৮) **নাড়া :** ১০-১৫ মিনিট ধরে টুকরাগুলোকে খুব আস্তে আস্তে নাড়তে হয়।

৯) **পৃথকীকরণ :** কার্ড (curd) থেকে তরল অংশ (whey) পৃথক করা হয়। এ পর্যায়ে তাপমাত্রা কিছুটা কমে যেতে পারে। তাপমাত্রা ৩৮° সে. এ ধরে রাখতে কিছু পরিমাণ গরম পানি এতে যোগ করতে হয়। তারপর ১৫ মিনিটকাল জোরে জোরে নাড়তে হয়। যদি না নাড়তে হয় তবে টুকরাগুলো পরস্পরের সাথে লেগে যেতে পারে। সংগৃহীত এই জলীয় অংশ রিকোটা পনির (Ricotta cheese) ও বেভারেজ তৈরিতে অথবা প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

১০) **কার্ডে লবণ প্রয়োগ :** এ পর্যায়ে ২.৫% খাবার লবণ কার্ডে যোগ করা হয়ে থাকে। কার্ড থেকে তরল অংশ বের করে নেওয়ার পর যখন কার্ড ও অবশিষ্ট তরল অংশ প্রায় সমপরিমাণ থাকবে তখন কার্ডে লবণ যোগ করা হয়। ২১ লিটার দুধের ক্ষেত্রে ৫০ গ্রাম লবণ যোগ করা হয়েছিল (যেহেতু কার্ড ছিল ২ কেজি)। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত তরল অংশ রিকোটা পনির তৈরির জন্য উপযোগী নয়।

১১) **মোল্ডে নেওয়া ও চাপ প্রয়োগ করা :** ছিদ্রযুক্ত মোল্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে প্রথম ১০ মিনিট পর পনিরকে সম্পূর্ণ ভাবে উল্টিয়ে দেয়া হয়। তারপর ২ ঘণ্টা পর আবার পনিরকে উল্টিয়ে দেওয়া হয় এবং রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করতে হয়। সংরক্ষণ তাপমাত্রা ১২-২০° সে. হলেও চলে, তবে সবচেয়ে ভালো সংরক্ষণ তাপমাত্রা হচ্ছে ১২° সে. এর নিচে।

১২) ২১ লিটার দুধ থেকে যে পনির পাওয়া গিয়েছিল তার পরিমাণ ছিল ২.৫৩০ কেজি অর্থাৎ ৮.৩ লিটার দুধ থেকে ১ কেজি পনির। দুধ আরও ভালো হলে ৭ লিটার দুধ থেকে ১ কেজি পনির পাওয়া সম্ভব।

১৩) **মোড়কীকরণ :** ফ্রেশ পনির মোড়কীকরণের জন্য এমন পলিথিন ব্যবহার করতে হবে যার পুরুত্ব হবে $\geq$ ৩ মাইক্রোন।

ফ্রেশ পনিরের আয়ুষ্কাল হতে পারে সর্বোচ্চ ১৫ দিন। ফ্রেশ পনির তৈরিতে কখনও কৃত্রিম রেনেট ব্যবহার করা ঠিক নয়। প্রাকৃতিক বা বাণিজ্যিক রেনেট ব্যবহার করলে পনির গুণগতভাবে উন্নত হয়।

ইকোলজিক্যাল পনির

পনিরে নতুনমাত্রা যোগ করেছে ইকোলজিক্যাল পনির। এ পনির বিভিন্ন বর্ণের হতে পারে। পনিরে ভেষজ উদ্ভিদ যোগ করতে হয়। সবুজ সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদের পাতা যেমন কারিলিফ, ধনে, পুদিনা ইত্যাদি যোগ করে পনিরের বর্ণ সবুজ করা হয়, তখন তাকে 'সবুজ পনির' (green cheese) বলে। অনেক সময় জিরাও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পনিরের বর্ণ ও স্বাদ উন্নতমানের পেতে হলে ভালোমানের ভেষজ উদ্ভিদ নির্বাচন করতে হয়। তবে যে উদ্ভিদ ব্যবহৃত হবে তা হবে পরিষ্কার ও ত্রুটিমুক্ত।

ইকোলজিক্যাল পনির তৈরির ধাপ :

১) **দুধ সংগ্রহ :** গাভী থেকে সদ্য সংগৃহীত দুধ ব্যবহার করলে পনিরের গুণগত মান উন্নত হয়। গ্রীষ্মকালে দুধের তাপমাত্রা দুধের তাপমাত্রা বেশি তাকে। দুধের তাপমাত্রা ২৫° সে এর নিচে হলে ভালো হয়।

২) **ওজন নেওয়া :** দুধ ওজন করে নিতে হয়।

৩) **ছাঁকা :** পরিষ্কার কাপড় দিয়ে দুধ ছেঁকে নিতে হয়।

৪) **পাস্তুরাইজেশন :** দুধকে ৬৫° সে. তাপমাত্রায় ৩০ মিনিটকাল পাস্তুরিত করতে হয়।

৫) **ঠাণ্ডা করা :** দুধকে ঠাণ্ডা করে ৩৭° সে. তাপমাত্রায় আনা হয় এবং $CaCl_2$ যোগ করে খুব আস্তে আস্তে নাড়তে হয়। তারপর অল্প পরিমাণ লবণ মিশ্রিত ঠাণ্ডা পানির সাথে রেনেট (যেমন কাইমোসিন) মিশিয়ে দুধে যোগ করতে হয়।

৬) **জমাট বাঁধা :** দুধের উপরিভাগ থেকে ফেনা দুর করে ৩০-৬০ মিনিট পর্যন্ত দুধকে সুস্থিতি অবস্থায় রাখতে হয়।

৭) **টুকরাকরণ :** জমাট বাঁধা কার্ডকে ১ সে.মি. × ১ সে.মি. আকারে কাটা হয় এবং ৫ মিনিট সুস্থির রাখতে হয়।

৮) **নাড়া :** ১০-১৫ মিনিটকাল খুব আস্তে আস্তে টুকরাগুলোকে নাড়তে হয়।

৯) **পৃথকীকরণ:** ফ্রেশ পনিরের মত কার্ড থেকে জলীয় অংশ পৃথক করা হয় এবং ৩৮° সে. তাপমাত্রায় জোরে জোরে নাড়তে হয় (১৫ মিনিট)।

১০) **লবণ যোগ করা:** কার্ডের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ২-৩% খাবার লবণ যোগ করতে হয়।

১১) **ভেষজ উদ্ভিদ/মসলা যোগ করা:** ভেষজ উদ্ভিদের পাতা পেস্ট করে অথবা কুচি কুচি করে কেটে যোগ করে মেশানো হয়। কারিলিফ, পুদিনা পাতা ইত্যাদি যোগ করা যেতে পারে।

১২) **মোল্ডে ভরা:** কার্ড চাপ প্রয়োগে মোল্ডে ভরা হয় এবং কিছু সময় পর পর ফ্রেশ পনিরের মতো উল্টিয়ে দিতে হয়।

১৩) **প্যাকেট করা:** পলিথিন কাগজের মোড়কে ($\geq$ ৩ মাইক্রোন) প্যাকেট করা হয়।

১৪) **সংরক্ষণ:** নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়।

রিকোটা পনির (Ricotta Cheese)

ফ্রেশ পনির বা ইকোলজিক্যালপনির তৈরির প্রাক্কালে যে জলীয় অংশ (লবণ যোগ করার পূর্বে) সংগ্রহ করা হয় তা রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা হয় অথবা সরাসরি রিকোটা পনির তৈরিতে ব্যবহার করতে হয়। রিকোটা পনির তৈরির ধাপগুলো অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো-

১) পনিরের জলীয় অংশ সংগ্রহ।

২) জলীয় অংশ যা পনির তৈরিতে ব্যবহৃত হবে তার ওজন নিতে হয়।

৩) ০.১% হারে লবণ যোগ করা হয়।

৪) দুধ ৮৬° সে. তাপমাত্রা পর্যন্ত তাপ দিতে হয়।

৫) ০.০৫ গ্রাম/লিটার হিসেবে সাইট্রিক এসিড দুধে যোগ করে মেশাতে হয়।

৬) এরপর ৩০ মিনিটকাল দুধকে সুস্থির রাখতে হয়।

৭) খুবই আস্তে আস্তে পনির আলাদ করে নিতে হয়।

৮) কাপড়ে পনির নিয়ে প্রায় ১ দিন ঝুলিয়ে রাখা হয় যাতে পানীয় অংশ দূরীভূত হয়।

৯) প্লাস্টিক বোতলে পনির ভর্তি করতে হয়।

১০) ৬° সে. অথবা এর কম তাপমাত্রায় পনির সংরক্ষণ করতে হয়।

এই ধরনের পনিরের উৎপাদন অন্য পনিরের উৎপাদন ব্যয় কমাতে সহায়তা করে। পনিরের বর্ণ ও স্বাদ বেশ আকর্ষণীয়। এ ধরনের পনিরের আয়ুষ্কাল ১০ দিনের বেশি নয়।

পেস্ট্রি পনির (Pasty Cheese)

ইহা এক ধরনের ফ্রেশ পনির। উৎপাদন ধাপগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো–

১) **এসিডিক পনির সংগ্রহ:** ফ্রেশ পনির কক্ষ তাপমাত্রায় ২ দিন অথবা রেফ্রিজারেটরে ৭ দিন রাখা হয় পনিরে এসিড উৎপন্ন হওয়ার জন্য।

২) **টুকরা করা:** এসিডিক পনিরকে ছোট ছোট টুকরায় বিভক্ত করা হয়।

৩) **এসিড দূর করা:** টুকরাগুলোকে কাপড়ে বেঁধে পানিতে ধুয়ে এসিড দূর করা হয়। সাধারণত এ কাজে ১-২ দিন সময় লাগে।

৪) **লবণ যোগ করা:** ২.৫-৩% খাবার লবণ পনিরে যোগ করা হয়।

৫) কিমা তৈরি করার মেশিনে নিয়ে পনিরের পেস্ট তৈরি করা হয়।

৬) তারপর সরাসরি প্লাস্টিক বোতলে ভরতে হয়।

৭) ৮° সে. অথবা এর কম তাপমাত্রায় পনির সংরক্ষণ করা হয়। এ ধরনের পনিরের আয়ুষ্কাল ১০-১২ দিন।

ক্যামেমবার্ট (Camembert)

এটি মোল্ড দ্বারা পরিপক্বকৃত একটি পনির যার উৎপত্তিস্থল ফ্রান্স। এই পনিরের কার্ড হচ্ছে নরম, ক্রিম বর্ণের এবং পুরোপৃষ্ঠে মোল্ডের বৃদ্ধিতে সাদা বর্ণ দেখা যায়। স্টার্টার হিসেবে ব্যবহৃত মোল্ড হচ্ছে *Penicillium camemberti.* ৭° সেঃ তাপমাত্রা ও ৯৫% আঃ আর্দ্রতার কক্ষে পরিপক্বকরণকরা হয়। কিন্তু এর সংরক্ষণ সময় মাত্র ৩ সপ্তাহ। বেশিদিন সংরক্ষিত থাকলে পনির থেকে অ্যামোনিয়ার গন্ধ বের হয়।

প্রসেস পনির:

প্রসেস পনির এমন একটি পনির যা অন্য পনির, অগাঁজনকৃত দুগ্ধ উপাদান, এমালসিফায়ার, বাড়তি লবণ ও খাদ্যে ব্যবহার উপযোগী রঙিন দ্রব্য থেকে তৈরি করা হয়। এ পনিরে অনেক সুঘ্রাণ, বর্ণ ও বুনট বিদ্যমান। আমেরিকায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রসেস পনির 'আমেরিকান পনির' নামে পরিচিত। এর বর্ণ কমলা, হলুদ অথবা সাদা হয়ে থাকে এবং এটি মৃদু ঘ্রাণবিশিষ্ট। এটা মধ্যম থেকে শক্ত গাঢ়ত্ববিশিষ্ট এবং সহজেই গলে যেতে পারে। ইহা সাধারণত একাধিক পনিরের মিশ্রণে তৈরি হয়ে থাকে, বিশেষ করে কলবি ও চেডার পনির ব্যবহার করে।

প্রসেস পনির সম্পর্কে ১৯১১ সারে প্রথম ধারণা দেন সুইস খাদ্যবিজ্ঞানী ওয়াল্টার গার্বার (Walter Garber)। তবে ১৯১৬ সালে জনপ্রিয়ভাবে তুলে ধরেন জেম্‌স এল. ক্র্যাফ্‌ট। প্রথম এর ব্যবসায়িক রূপ প্রদান করা হয় ১৯৫০ সালে এবং সার্থকভাবে এটি ব্যবহৃত হয় চিজবার্গার ও গ্রিল চিজ স্যান্ডউইচ তৈরিতে।

প্রসেস পনির ব্যবহারের সুবিধা : অপ্রসেস পনিররের তুলনায় প্রসেস পনির তৈরির ক্ষেত্রে তিনটি তৈরি কারিগরি সুবিধা বিদ্যমান:

১. আয়ুষ্কাল বেশি।

২. রান্নার সময় পৃথক হওয়াকে বাধা দেয়। এবং

৩. অন্য পনির তৈরির সময় যেসব ছাঁট বা নিঃসৃত পদার্থ বের হয় সেগুলোকে আবার ব্যবহার করার সুবিধা।

অন্য পনির তৈরির সময় উৎপন্ন ছাঁট বা বর্জিতাংশ বিক্রি করা সম্ভবপর নয়। তবে একে প্রসেস পনির তৈরিতে ব্যবহার করলে অবশ্য প্রক্রিয়াজাতকারী কিছুটা আর্থিক সুবিধা পাবেন।

প্রসেস পনিরে ইমালসিফায়ার ব্যবহার করার কারণে রান্নার সময় পনির সুন্দরভাবে গলে যায়। অধিক সময় তাপ প্রয়োগ করলে অপ্রসেস পনির গলিত প্রোটিন জেল ও তরল চর্বি হিসেবে আলাদা হতে থাকে, পক্ষান্তরে প্রসেস পনিরের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে না। পনিরে ব্যবহৃত ইমালসিফায়ারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সোডিয়াম ফসফেট, মনোপটাসিয়াম ফসফেট/পারট্রেট/সাইট্রেট। ইমালসিফায়ার ব্যবহারে গলিত পনিরের উপরিভাগে চর্বিকণার একত্রীভূত হওয়ার প্রবণতা হ্রাস পায়। তাপে প্রসেস পনিরের বুনট ও স্বাদ নষ্ট হয় না বিধায় অনেক খাদ্যে এটি একটি জনপ্রিয় উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রসেস পনিরের নেতিবাচক দিক:

প্রসেস পনিরের ঘ্রাণ অপ্রসেস পনিরের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় একে প্রায়ই সমালোচনায় পড়তে হয়। সাধারণত বুনটের বিভিন্নতা অপ্রসেস পনিরের তুলনায় কম। প্রসেস পনিরের কাঠিন্য মাঝারি। উচ্চমাত্রার লবণ ও কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রব্য থাকায় কেউ কেউ প্রসেস পনিরের সমালোচনা করেন।

মোড়কীকরণ:

প্রসেস পনির কখনো কখনো ব্লক আকৃতিতে বাজারজাত করা হয়ে থাকে, তবে বেশিরভাগ সময় আলাদা আলাদা স্লাইস হিসেবে মোড়কে ভরে বাজারজাত করা হয়ে থাকে। নরম প্রসেস পনিরের কোনো কোনো দেশে (যেমন– আমেরিকা ও ব্রিটেন) পনির হিসেবে বিক্রি করা আইনগত সমস্যা আছে। সেক্ষেত্রে এ ধরনের প্রসেস পনিরের লেবেলে 'পনির ফুড', 'চিজ স্প্রিড' অথবা 'পনির প্রডাক্ট' লিখে বিক্রি করা হয়ে থাকে।

প্রসেস পনির আবার পাস্তুরিত হতে পারে। পাস্তুরিত প্রসেস পনির এক বা একাধিক পনিরের মিশ্রণে তৈরি করা যেতে পারে। এতে ক্রিম, দুধের চর্বি, পানি, লবণ, কৃত্রিম রং এবং মসলা যোগ করা যেতে পারে। ইমালসিফায়ার যোগ করে মিশ্রণকে তাপ দেওয়া হয়, ফর্মায় ঢালা হয় এবং তারপর ঠাণ্ডা করা হয়।

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **ডেইরি বিজ্ঞানে দুধ বলতে কোন প্রাণীর দুধকে বুঝায়?**
ক. ছাগল খ. গাভী
গ. মহিষ ঘ. উট।

২. **গরুর দুধে প্রোটিনের পরিমাণ কত?**
ক. ৩.৪০% খ. ৪.৪০%
গ. ৫.৪০% ঘ. ৬.৪০%

৩. **অতি তাপ স্বল্প সময় পদ্ধতিতে দুধ পাস্তুরাইজেশনের তাপমাত্রা কত?**
ক. ১৩৬.২° সে. খ. ১৩৭.৮° সে.
গ. ২৩৭.৮° সে. ঘ. ২৩৬.২° সে.

৪. **আর্দ্রতার ভিত্তিতে পনিরকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?**
ক. ৩ ভাগে খ. ৪ ভাগে
গ. ৫ ভাগে ঘ. ২ ভাগে

৫. **সাধারণত নরম পনিরে জলীয় অংশের পরিমাণ কত ভাগ থাকে?**
ক. ১০-২০% খ. ৪৫-৭৫%
গ. ৮০-৯০% ঘ. কোনটিই নয়।

৬. **সাধারণত শক্ত পনিরে জলীয় অংশের পরিমাণ কত ভাগ থাকে?**
ক. ৩০-৪০% খ. ৪-১০%
গ. ১৫-২০% ঘ. উপরের সবগুলো।

৭. **নিচের কোনটি দুগ্ধজাত দ্রব্য?**
ক. দধি খ. মাঠা
গ. আইসক্রিম ঘ. উপরের সবগুলো।

৮. **দুধ পাস্তুরিকরণের সুবিধা কোনটি?**
ক. রোগ উৎপন্নকারী জীবাণু ধ্বংস হয় খ. সংরক্ষণকাল দীর্ঘ হয়
গ. উভয়টি ঘ. কোনটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দুধ বলতে কী বোঝায়?
২. দুধ প্রধানত কী কী উপাদান নিয়ে গঠিত?
৩. দুধ বিনষ্টতার স্তরগুলো লেখ।
৪. তরল দুধ কীভাবে বাজারজাত করা হয়?
৫. দুধ পরিবহনের জন্য কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার?
৬. দুধ শোধন ও ছাঁকন বলতে কী বোঝ?
৭. দুধ হতে ননী কী াবে পৃথক করা হয়?
৮. দুধ প্রমিতকরণ বলতে কী বোঝ?
৯. দুধ স্টেরিলাইজেশন বলতে কী বোঝ?
১০. দুধ পাস্তুরিকরণ বলতে কী বুঝায়?
১১. দুধ পাস্তুরিকরণের সুবিধা কী?
১২. ভ্যাকিউয়ামাইজেশন কী?
১৩. দুধ সমকরণ বলতে কী বুঝায়? এর সুবিধা কী?
১৪. তরল দুধ কীভাবে সংরক্ষণ করা হয়?
১৫. দশটি দুগ্ধজাত দ্রব্যের নাম লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন ধাপসমূহ বর্ণনা কর।
২. দুধের মাধ্যমে রোগ বিস্তার ও এর প্রতিরোধ আলোচনা কর।
৩. দুধের বিনষ্টতার বিষয় আলোচনা কর।
৪. প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে পনির প্রস্তুত পদ্ধতি আলোচনা কর।

নবম অধ্যায়
ফ্লেভার

৯.১ ফ্লেভার :

যেকোনো খাবার মুখে দিলে এটি যে অনুভূতির সৃষ্টি করে এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে স্বাদ ও গন্ধ অনুভূত হয় এবং সাধারণভাবে আরও অন্যান্য অনুভূতি যেমন- ব্যথা, স্পর্শ ও তাপমাত্রার সামগ্রিক অবস্থাগত ফল অনুভূত হয় তাকে ফ্লেভার বলে।

ফ্লেভার জাতীয় পদার্থের উপস্থিতি নাকের স্নায়ুবিক অনুভূতি, জিহ্বার টেস্টবাড এবং মুখের তালু দ্বারা একই সাথে অনুভূত হয়।

৯.২ বিভিন্ন ফ্লেভারিং দ্রব্যের নাম ও ব্যবহার :

খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতির সময় উৎপন্ন দ্রব্যের স্বাদ এবং গন্ধ আকর্ষণীয় করার জন্য যে সমস্ত পদার্থ ব্যবহার করা হয় তাদেরকে ফ্লেভারিং পদার্থ বলে। যেমন- বিভিন্ন ধরনের মসলা, অলিও রেজিন, এসেনসিয়াল অয়েল এবং প্রাকৃতিক গাছ গাছড়ার নির্যাস ছাড়াও বহুধরনের কৃত্রিম সুগন্ধি দ্রব্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোর গঠন জটিল। তরল পানীয় কনফেকশনারী দ্রব্য, আইসক্রিম, চকলেট, ক্যানডি, বিস্কুট ইত্যাদির ক্ষেত্রে কৃত্রিম ফ্লেভার ব্যবহার করা হয়। ফ্লেভার প্রধানত কেজিপ্রতি ৩০০ মিলি গ্রামের বেশি ব্যবহার করা ঠিক নয়। মসলা ও অলিও রেজিন সাধারণত মাংসের তৈরি বিভিন্ন ধরনের খাবারে যোগ করা হয়।

৯.৩ ফ্লেভার এনহেন্সমেন্ট :

কিছু কিছু পদার্থ আছে যাদের নিজস্ব কোনো ফ্লেভার নেই কিন্তু তাদের উপস্থিতি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের ফ্লেভার উন্নত (Improve) বা বর্ধিত (Enhance) করতে পারে। এ জাতীয় পদার্থের মধ্যে মনো সোডিয়াম গ্লুটামেট উল্লেখযোগ্য।

এটা প্রধানত মাংস, মুরগি, সুপ এবং সামুদ্রিক খাবার ও শাকসবজির ফ্লেভারে বর্ধিত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। সব ধরনের চাইনিজ খাবারে টেস্টিং সল্ট নামে এই মনো সোডিয়াম গ্লুটামেট (MSG) এবং সয়াসস ব্যবহার করা হয়। আরও এক ধরনের ফ্লেভার এনহেন্সার আছে যা ম্যালটোল (Maltol) নামে পরিচিত। এটা চিনির মিষ্টতা বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও এর এন্টি অক্সিডেন্ট ধর্ম আছে। চকলেট, কফি, আইসক্রিম, ইন্সটেন্স কফি, চা ইত্যাদির ফ্লেভার এনহেন্স করার কাজে ম্যালটোল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চিজ ফ্লেভার (Cheese flavour)

চিজ ফ্লেভার প্রধানত দুধের গাজন (Fermentation) প্রক্রিয়ার কারণে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যে সমস্ত অনুজীব কালচার হিসেব ব্যবহৃত হয় তা দুধের বিভিন্ন উপাদানকে ভেঙে বহু ধরনের বিপাকজনিত উপজাত সৃষ্টি করে। এর ফলে অনেক ধরনের হালকা ও তীব্র ফ্লেভার উৎপন্ন হয়। কেজিন বিশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে বিভিন্ন প্রকার পেপটাইড এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড-এর সৃষ্টি হয়। এগুলো চিজ ফ্লেভারকে বর্ধিত করে। চিজ ফ্লেভারের জন্য লিপিডের ভাঙ্গনও একান্ত প্রয়োজন। এর অভাবে চিজ ফ্লেভার পুরোপুরো বিকশিত হয় না। এছাড়াও কতকগুলো সালফার উপাদান যেমন-কার্বনিল এস্টার, হাইড্রোজেন সালফাইড, ডাই ইথাইল সালফাইড এবং মিথাইল মারকেপট্যান্ট উৎপন্ন হয়ে থাকে। এগুলো সবই চিজ ফ্লেভার উৎপন্ন এবং এনহ্যান্স করতে সহায়তা করে।

৯.৪ জিহ্বার টেস্ট বাড :

জিহ্বার টেস্ট বাডের মাধ্যমে স্বাদের অনুভূতি হয়। ভেলেট পেপিলেতে অধিক পরিমাণে টেস্টবাড থাকে, জিহ্বার আকৃতির অংশে ক্ষুদ্র নিপল দৃশ্য নিয়ে এরা অবস্থান করে। এছাড়া জিহ্বার অবশিষ্টাংশের পেপিলি, নরম তালু, ফেরিংক্স-এর এপিগ্লোটিসে অবস্থান করে। যদি কোনো বস্তুর স্বাদ নিতে হয় তবে একে অবশ্যই মুখের লালাতে দ্রবীভূত করতে হবে। মুখের লালায় এই দ্রবীভূত উপাদান স্বাদগ্রন্থির সংস্পর্শে আসার পর অনুভূতির সৃষ্টি হয়। স্বাদের সাধারণ গ্রহণীয় তত্ত্ব হলো যে, এর চারটি প্রাথমিক স্বাদ রয়েছে। প্রাথমিক স্বাদ হল (১) টক (Sour) (২) মিষ্টতা (Sweetness) (৩) লবণাক্ততা (Saltiness) (৪) তিক্ত (Bitterness)। জিহ্বার চারটি ভিন্ন ভিন্ন অংশ চারটি স্বাদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট আছে। মিষ্টি স্বাদ জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা, তিতা স্বাদ জিহ্বার পিছনের অংশ দ্বারা, টক স্বাদ জিহ্বার পার্শ্ব দিক (Edge) দ্বারা এবং লবণাক্ত স্বাদ জিহ্বার পিছনের পার্শ্ব দিক দ্বারা অনুভূত হয়ে থাকে।

জিহ্বার টেস্ট বাডের বিভিন্ন অংশ

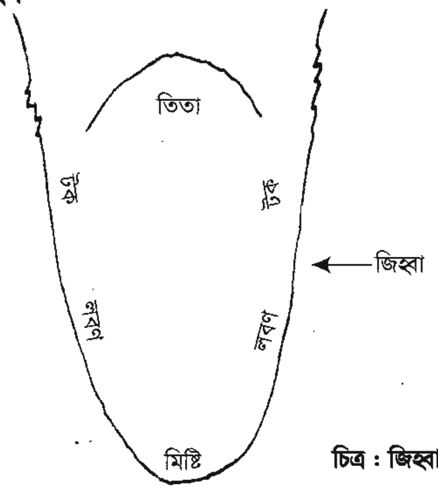

চিত্র : জিহ্বার স্বাদ সংবেদনশীলতা

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জিহ্বার স্বাদ অনুভূত হয়?
(ক) গন্ধ দ্বারা
(খ) টেস্ট বাডের মাধ্যমে
(গ) সাইজের কারণে
(ঘ) মাউথফিলের জন্য

২. জিহ্বার কোন অংশ দ্বারা মিষ্টি স্বাদ অনুভূত হয়?
(ক) অগ্রভাগ দ্বারা
(খ) মধ্যভাগ দ্বারা
(গ) পার্শ্বভাগ দ্বারা
(ঘ) পিছনের অংশ দ্বারা ।

৩. জিহ্বার কোন অংশ দ্বারা তিতা স্বাদ অনুভূত হয়?
(ক) অগ্রভাগ দ্বারা
(খ) মধ্যভাগ দ্বারা
(গ) পার্শ্বভাগ দ্বারা
(ঘ) পিছনের অংশ দ্বারা

৪. কোন অঙ্গ দ্বারা ফ্লেভার অনুভূত হয়?
(ক) নাকের স্নায়ু দ্বারা
(খ) জিহ্বার টেস্ট বাডা দ্বারা
(গ) মুকের তালু দ্বারা
(ঘ) সবকটি দ্বারা একই সাথে ।

৫. কোনটি বিভিন্ন খাদ্যে ফ্লেভার এনহেন্স করতে পারে?
(ক) সোডিয়াম ক্লোরাইড
(খ) সোডিয়াম সালফাইড
(গ) মনো সোডিয়াম গ্লুটামেট
(ঘ) খাবার সোডা

৬. জিহ্বার কোন অংশ দ্বারা টক স্বাদ অনুভূত হয়?

(ক) অগ্রভাগ দ্বারা

(খ) মধ্যভাগ দ্বারা

(গ) পার্শ্বদিক দ্বারা

(ঘ) পিছনের অংশ দ্বারা।

৭. জিহ্বার কোন অংশ দ্বারা লবণাক্ত স্বাদ অনুভূত হয়?

(ক) অগ্রভাগ দ্বারা

(খ) মধ্যভাগ দ্বারা

(গ) পার্শ্বভাগ দ্বারা

(ঘ) পিছনের পার্শ্ব দিক দ্বারা।

৮. কোনটি চিজ ফ্লেভারকে বর্ধিত করে?

(ক) পেপটাইড

(খ) অ্যামাইনো অ্যাসিড

(গ) উভয়টি

(ঘ) কোনোটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফ্লেভারের সংজ্ঞা লেখ।

২. ফ্লেভার এনহেন্সমেন্ট বলতে কী বুঝায়?

৩. জিহ্বার টেস্ট বাড কী?

৪. স্বাদ কত প্রকার ও কী কী?

রচনামূলক

১. ফ্লেভার বলতে কী বুঝায়? ফ্লেভারিং পদার্থ কী? উদাহরণসহ লেখ।

২. ফ্লেভার এনহ্যান্সমেন্ট বলতে কী বুঝায়? চিজ ফ্লেভারের বর্ণনা দাও।

৩. জিহ্বার টেস্ট বাড বলতে কী বুঝায়? চিত্রসহ জিহ্বার টেস্ট বাডের বর্ণনা দাও।

দশম অধ্যায়

দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

১০.১ দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার পদ্ধতি :

একটি পরিষ্কার দেহ পরিচ্ছন্ন ও সৌন্দর্যের প্রতীক। প্রাত্যহিক গোসল, পরিষ্কার দাঁত, পরিপাটি কেশ এবং পরিষ্কার ত্বকই হলো পরিচ্ছন্নতার সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য। শরীরের গন্ধ নিবারণের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার একটি ভালো অভ্যাস। সর্বোপরি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।

পরিধেয় বস্ত্র সহ ইউনিফর্ম, অ্যাপ্রন, জুতা, মোজা, টুপি সবই প্রতিদিন পরিবর্তন করা দরকার। টুপি ব্যবহার করা দরকার যেন মাথার চুল কোন খাবারে বা কাজের জায়গায় না পড়ে। সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের কোনো অবস্থাতেই কাঁচামাল সংগ্রহ, নাড়াচাড়া বা প্রস্তুতির কাজে হাত লাগানো ঠিক নয়। এতে করে নাকের পানি, মুখের থুথু, হাঁচি ও কাশির মাধ্যমে সর্দি, মাম্পস, মেননজাইটিস, হাম, ঠাণ্ডা লাগা ইত্যাদি রোগ পরস্পরের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে পারে। এ ছাড়াও মল-মূত্রের মাধ্যমে টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি রোগ পরস্পরের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে পারে। প্রতিবার হাঁচি, কাশি, নাকের পানি ও কপালের ঘাম টিস্যু পেপার দ্বারা পরিষ্কার করার পর হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। যাদের একজিমা, জীবাণু আক্রান্ত ক্ষত বা অন্য কোনো চর্মরোগ আছে তাদের খাদ্য প্রস্তুতি সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত করা ঠিক নয়।

দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে স্বাস্থ্য রক্ষার ভালো অভ্যাসসমূহ অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে দেহে সহজে কোন রোগ বাসা বাঁধতে পারে না। ফলে দৈহিক পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় উৎসাহ থাকে। অসুস্থ শরীরে অসুস্থ মনের বাস। তাই কিছু করতে ভালো লাগে না।

স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়ম হিসেবে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নিয়মিত অনুশীলন করা প্রয়োজন–

(ক) পরিমিত ও সময় মতো আহার।
(খ) সুষম খাদ্য গ্রহণ।
(গ) নিয়মিত ব্যায়াম ও প্রাতঃ ভ্রমণের অভ্যাস।
(ঘ) সকাল সকাল নিদ্রা গ্রহণ ও সকাল সকাল জাগরণ।
(ঙ) নিয়মিত মল ত্যাগের অভ্যাস করণ।
(চ) ধূমপান ও নেশা জাতীয় দ্রব্য বর্জন।
(ছ) কাজের পর পরিমিত বিশ্রাম গ্রহণ।
(জ) চিন্তামুক্ত ও সহজ জীবন যাপন প্রণালী অনুসরণ।

১০.২ দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা :

খাদ্য ছাড়া যেমন আমরা বাঁচতে পারি না ঠিক তেমনই দূষিত ও বিষাক্ত খাদ্য খেয়ে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি এমন কি মৃত্যুও বরণ করতে পারি। খাদ্যদ্রব্য স্বাস্থ্য সম্মতভাবে প্রস্তুত করা না হলে তা আমাদের জন্য যে কোনো মুহূর্তে বিপদের কারণ হতে পারে। আমরা জানি খাদ্য সংক্রান্ত কিছু রোগ আছে যা খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের অসুস্থতা, দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং খাদ্যদ্রব্য নাড়াচাড়া করা সম্পর্কে অজ্ঞতা, অবহেলা ও অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের কারণে হয়ে থাকে। কাজেই খাদ্যদ্রব্যের কাঁচামাল সংগ্রহ, প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াজাতকরণে নিয়োজিত সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তার দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি এবং খাদ্য দূষিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। এজন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

আমরা জানি জীবাণু সর্বত্র বিদ্যমান। এগুলো হাতে, পায়ে, মুখে, ত্বকে এবং শরীর থেকে নিঃসৃত সব কিছুতেই উপস্থিত থাকে। কাজেই বিন্দুমাত্র অসতর্কতা এবং অবহেলার কারণে মানুষের শরীর থেকে জীবাণু খাদ্য দ্রব্য অথবা সরঞ্জাম এবং তা থেকে ভোক্তার কাছে চলে যেতে পারে। তাই দৈহিক পরিচ্ছন্নতার নীতিমালা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এজন্য অবশ্যই নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো উচিত।

প্রশ্নমালা

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন :

১। খাদ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানায় মাথায় টুপি ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?

ক) যেন মাথার চুল খাবারে না পড়ে খ) যেন মাথা ঠাণ্ডা থাকে

গ) যেন মাথা গরম থাকে ঘ) সবগুলো

২। চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ–

ক) খারাপ খ) উত্তম

গ) খুব খারাপ ঘ) সবগুলো

৩। স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়ম হিসেবে কোন বিষয়গুলো নিয়মিত অনুশীলন করা দরকার?

ক) সময়মতো খাবার খ) সুষম খাদ্য গ্রহণ

গ) নিয়মিত ব্যায়াম ঘ) উপরের সবগুলো

৪। খাদ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানায় কর্মীরা মুখে মাস্ক ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?

ক) হাঁচি ও কাশিতে মুখের ময়লা যেন খাবারে না পড়ে খ) নাকের পানি যেন খাবারে না পড়ে

গ) উভয়টি ঘ) কোনোটিই নয়।

৫। খাদ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানায় কর্মীরা হাতে গ্লাভ্‌স ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?

ক) হাতের ঘাম যেন খাবারে না পড়ে খ) যেন মাথা ঠাণ্ডা থাকে

গ) উভয়টি ঘ) কোনোটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক) স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম হিসেবে যে বিষয়গুলো নিয়মিত অনুশীলন করা দরকার তা উল্লেখ কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

ক) দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার পদ্ধতি আলোচনা কর।

খ) দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

একাদশ অধ্যায়
প্লান্ট সেনিটেশন ও হাইজিন

১১.১ সেনিটেশনের সংজ্ঞা :

স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পরিবেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখার প্রক্রিয়াকে বলা হয় (Sanitation) সেনিটেশন। তবে এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সেনিটেশন ফাউন্ডেশন কর্তৃক দেয়া সংজ্ঞাটি সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত। এটি নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। "সেনিটেশন একটি জীবন ব্যবস্থা। এটি উন্নত জীবনযাপনের একটি প্রতিচ্ছবি যা প্রকাশিত বা প্রতিফলিত হয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, পরিষ্কার পারিপার্শ্বিকতা এবং লোকসমাজের উপর। জীবনযাপনের অংশ হলেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা আসতে হবে জনসাধারণের মধ্যে থেকেই। এটি জ্ঞানের মাধ্যমে লালিত এবং বাধ্যবাধকতার মধ্যে পালিত একটি সুন্দর মানবধর্মী আদর্শ"। খাদ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে উচ্চমানে সেনিটেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ একটি খাদ্য, কাঁচাই হোক বা প্রক্রিয়াজাতই হোক তা অবশ্যই হতে হবে নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর। তাই খাদ্য প্রস্তুতির পারিপার্শ্বিক পরিবেশও অবশ্যই পরিষ্কার ও নিরাপদ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১১.২ কারখানার পরিবেশগত অবস্থা :

খাদ্যশিল্প কারখানায় নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেমন–

ক. শিল্প কারখানার স্থান নির্বাচন।

খ. পাকা দালান ও সরঞ্জামের নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ এবং স্থাপন।

গ. শিল্প কারখানা পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ।

ক. শিল্প কারখানার স্থান নির্বাচন–

১. শিল্প-কারখানা সর্বদা স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে স্থাপিত হওয়া উচিত।

২. পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি প্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৩. স্থানটি শুকনো, সমান এবং নিকটে আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৪. স্থানটি আলো বাতাস পূর্ণ হওয়া উচিত।

৫. নিকটে অন্য কোনো শিল্প কারখানার বর্জ্য (কঠিন বা তরল) জমা হওয়ার মত গর্ত বা নিচু জায়গা থাকা ঠিক নয়। এরূপ জায়গা থাকলে জীবাণুর আক্রমণে পরিবেশ দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

খ. পাকা দালান ও সরঞ্জামের নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ এবং স্থাপন–

খাদ্যদ্রব্যের কাঁচামাল যখন শিল্পাঙ্গনে এসে পৌছে তখন তাতে বিভিন্ন ধরনের অপদ্রব্য যেমন ধুলিবালি, গাছপাতার অংশ, পোকা-মাকড় ও কীটপতঙ্গের শরীরের অংশ, কীটনাশক দ্রব্য, সার এবং জীবাণু ও জীবাণু

নিঃসৃত বিষাক্ত দ্রব্য দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত অবস্থায় থাকে। কাজেই এ সমস্ত দূষিত দ্রব্য যে স্থানে নাড়াচাড়া করা হবে সে স্থানটিকে প্লান্ট স্থাপনের আগেই নির্দিষ্ট করে প্রসেসিং-এর অন্যান্য স্থান থেকে পৃথক করা প্রয়োজন। এতে করে ভবিষ্যতে প্রক্রিয়াজাতকরণের স্থান এবং সরঞ্জামসমূহ দূষিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। তাই একটি খাদ্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সতর্কতার সাথে অবলম্বন করা দরকার। যথা–

১. কারখানা প্রাঙ্গণ খোলামেলা এবং আলো ও বাতাস চলাচলের উপযোগী করে তৈরি করা।

২. দরজা-জানালা এবং অন্যান্য ছোট বড় সব ধরনের প্রবেশপথ মাছি, কীটপতঙ্গ ও ইঁদুর নিরোধক করা।

৩. মেঝে একটু ঢালু করে সিমেন্ট, টাইলস বা পাথর দিয়ে তৈরি করা।

৪. যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের আকার-আকৃতি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে ব্যবহারের পরে সেগুলো পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করা সহজ হয়।

৫. খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজে ব্যবহৃত ঘরের দেয়াল মসৃণ ও ফাটলবিহীন করে তৈরি করা।

৬. বিভিন্ন ধরনের পাত্র, টেবিল, ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বিভিন্ন অংশ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র পরিষ্কার করার মতো পর্যাপ্ত উপকরণ ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা।

৭. বর্জ্য পানি ও অন্যান্য তরল বজ্যসমূহের সুষ্ঠু নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত ও কার্যকর নালা নর্দমার ব্যবস্থা করা।

৮. কারখানার অন্যান্য বর্জ্য ও পরিত্যক্ত পদার্থ কার্যকরভাবে অপসারণ ও পরিশোধনের ব্যবস্থা করা।

৯. কার্যরত কর্মচারী ও শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক হাত ধোয়ার বেসিন ও টয়লেট নির্মাণ করা।

১০. সবার জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

১১. খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, প্রসেসিং, প্যাকেজিং এবং ক্লিনিং-এর কাজে নিয়োজিত সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য অ্যাপ্রন, টুপি, গ্লাভস এবং গামবুটের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১২. কারখানার সকল বিভাগে যথেষ্ট সংখ্যক নির্গমন পাখার (Exhaust fan) ব্যবস্থা করা।

১৩. সব ধরনের সরঞ্জাম এবং পাইপ ফিটিংস যেগুলো খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে আসে পারতপক্ষে সেগুলো স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি হওয়া উচিত এবং এগুলোর সংযোগস্থল এমন হতে হবে যেন পরিদর্শন ও পরিষ্কার করার জন্য সহজে খোলা যায় এবং জোড়া লাগানো যায়।

গ. শিল্পকারখানা পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করার পদ্ধতি :

পরিষ্কারকরণ: কলকারখানার যন্ত্রপাতি প্রধানত দু'ভাবে পরিষ্কার করা যায়।

ক) কারখানার যন্ত্রপাতি ও পাইপ ফিটিংস খুলে পরিষ্কারকরণ।

খ) কারখানার যন্ত্রপাতি যথাস্থানে সংযুক্ত অবস্থায় পরিষ্কারকরণ।

ক) কারখানার যন্ত্রপাতি ও পাইপ ফিটিংস খুলে পরিষ্কারকরণ :

এটা পরিষ্কারকরণের পুরনো পদ্ধতি হলেও আজও কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পদ্ধতির কার্যকারিতা নির্ভর করে সঠিকভাবে নিয়ম মেনে চলার উপর। যন্ত্রপাতি ও পাইপ ফিটিংস সম্পূর্ণরূপে খোলার পর বিভিন্ন অংশের উপরিভাগ, পাইপ ফিটিংস এবং পাইপের ভিতরের দিক ডিটারজেন্ট দ্রবণসহ ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করা হয়। এরপর জমে থাকা ডিটারজেন্টকে খাবার উপযুক্ত পানি দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো দেখেই বোঝা যায় যে সবকিছু ভালো করে পরিষ্কার করা হয়েছে কিনা।

খ) কারখানায় যন্ত্রপাতি ও পাইপলাইন যথাস্থানে সংযুক্ত অবস্থায় পরিষ্কারকরণ :

নির্দিষ্ট কিছু শিল্প কারখানা, বিশেষ করে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার পাইপলাইন ও পাইপ ফিটিংস স্থায়ীভাবে লাগানো অবস্থায় পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শুধু পাইপ লাইনের ভিতরে জোরে পানি প্রবাহিত করে ধুয়ে ফেলা হয়। এর পর ৭১° সেঃ অথবা তার চেয়ে বেশি তাপমাত্রার গরম পানিতে পরিষ্কারক মিশিয়ে পাইপ লাইনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করে পরিষ্কার করা হয় এবং সাথে সাথে পানি দিয়ে ধোয়ার পর ৭৭° সেঃ এর চেয়ে বেশি গরম পানি, ক্লোরিন দ্রবণ (200 ppm) অথবা কোয়ার্টারনারি অ্যামেনিয়াম যৌগ সহযোগে পানি দিয়ে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

১১.৩ পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও পরিষ্কারক দ্রব্য :

পরিষ্কাকরণের কাজে বহু ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন–

১) যান্ত্রিক ও হস্তচালিত যন্ত্রপাতি।

২) সংকুচিত বায়ুজেট (Jet)- যন্ত্রপাতির উপরিতল হতে ধূলিবালি অপসারিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩) বায়ুশোষণ যন্ত্র (Vacuum Cleaner)-ধূলিবালি ও হাল্কা অপদ্রব্য পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৪) উচ্চ ও মধ্যম চাপের পানি কমান (Jet)-এ ক্ষেত্রে শুধু পানি বা ডিটারজেন্টসহ পানি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রথমে ডিটারজেন্টসহ পানি দ্বারা পরিষ্কার করার পর গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। এতে করে প্লান্টের উপরিভাগ উষ্ণতার কারণে আপনা আপনি শুকিয়ে যায়।

পরিষ্কারক দ্রব্য (Cleaning Agents/Detergents) :

পরিষ্কারক দ্রব্য হিসেবে সাধারণত নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ ব্যবহৃত হয়। যেমন–

১) অম্লীয় ডিটারজেন্ট :

ক) হাইড্রোক্সি এসিটিক এসিড

খ) গ্লুকোনিক এসিড

গ) সাইট্রিক এসিড

ঘ) টারটারিক এসিড

ঙ) লিভুলিনিক এসিড

এ সমস্ত ডিটারজেন্ট প্রধানত ইভাপোরেটর, পাস্তুরাইজারের ভিতরে সঞ্চিত ক্যালসিয়াম ফসফেটের আবরণ পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২) ক্ষারীয় ডিটারজেন্ট :

অজৈব ক্ষারীয় ডিটারজেন্ট খাদ্য দ্রব্যে উপস্থিত প্রোটিন ও লিপিড জাতীয় দ্রব্যকে গলিয়ে পরিষ্কার করতে সহায়তা করে। নিম্নে এদের নাম দেয়া হলো−

ক) সোডিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড

খ) সোডিয়াম মেটাসিলিকেট

গ) সোডিয়াম অর্থোসিলিকেট এবং সোডিয়াম সেসকুই সিলিকেট

ঘ) ট্রাই সোডিয়াম ফসফেট

ঙ) সোডিয়াম কার্বনেট

চ) হাইড্রোকার্বন সালফোনেট

ছ) পলিইথার অ্যালকোহল

জ) কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ড ইত্যাদি।

জীবাণুমুক্তকরণ (Sanitizing) :

যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের উপরিতল হতে অধিকাংশ বা সব রকমের জীবাণু অপসারণ করার প্রক্রিয়াকে জীবাণুমুক্তকরণ বলা হয়। এ কাজের জন্য যে সকল পদার্থ ব্যবহার করা হয় তাদেরকে জীবাণু ধ্বংসকারক বলে। যেমন−

(ক) গরম পানি (Hot water)

(খ) চাপে রক্ষিত বাষ্প (Steam under pressure)

(গ) হ্যালোজেন

(ঘ) কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম যৌগ।

১১.৪ জীবাণুমুক্তকরণে সেনিটাইজিং এজেন্ট-এর কার্যকারিতা :

উচ্চ চাপের বাষ্প: সেনিটাইজিং বা জীবাণু ধ্বংসকরণের ক্ষেত্রে উচ্চ চাপের বাষ্প সবচেয়ে বেশি কার্যকর। কিন্তু এর ব্যবহার শুধুমাত্র যন্ত্রপাতির আবদ্ধ স্থান বা তল যা উচ্চ চাপ সহ্য করতে পারে এমন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। গরম জল, বাষ্পের প্রবাহ বা জেট দ্বারা সাধারণত অতিমাত্রায় তাপ সহনশীল ও তাদের স্পোর ছাড়া অন্যান্য সব জীবাণু ধ্বংস করা যেতে পারে যদি কার্যকরভাবে তা ব্যবহার করা যায়। ব্যবহারের সময় এদের তাপমাত্রা কমার সাথে সাথে কার্যকারিতাও দ্রুত কমে যায়।

ক্লোরিন, আয়োডিন ও এদের লবণ: উপযুক্ত গাঢ়ত্ব ও পর্যাপ্ত সময় ধরে ব্যবহার করলে ক্লোরিন, আয়োডিন, হাইপোক্লোরাইড, ক্লোরামেটস, আয়োডফরস ইত্যাদি যৌগসমূহ জীবাণুনাশক হিসেবে খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। ক্লোরিন পানিতে উপস্থিত অনাকাঙ্ক্ষিত জীবাণু ধ্বংস করে পানিকে খাবার যোগ্য পানি, খাবারে ব্যবহার, ধৌতকরণ ও ঠাণ্ডাকরণ উপযোগী পানিতে পরিণত করে। হাইপোক্লোরাইডসমূহ জীবাণুনাশক হিসেবে ক্ষারীয় মাধ্যমের চেয়ে অম্লীয় মাধ্যমে বেশি কার্যকর। পানি বা যন্ত্রপাতির দূষণ অত্যধিক হলে ৫০-১০০ ppm পর্যন্ত ক্লোরিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম যৌগ: এ জাতীয় যৌগ প্রধানত গ্রাম-পজেটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর। এরা ক্ষারীয় মাধ্যমে ভালো কাজ করে। তাই ডিটারজেন্ট সেনিটাইজার হিসেবে কোয়ার্টারনারি অ্যামোনিয়াম যৌগ কোন না কোন ক্ষারীয় ডিটারজেন্টের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় একযোগে বাজারজাত করা হয়ে থাকে। এগুলি প্রধানত বাসন ও যন্ত্রপাতি একবার ধুয়ে পরিষ্কার ও সেনিটাইজ করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

পানি বিশোধন: খাওয়ার পানি পরিষ্কার ও বিশোধন প্রক্রিয়া দশম অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

১১.৫ আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থ অপসারণ :

নিম্নলিখিত উপায়ে খাদ্য শিল্প-কারখানার আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থসমূহ দূর করা যেতে পারে। যেমন–

(ক) আবর্জনা অপসারণ

(খ) শোধন

(গ) রূপান্তরকরণ

(ক) আবর্জনা অপসারণ: খাদ্য শিল্প-কারখানার বিভিন্ন ধরনের কঠিন বর্জ্য পদার্থ দুরে নির্দিষ্ট কোনো স্থানে স্বাস্থ্য সম্মতভাবে নিচু জায়গা ভরাট করার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর প্রধান অসুবিধা হলো খারাপ গন্ধের উৎপত্তি।

(খ) শোধন: এক্ষেত্রে কঠিন বর্জ্য পদার্থ উচ্চ তাপমাত্রায় (৬৫০° সেঃ) পুড়িয়ে দূষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা যায়। বর্তমানে খাদ্য দ্রব্যের মতো পানি সমৃদ্ধ জৈবিক বস্তুসমূহ শোধনের উপযোগী ছোট প্লান্ট বিদেশে কিনতে পাওয়া যায়।

(গ) রূপান্তরকরণ: জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্য শিল্প-কারখানার বর্জ্য পদার্থ ও রূপান্তরিত করে কৃষি জমিতে ব্যবহার উপযোগী সবুজ সারে পরিণত করে কাজে লাগানো যেতে পারে।

স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী :

খাদ্যশিল্প কারখানায় কাঁচামাল থেকে শুরু করে উৎপন্ন দ্রব্য পর্যন্ত সর্বস্তরে খাদ্যদ্রব্যকে অপদ্রব্যমুক্ত রাখার জন্য বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে খাদ্যদ্রব্যে উপস্থিত জীবাণুর ধরন এবং সংখ্যা সম্পর্কে অবগত হওয়া খুবই জরুরি। জীবাণুর ধরণ জানা দরকার এই জন্য যে, তার মধ্যে থাকতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিত পচনকারী, রোগ সৃষ্টিকারী বা আকাঙ্ক্ষিত চোলাইকারী জীবাণু। সংখ্যা জানা দরকার এই জন্য যে, পচনকারী জীবাণুর সংখ্যা যত বেশি হবে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও তত বাড়বে এবং সেই সাথে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করাও কঠিন হয়ে পড়বে। এ ছাড়াও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর উপস্থিতিও বৃদ্ধি পাবে এই অবস্থার কথা বিবেচনা করেই বাস্তবেও বহু খাবারের গুণগত মান তাতে উপস্থিত জীবাণুর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়ে থাকে। নিম্নে শিল্প ক্ষেত্রে গৃহীত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থার উদাহরণ দেওয়া হলো–

১) অ্যাসেপসিস প্রক্রিয়ার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো খাদ্যদ্রব্যকে প্যাকেটজাতকরণ। এই প্যাকেটটি হতে পারে যে কোনো ধরনের বস্তুর তৈরি অতি সাধারণ একটি ঠোস, মোড়ক, কার্টন বক্স, ব্যাগ, বোতল, কনটেইনার, ক্যান ইত্যাদি। মোড়ক যে শুধুই খাদ্যদ্রব্যকে কলুষিত বা দূষিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে তা নয় বরং বায়ু নিরোধক কনটেইনার (Hermetically sealed Container) হিসেবে খাদ্যদ্রব্যকে জীবাণুমুক্ত রাখে।

২) দুগ্ধশিল্প প্রতিষ্ঠানে দুধ সংগ্রহ ও নাড়াচাড়া করার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয় যেন কোনোক্রমেই পারত পক্ষে দুধ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত না হয়। বাস্তব ক্ষেত্রেও দুধের কোয়ালিটি বিচার করা হয় তাতে উপস্থিত জীবাণুর সংখ্যা নিরূপণ করে।

৩) ক্যানিং বা টিনজাতকরণ শিল্পের ক্ষেত্রেও উপস্থিত জীবাণুর সংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা এর উপর নির্ভর করে তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে জীবাণু ধ্বংস করে খাদ্য সংরক্ষণ করার পদ্ধতি, সময়, তাপমাত্রা এবং অন্যান্য আরও বহু বিষয়। বিশেষ করে যদি এতে থাকে তাপ সহনশীল এবং পচনকারী জীবাণু, যেমন স্পোর উৎপাদক থার্মোফাইলস। যাই হোক না কেন তাপ প্রয়োগের পর কিন্তু মুখ বন্ধ ক্যান (Sealed Cans) জীবাণু দ্বারা পুনঃকলুষিত হওয়ার সম্ভবনা থাকে না।

৪) মাংস প্রসেসিং শিল্পের ক্ষেত্রে কড়া প্রতিরক্ষা মূলক স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে পশু জবাই, নাড়া চামড়াকরণ এবং প্রক্রিয়াজাত করণের মাধ্যমে জীবাণুর সংখ্যা (Load) কমিয়ে মাংস এবং মাংসজাত দ্রব্যের ভালো থাকার সময় (Keeping Quality) দীর্ঘায়িত করা যায়। মাছের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য।

৫) ফার্মেন্টেশনের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী জীবাণুর সংখ্যা ধাপে ধাপে প্রয়োজন মতো কমিয়ে বা নিয়ন্ত্রণ করে সাফল্যজনকভাবে মানসম্পন্ন আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য উৎপন্ন করা সম্ভব।

এছাড়া পরিষ্কার খাবার উপযোগী পানি দ্বারা ধুয়ে, গরম পানিতে চুবিয়ে, অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে, ছেঁকে, থিতিয়ে ইত্যাদি বিভিন্ন রকম সাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করেও খাদ্যদ্রব্যে উপস্থিত জীবাণুর সংখ্যা কমিয়ে ফলমূল শাকসবজি ও তরল খাবারের শেল্ফ লাইফ বা জীবনকাল বা ভালো থাকার সময় বাড়ানো যায়।

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। কারখানার যন্ত্রপাতি প্রধানত কয় ভাবে পরিষ্কার করা যায়?

ক) দুই ভাবে
খ) তিন ভাবে
গ) উভয়টি
ঘ) কোনোটিই নয়

২। নিচের কোনটি পরিষ্কারক দ্রব্য?

ক) অম্লীয় ডিটারজেন্ট
খ) ক্ষারীয় ডিটারজেন্ট
গ) উভয়টি
ঘ) কোনোটিই নয়

৩। নিচের কোনটি জীবাণু ধ্বংসকারক?

ক) গরম পানি
খ) চাপে রক্ষিত বাষ্প
গ) হ্যালোজেন
ঘ) উপরের সবগুলো

৪। কোনটি অম্লীয় ডিটারজেন্ট নয়?

ক) হাইড্রোক্সি এসিটিক এসিড
খ) সাইট্রিক এসিড
গ) টারটারিক এসিড
ঘ) সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড

৫। কোনটি ক্ষারীয় ডিটারজেন্ট?

ক) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড
খ) সোডিয়াম মেটা সিলিকেট
গ) সোডিয়াম কার্বনেট
ঘ) উপরের সবগুলো

৬। মাংসের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?

ক) স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে জবাই করা

খ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে চামড়া থেকে মাংসকে আলাদা করা

গ) জবাই করার অল্প সময়ের মধ্যে মাংস প্রসেসিং করা

ঘ) উপরের সবগুলো

৭। কোন উপায়ে খাদ্য শিল্প কারখানার আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থ দূর করা যায়?

ক) আবর্জনা অপসারণ

খ) শোধন

গ) রূপান্তরকরণ

ঘ) উপরের সবগুলো

৮। কঠিন বর্জ্য পদার্থ শোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তাপমাত্রা–

ক) ৬৫০° সে.

খ) ৫০° সে.

গ) ৬৫° সে.

ঘ) কোনোটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) সেনিটেশনের সংজ্ঞা লেখ।

খ) কয়েকটি অম্লীয় ডিটারজেন্টের নাম লেখ।

গ) কয়েকটি ক্ষারীয় ডিটারজেন্টের নাম লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

ক) জীবাণুমুক্তকরণে সেনিটাইজিং এজেন্ট-এর কার্যকারিতা আলোচনা কর।

খ) পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও পরিষ্কারক দ্রব্যের বর্ণনা দাও।

গ) শিল্প-কারখানার আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থ দূর করার পদ্ধতি আলোচনা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়
জ্যাম ও জেলি

১২.১ জ্যাম ও জেলির সংজ্ঞা :

জ্যাম

জ্যাম হচ্ছে অর্ধ-কঠিন বুনট বিশিষ্ট এক ধরনের প্রক্রিয়াজাত খাদ্য যা তৈরি করা হয় ফলের পাল্প ও চিনির মিশ্রণ থেকে, সেই মিশ্রণে কমপক্ষে ৪৫ % পাল্প ও অবশিষ্টাংশ চিনি থাকে। ফলের পাল্পে যদি প্রয়োজনীয় প্যাকটিন ও এসিডের কমতি থাকে তাহলে বাড়তি প্যাকটিন ও সাইট্রিক এসিড যোগ করার দরকার হয়। এটি একটি আকর্ষণীয় কমনীয় ও রুচিকর খাদ্য যা তৈরি করতে ফলের পাল্প ও চিনি নির্দিষ্ট অনুপাতে মিলিয়ে এমনভাবে তাপ দিতে হয় যাতে খাদ্যে দ্রবণীয় কঠিন পদার্থের (টিএসএস) পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৬৫%। কখনও কখনও খাদ্যে ব্যবহার উপযোগী ফ্লেভার ও রং ব্যবহার করা হয়।

আমাদের দেশে প্রাপ্ত প্রায় সব ফল থেকেই জ্যাম তৈরি করা যায়। এগুলোর মধ্যে মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফলগুলো হচ্ছে– আম, জাম, কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে, তাল, বেল, লিচু, টমেটো ও কলা। গাজর, বাঙ্গি, তরমুজ থেকেও জ্যাম তৈরি করা সম্ভব। জ্যাম উৎপাদনে এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এককভাবে এবং কখনও কখনও যৌথভাবে (যেমন- মিক্সড ফ্রুট জ্যাম) ব্যবহৃত হয়।

জেলি

জেলি জ্যামের মতোই এক বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়াজাতকৃত অর্ধকঠিন, তবে এখানে পাল্পের পরিবর্তে ফলের রস ব্যবহার করা হয়। জেলিও কমপক্ষে ৪৫% ফলের রস ও অবশিষ্টাংশ চিনির মিশ্রণকে তাপ প্রয়োগ করে প্রস্তুত করা হয়। এটি জ্যামের তুলনায় দেখতে অনেকটা স্বচ্ছ।

১২.২ জেলির বৈশিষ্ট্য :

১. জেলি তৈরিতে ফলের পরিষ্কার রস ব্যবহার করা হয়

২. জেলি দেখতে স্বচ্ছ।

৩. জেলি আলো প্রতিসরণশীল।

৪. জেলি তৈরিতে সাধারণত অর্ধপাকা ফল ব্যবহার করা হয়।

৫. জেলি কাটা যায়, কাটলে কিউবের কোনার মতো আকার হয়।

৬. জেলির সমাপ্তি স্ফুটনাঙ্ক ১০৫° সে.

৭. জেলিতে মসৃণ তল সৃষ্টি হয় ।

জ্যাম ও জেলি তৈরির পদ্ধতি

জ্যাম ও জেলি তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদান :

১) ফলের পাল্প (জ্যামের ক্ষেত্রে)

২) ফলের রস (জেলির ক্ষেত্রে)

৩) চিনি।

৪) পেকটিন (যদি ফলের পাল্পে বা রসে প্রয়োজনীয় পরিমাণ না থাকে)

৫) সাইট্রিক অ্যাসিড (যদি ফলের পাল্পে বা রসে প্রয়োজনীয় পরিমাণ না থাকে)

৬) সোডিয়াম বেনজয়েট (ঐচ্ছিক)

৭) খাদ্যে ব্যবহার উপযোগী (Food Grade) মোম।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও তৈজসপত্র

১. রিফ্র্যাকটোমিটার

২. P^H মিটার

৩. বোতল ও ক্যাপ

৪. নিক্তি

৫. ব্লেন্ডার বা পাল্পার

৬. মাপ চোঙ

৭. ছাঁকার কাপড়

৮. লেবেল

৯. সসপ্যান, গামলা, ট্রে, ছুরি, ফানেল, ওয়াশিং টাব (Washing Tab) ইত্যাদি

১০. এসিডিটি নির্ণয়ের যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল

১১. জেলমিটার।

জেলি তৈরির ধাপসমূহ

সংগ্রহকরণঃ পরিপুষ্ট, দোষমুক্ত, অর্ধপাকা টাটকা ফল বাছাই করে নিতে হবে।

ধৌতকরণঃ বাছাইকৃত ফলগুলোকে বিশুদ্ধ পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

তৈরিকরণঃ স্টেনলেস স্টিলের ছুরির সাহায্যে সমান টুকরো করে কেটে নিতে হবে।

সিদ্ধকরণ: ১ কেজি পরিমাণ ফলের টুকরার সাথে ১ কেজি পানি এবং ১ গ্রাম সাইট্রিক অ্যাসিড মিলিয়ে সিদ্ধ করতে হবে। তবে সাইট্রিক অ্যাসিডের পরিবর্তে পরিমাণমত লেবুর রস দেয়া যায়।

রস সংগ্রহকরণ: প্রায় ৫০ মিনিট সিদ্ধ হওয়ারপর সাদা মার্কিন কাপড় দ্বারা ছেঁকে রস সংগ্রহ করতে হবে। রস সংগ্রহ করার পর যে বাই-প্রোডাক্ট থাকে তা পুনরায় পানি দিয়ে সিদ্ধ করে রস সংগ্রহ করা যায় এতে গুণাগুণের খুব একটা পরিবর্তন হয় না।

ওজনকরণ: রস, চিনি, পেকটিন, সাইট্রিক অ্যাসিড ও সোডিয়াম বেনজোয়েট আলাদা আলাদাভাবে মেপে নিতে হবে।

মিশ্রিত ও জালকরণ: চিনি ও পেকটিন রসের সাথে মিশিয়ে জ্বাল দিতে হবে এবং বার বার চামচ দিয়ে জেলির ঘনত্ব ৬৫ ভাগ করে চুলা থেকে নামাতে হবে।

বোতলজাতকরণ: শুষ্ক, জীবাণুমুক্ত কাচের বোতলের উপরিভাগে ১/৮ ইঞ্চি জায়গা খালি রেখে জেলি ভরতে হবে।

মোমঢালন: গলানো মোম ঠাণ্ডা জেলির উপরে ঢেলে বায়ুরোধী করতে হবে। মোম জমাট বাঁধলে ছিপি লাগাতে হবে।

মজুদকরণ: ঠাণ্ডা ও শুষ্ক জায়গায় জেলি সংরক্ষণ করতে হবে।

ধাপসমূহ:

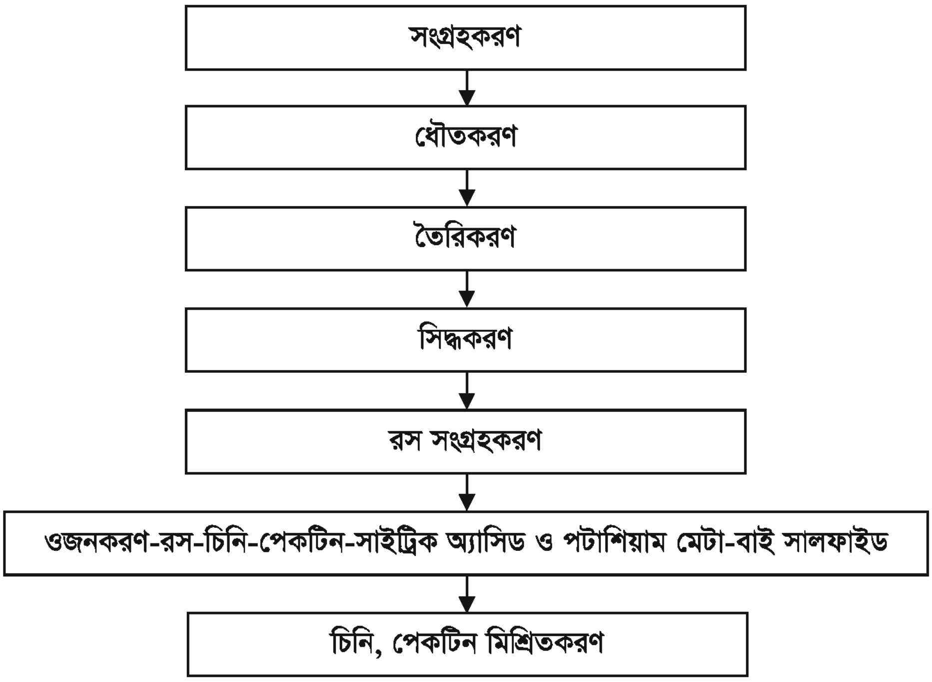

↓

চিনি পেকটিন রস জালকরণ-টি. এস. এস ৬৫%

↓

সাইট্রিক অ্যাসিড যোগকরণ-টি .এস. এস ৬৭%

↓

সাইট্রিক অ্যাসিড যোগকরণ-টি .এস. এস ৬৭%

↓

বোতলজাতকরণ

↓

মোমঢালন

↓

মোড়কজাতকরণ

↓

মজুদকরণ

জ্যাম তৈরির সাধারণ ধাপসমূহ:

- প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান পৃথক পৃথকভাবে ওজন করে নিতে হয়।
- সোডিয়াম বেনজয়েট হালকা গরম পানিতে গুলিয়ে রাখতে হয়।
- মাপকৃত পরিষ্কার চিনি থেকে অল্প পরিমাণ চিনির সাথে পেকটিন ভালোভাবে শুকনা অবস্থাতেই মিশাতে হয় এবং পরে সমস্ত চিনির সাথে মিশিয়ে নিতে হয়।
- তারপর পাল্প, যোগ করে মেশানোর পর চুলায় দিতে হয় এবং সাথে সাথে নাড়তে হয়।
- টিএসএস যখন ৬৫% পার হবে তখন চুলা থেকে নামিয়ে অথবা নামানোর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সাইট্রিক অ্যাসিড ও সোডিয়াম বেনজয়েট এবং রং (যদি প্রয়োজন হয়) যোগ করতে হয়।
- সাথে সাথে পরিষ্কার, শুষ্ক, জীবাণুমুক্ত বোতলে ভরে ফেলতে হবে।
- ফেনা চামচের সাহায্যে তুলে ফেলতে হয়ে।
- জ্যামের উপরিভাগে ঠাণ্ডা হওয়ার পর মোম যোগ করা যেতে পারে।
- তবে খেয়াল রাখতে হবে জ্যাম যতক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি না জমবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনোরূপ নাড়াচাড়া করা যাবে না। এতে জ্যাম সেটিং হওয়া বাধাগ্রস্ত হয়।

- জ্যাম বা জেলি জমলে বোতলের উপরিভাগে শুকনা কাপড় এবং বাইরের দিক ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে।
- তারপর পরিষ্কার, শুষ্ক ও জীবাণুমুক্ত ক্যাপ লাগাতে হয়।
- লেবেল লাগিয়ে শুষ্ক, আলোকবিহীন ও ঠাণ্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হয়।

রিফ্রাকটোমিটার যদি না থাকে তবে চুলায় বসানো মিশ্রণ যখন বেশ ঘন হয় তখন সাইট্রিক অ্যাসিড যোগ করতে হয় এবং চামচে নিয়ে নিচের দিকে পড়তে দিতে হয়। যদি দেখা যায় যে, তরল প্রবাহের মতো পড়ছে তবে বুঝতে হবে জ্যাম জমবে না। আর যদি দেখা যায় যে, ছাড়া ছাড়া পড়ছে তবে বুঝতে হবে জ্যাম জমবে। ঠিক এ অবস্থায় আসলে চুলা থেকে মিশ্রণটি নামিয়ে নেয়া হয়।

জ্যাম হওয়ার আর একটি লক্ষণ হলো, ছোট চামচ দিয়ে চুলার ঘন মিশ্রণ থেকে অল্প পরিমাণ নিয়ে কাপ বা ছোট বাটির পানিতে ফেললে যদি তা একটুও পানিতে দ্রবীভূত না হয় তবে বুঝতে হবে জ্যাম অবশ্যই জমবে। তখন চুলা থেকে দ্রবণটি নামিয়ে ফেলতে হয়।

জ্যাম ও জেলি তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের কাজ

চিনি: মিষ্টির পরিমাণ বাড়ায়। চিনির পরিমাণ খুব বেশি অর্থাৎ ৬৫% এর উপর হওয়াতে এটি সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে। পণ্যের পুষ্টিমান ও স্বাদ বৃদ্ধি করে।

পেকটিন: জমতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। অ্যাসিড ও চিনি মিলিয়ে তাপ দিলে পেকটিন এ দুয়ের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করে যার কারণে মিশ্রণে জেল তৈরি হয়।

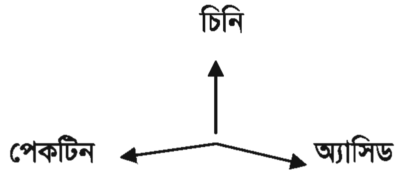

সাইট্রিক অ্যাসিড: টক বাড়িয়ে গ্রহণযোগ্য স্বাদ আনয়ন করে এবং জমতে সাহায্য করে। জ্যাম-জেলির pH কমায় ফলে শেলফ লাইফ বেড়ে যায়।

মোম: বায়ুকে জ্যামের সান্নিধ্যে আসা থেকে দূরে রাখে। ফলে বাইরের অণুজীব ঢুকতে পারে না।

জ্যাম ও জেলি তৈরির কয়েকটি যন্ত্রপাতির কাজ :

রিফ্রাকটোমিটার : পাল্প বা রসের এবং জ্যাম বা জেলির °ব্রিক্স পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ব্লেন্ডার বা পাল্পার : ফল থেকে পাল্প বের করার জন্য ব্লেন্ডার বা পাল্পার ব্যবহৃত হয়।

P^H মিটার : পাল্প বা রসের এবং জ্যাম বা জেলির P^H মাপতে এটি ব্যবহৃত হয়। P^H যত বেশি হবে অ্যাসিডের জেল গঠনের বিভিন্ন অবস্থা নিম্নোক্ত অবস্থা উপস্থাপন থেকে বোঝা যায়–

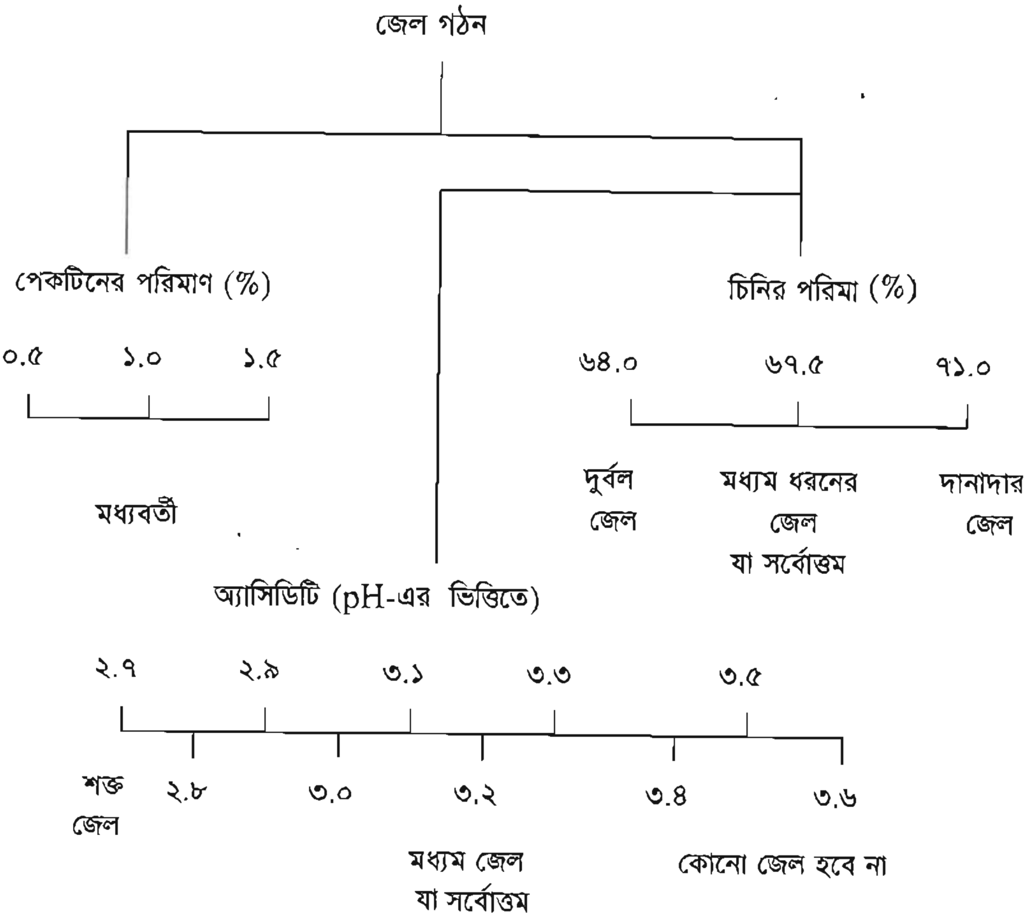

১২.৩ পেয়ারার জেলি :

ভূমিকা : গ্রীষ্মকালীন ফলমুলের মধ্যে পেয়ারা একটি সুশ্রী এবং সুস্বাদু ফল। গ্রীষ্মকালে বরিশাল বিভাগের স্বরূপকাঠি ও কাউখালী এলাকায় প্রচুর পরিমাণে পেয়ারা উৎপাদিত হয়। এছাড়া ঢাকা বিভাগের গাজীপুর জেলার শ্রীপুর এবং ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা অঞ্চলের প্রচুর পেয়ারা উৎপাদিত হয়। এসব অঞ্চলের পেয়ারার রস বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই বলে মৌসুমে অনেক পেয়ারা অপচয় হয়। মৌসুমে এসব এলাকায় পেয়ারার দাম খুব কম থাকে। চাষিরা তাদের উৎপাদিত ফলের ন্যায্য দাম পান না কারণ এসব এলাকায় জেলি তৈরির মত তেমন কোনো কারখানা গড়ে ওঠেনি। আমরা জানি পেয়ারাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে বলে এটি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। জেলি তৈরি করতে পেয়ারার রস,

চিনি, পেকটিন এবং সাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। পেয়ারার জেলি একটি জনবহুল উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু খাদ্য।

উপকরণ :

পেঁয়ারার রস	-	৬০০ গ্রাম
চিনি	-	৪০০ গ্রাম
সাইট্রিক এসিড	-	০৫ গ্রাম

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি :

হ্যান্ড রিফ্রাক্টোমিটার, সসপেন, ছুরি অথবা বটি, চামচ, পাতলা কাপড়।

তৈরির পদ্ধতি

ক) রস নিষ্কাশন:

পরিপুষ্ট কিন্তু বেশি পাকা নয় এমন পেয়ারাগুলো জেলির জন্য বাছাই করে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নেয়া হয়। নরম ও বেশি পাকা ফলগুলো বাদ দেয়া হয় কারণ ভালো মানের জেলি তৈরির জন্য এগুলো অনুপযুক্ত। ধুয়ে নেয়া ফলগুলো এবার টুকরো টুকরো করে কেটে সমপরিমাণ পানিতে সিদ্ধ করতে হয়। সিদ্ধ করার সময় কাঠের হাতল দিয়ে টুকরাগুলিকে নাড়াচাড়া ও ঝাড়ন দিতে হয় যাতে এগুলিতে আঠালো ভাব সৃষ্টি হয়। পেয়ারা সাধারণত ৩৩-৩৫ মিনিট সিদ্ধ করলেই নিঃসৃত রস জেলি তৈরির উপযোগী হয়। অতঃপর পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে রস আলাদা করে নিতে হবে। এ রসের সাথেই বের হয়ে আসে পেকটিন ও এসিড। নিঃসৃত পেকটিন ও এসিড জেলি তৈরিতে সাহায্য করে। রস যতই স্বছ হবে জেলি ততই উজ্জ্বল হবে। এভাবে জেলি তৈরির জন্যে রস তৈরি হয়ে গেল।

খ) জেলি প্রক্রিয়াজাতকরণ :

উপকরণের পরিমাণ অনুযায়ী রস, চিনি, সাইট্রিক এসিড আলাদা করে ওজন নিতে হবে। এবার রসের সাথে চিনি মিশিয়ে জ্বাল দিতে হবে। রান্না চলাকালীন সময় অনবরত নাড়াচাড়া করতে হবে। কাঙ্ক্ষিত গাঢ়ত্বে না আসা পর্যন্ত রান্না চালিয়ে যেতে হবে। মিশ্রণটি মোটামুটি গাঢ় হয়ে এলে রিফ্রাক্টোমিটার দিয়ে ঘন ঘন গাঢ়ত্ব পরীক্ষা করতে হয় এবং মিশ্রণটি ৬৫% টি.এস.এস. আসা পর্যন্ত রান্না করতে হবে। রিফ্রাক্টোমিটার এর অনুপস্থিতিতে শিটিং পরীক্ষার মাধ্যমে জেলি হয়ে যাওয়ার অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব। মিশ্রণটি মোটামুটি গাঢ়ত্বে এলে শিটিং পরীক্ষা করা হয়। শিটিং পরীক্ষার পদ্ধতি হলো– চামচ মিশ্রণের মধ্যে ডুবানো হয় এবং ঠাণ্ডা করে চামচ বেয়ে মিশ্রণটিকে পড়তে দেয়া হয়। যদি এটা এক ধারে না পড়ে শিটের আকারে পড়তে থাকে তাহলে বুঝতে হবে জেলি হয়ে গেছে। টি.এস.এস. ৬৫% হলে বা শিটিং পরীক্ষায় জেলি প্রস্তুত হওয়ার কাছাকাছি বুঝা গেলে সাইট্রিক এসিড সামান্য পানিতে গুলিয়ে মিশ্রণের সাথে যোগ করতে হয় এবং সামান্য একটু জ্বাল দিয়ে অর্থাৎ ৬৬% টি.এস.এস. হলে জ্বাল দেয়া বন্ধ করতে হয় এবং জেলি জীবাণুমুক্ত

বোতলে ঢেলে ছিঁপি এঁটে দেয়া হয়। ঠাণ্ডা হওয়ার পর জেলির উপরে মোম গলিয়ে দেয়া হয়। মোম জমে গেলে ছিপি এঁটে দিয়ে ছিপির চারপাশে মোম দিয়ে বোতলটিকে বায়ুরোধী করা হয়। জেলির বোতল শুকনো ও ঠাণ্ডা স্থানে সংরক্ষণ করতে হয়।

বোতল জীবাণুমুক্তকরণ :

জেলির বোতলগুলোকে সসপেনে পানি নিয়ে তাতে ৩০-৩৫ মিনিট ফুটালে জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়। জেলি তৈরির সময়ই বোতলগুলোকে জীবাণুমুক্ত করা যায়। বোতলগুলোকে গরম পানিতে রাখাই উত্তম। জেলি তৈরি হয়ে গেলে বোতলগুলোকে পাত্র থেকে উঠিয়ে পানি নিংড়িয়ে জেলি ভরা উত্তম।

১২.৫ জ্যামের বৈশিষ্ট্য :

১. জ্যাম তৈরিতে ফলের পাল্প বা শাঁস ব্যবহার করা হয়;
২. জ্যাম দেখতে অনেকটা অর্ধস্বচ্ছ;
৩. জ্যামে পাকা ফল ব্যবহার করা যায়;
৪. জ্যামের সমাপ্তি স্ফুটনাঙ্ক ১০৫.৫° সে.;
৫. জ্যামে মসৃণ তল সৃষ্টি হয় না।

১২.৬ জ্যাম ও জেলির পার্থক্য :

ক্রমিক নং	জ্যাম	জেলি
১.	জ্যাম তৈরিতে ফলের পাল্প বা শাঁস ব্যবহার করা হয়।	১. জেলি তৈরিতে ফলের পরিষ্কার রস ব্যবহার করা হয়।
২.	দেখতে অনেকটা অর্ধস্বচ্ছ।	২. দেখতে স্বচ্ছ।
৩.	আলো প্রতিসরণশীলতা কম।	৩. আলো প্রতিসরণশীলতা বেশি
৪.	পাকা ফল ব্যবহার করা যায়।	৪. সাধারণত অর্ধপাকা ফল ব্যবহার করা হয়।
৫.	এটি কাটা যায়, তবে অতটা সূক্ষ্ম কোনার মতো আকার হয় না।	৫. এটি কাটা যায়, কাটলে কিউবের কোনার মতো আকার হয়।
৬.	এটির সমাপ্তি স্ফুটনাঙ্ক ১০৫.৫° সে.।	৬. এটির সমাপ্তি স্ফুটনাঙ্ক ১০৫° সে.।
৭.	এটিতে মসৃণ তল সৃষ্টি হয় না।	৭. এটিতে মসৃণ তল সৃষ্টি হয়।

জ্যাম ও জেলির কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় :

জেলিগ্রেড (Jelly Grade) : এটি পেকটিনের শক্তি ও বাণিজ্যিক মান (Commercial Value) নির্ধারণ করে। এক গ্রাম পেকটিন যত গ্রাম চিনির সাথে মিলে সন্তোষজনকভাবে জেল গঠন করে চিনির সেই

পরিমাণ দিয়ে পেকটিনের শক্তিকে পরিমাপ করা হয়। যদি জেল গঠনে ১ গ্রাম পেকটিনের সাথে ১০০ গ্রাম চিনির দরকার হয়, তবে পেকটিনটি হবে ১০০ গ্রেডের। ১০০-১৫০ গ্রেডের পেকটিন সাধারণত ব্যবহার করা হয়।

সেটিং টাইম (Setting Time) : সেটিং টাইম হচ্ছে উপাদানগুলো সেট করা ও জেল গঠনের মধ্যবর্তী সময়। যতক্ষণ পর্যন্ত গরম মিশ্রণ ঠাণ্ডা না হবে ততক্ষণ জেল গঠন হবে না। ৮৮° সে. এ দ্রুতসেট করে এবং ৫৪° সে. এর নিচে জেল গঠন আস্তে আস্তে হয়। কম pH তাড়াতাড়ি জেল গঠন করে। লবণ জাতীয় জিনিস জেল গঠন বিলম্বিত করে।

পেকটিনের শক্তি পরীক্ষা (Test of Gel Strength of Pectin) : চিনি, পেকটিন ও অ্যাসিডের তরল মিশ্রণের ১ চামচ ও মিথাইলেডের স্পিরিটের ২ চামচ মেশানো হয়। যদি হালকা তলানি পড়ে তবে পেকটিন হবে দুর্বল, যদি কয়েকটি বড় বড় দানার মতো তলানি পড়ে তবে তা হবে মধ্যসারির পেকটিন এবং যদি একটিমাত্র বড় দলার সৃষ্টি হয়, তবে পেকটিনটি হবে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন। যখন পেকটিন দুর্বল প্রমাণিত হবে তখন প্রয়োজনীয় বহিস্থ পেকটিনের পরিমাণ হিসাব করে বের করতে হবে।

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জেলি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়–

ক. ফলের পাল্প

খ. ফলের শাঁস

গ. ফলের রস

ঘ. ক ও খ উভয়ই

২. জ্যাম ও জেলি তৈরিতে কোনটি সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে?

ক. পেকটিন

খ. সাইট্রিক অ্যাসিড

গ. লবণ

ঘ. মোম

৩. জ্যাম বা জেলি তৈরিতে যে ফলের পাল্প বা রস ও চিনির মিশ্রণ ব্যবহার করা হয় তাতে শতকরা কত ভাগ ফলের পাল্প বা রস থাকতে হবে?

ক. ৪০ ভাগ

খ. ৪৫ ভাগ

গ. ৫০ ভাগ

ঘ. ৬০ ভাগ

৪. জ্যাম বা জেলি তৈরিতে পেকটিনের ভূমিকা কী?

ক. সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে

খ. জমতে সাহায্য করে

গ. রং সুন্দর করে

ঘ. কোনোটিই নয়

৫. কোনটি জেলির সমাপ্তি স্ফুটনাঙ্ক?

ক. ১০৫^{o} সে.

খ. ১৫০^{o} সে.

গ. ১৩০^{o} সে.

ঘ. ১৯০^{o} সে.

৬. নিচের কোনটি সঠিক–

ক. জ্যামের আলো প্রতিসরণশীলতা কম;

খ. জেলির আলো প্রতিসরণশীলতা বেশি;

গ. উভয়টি

ঘ. কোনোটিই নয়।

৭. কোনটি পেকটিনের শক্তি ও বাণিজ্যিক মান নির্ধারণ করে?

ক. জেলিগ্রেড

খ. সেটিং টাইম

গ. উভয়টি

ঘ. কোনোটিই নয়।

৮. নিচের কোনটি সঠিক নয়?

ক. বেশি অম্লতা তাড়াতাড়ি জেল গঠন করে;

খ. লবণ জাতীয় জিনিস জেল গঠন বিলম্বিত করে;

গ. উভয়টি

ঘ. কোনোটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জ্যামের সংজ্ঞা লেখ।

২. জেলির সংজ্ঞা লেখ।

৩. জ্যাম ও জেলির পার্থক্য লেখ।

৪. জ্যাম ও জেলি তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কী কী?

৫. জ্যাম ও জেলি তৈরির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিগুলোর নাম লেখ।

৬. পেকটিনের জেলিগ্রেড বলতে কী বুঝ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জ্যাম ও জেলি তৈরির পদ্ধতি আলোচনা কর?

২. জ্যাম ও জেলি তৈরিতে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপাদান ও যন্ত্রপাতির কাজ বর্ণনা কর।

৩. পেয়ারার জেলি তৈরির পদ্ধতি আলোচনা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
ভিনেগার

১৩.১ ভিনেগার (Vinegar) :

ভিনেগার বা সিরকা আমাদের দেশে বহুল পরিচিত ও বহুল ব্যহহৃত জলীয় দ্রবণ বা ইথাইল অ্যালকোহল থেকে উৎপন্ন। এই জলীয় দ্রবণে অ্যাসিটিক অ্যাসিড (কমপক্ষে ৪%), অ্যালকোহল, সামান্য পরিমাণ এস্টার ও লবণ থাকে। Acclobaer নামক ব্যাকটেরিয়া অ্যালকোহলকে অ্যাসিটিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে। ভিনেগার যদিও ইংরেজি শব্দ তবুও এই শব্দটি একটি ফরাসি শব্দ Vinegare থেকে এসেছে Vinegar শব্দের আভিধানিক অর্থ Sour Wine বা টক ওয়াইন। আচার তৈরিতে ও পোল্ট্রি ফার্মে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণে এর ভূমিকা যথেষ্ট।

যে খাদ্য সংরক্ষণ বা তৈরিতে ভিনেগার ব্যবহৃত হয় সেই খাদ্যের গুণগতমান বেশ কিছুটা নির্ভর করে ব্যবহৃত ভিনেগারের উপর। বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন শক্তিমাত্রায় ভিনেগার তৈরি করা যায়। এখানে এদের সম্পর্কে শুধুমাত্র মৌলিক ধারণা দেয়ার জন্য অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

বিভিন্ন প্রকারের ভিনেগার : ভিনেগার বিভিন্ন ফল বা চিনি থেকে তৈরি করা হয়। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভিনেগার সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

সাইডার ভিনেগার (Cider Vinegar) : আপেলের রস ফার্মেন্টেশন করে যে ভিনেগার তৈরি করা হয় তাকে আপেল সাইডার ভিনেগার বা সংক্ষেপে সাইডার ভিনেগার বলে। এতে কমপক্ষে প্রতি ১০০ মিলিলিটারে ১.৬ গ্রাম আপেল সলিড (Apple Solid) থাকবে যার ৫০% এর বেশি থাকবে বিয়োজিত (Reducing) চিনি এবং ২০° সে. তাপমাত্রায় প্রতি ১০০ মিলিলিটারে কমপক্ষে ৪ গ্রাম অ্যাসটিক অ্যাসিড থাকবে।

মদ বা আঙুরের ভিনেগার : আঙুরের রস ফার্মেন্টেশন করে আঙুলের ভিনেগার তৈরি করা যায়। এতে ২০° সেঃ তাপমাত্রায় প্রতি ১০০ মিলিলিটারে থাকবে কমপক্ষে ১ গ্রাম আঙুরের সলিড (Grape Solid), ০.১৩ গ্রাম আঙুরের খনিজ লবণ (Grape Ash) ও ৪ গ্রাম অ্যাসিটিক অ্যাসিড।

স্পিরিট ভিনেগার : তরল ইথাইল অ্যালকোহলে অম্লীয় ফার্মেন্টেশন করে এই ভিনেগার তৈরি করা হয়। ২০° সে. তাপমাত্রায় প্রতি ১০০ মিলিলিটারে এতে কমপক্ষে ৪ গ্রাম অ্যাসিটিক অ্যাসিড থাকবে। ক্যারামেল দিয়ে একে রঙিন করা যায়। এই ভিনেগারকে দানা ভিনেগার (Grain Vinegar) বা পাতিত ভিনেগার (Distilled Vinegar) বলা হয়ে থাকে। পাতিত ভিনেগারকে সাদা ভিনেগারও বলা হয়।

মাল্ট ভিনেগার (Malt Vinegar) : এ ভিনেগার অঙ্কুরিত বার্লি বা অন্য কোনো দানা শস্য থেকে তৈরি করা হয়। শর্করা বা চিনি অ্যালকোহলে রূপান্তরিত হয় এবং অ্যালকোহল অ্যাসিটিক ফার্মেন্টেশনের মাধ্যমে ভিনেগারে রূপান্তরিত হয়। ২০° সে. তাপমাত্রায় এতে প্রতি ১০০ মিলিলিটারে কমপক্ষে ৪ গ্রাম অ্যাসিটিক অ্যাসিড থাকবে।

অন্যান্য ভিনেগার : কমলালেবু, আনারস, পাকা কলা, নাশপতি, পিচ ইত্যাদি থেকেও ভিনেগার তৈরি করা যায়।

১৩.২ আদর্শ ভিনেগারের বৈশিষ্ট্য :

ভিনেগারে সাধারণত ৪-১০ গ্রাম অ্যাসিটিক অ্যাসিড (প্রতি ১০০ সিসি পানির দ্রবণে) থাকে। অন্যান্য অ্যাসিড, রঙিন দ্রব্য, খনিজ লবণ এবং কিছু অন্যান্য দ্রব্য থাকতে পারে। এতে ক্ষতিকর মাত্রায় (০.০১৪৩ মিলিগ্রাম প্রতি ১০০ মিলিলিটারে) আর্সেনিক থাকবে না এবং কোনো খনিজ এসিড, সীসা, তামা বা ক্যারামেল ছাড়া অন্য কোনো রং থাকবে না। এটাই আদর্শ ভিনেগারের বৈশিষ্ট্য।

১৩.৩ ভিনেগার প্রস্তুতপ্রণালি :

মূলনীতি

ভিনেগার তৈরিতে দুটি রাসায়নিক ধাপ বিদ্যমান- $\frac{\text{ভিনেগার ব্যাকটেরিয়া}}{\text{অ্যাসিটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া}}$

১. ফলের চিনি জাতীয় দ্রব্যের অ্যালকোহলে রূপান্তর এবং

২. উৎপন্ন অ্যালকোহলের অ্যাসিটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিতে ভিনেগার রূপান্তর।

(১) $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow[\text{চিনি}]{\text{ঈস্ট}} 2C_2H_5OH + 2CO_2$

(২) $\underset{\text{অক্সিজেন}}{2C_2H_5oH + 20_2} \xrightarrow[\text{অ্যাসিটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া}]{\text{ভিনেগার ব্যাকটেরিয়া}} \underset{\text{অ্যাসিটিক অ্যাসিড পানি}}{2CH_3COOH + H_2O}$

পদ্ধতি

অ্যালকোহলের পূর্ণ জারণের জন্য অ্যালকোহলের ঘনত্ব ১০-১৩% দরকার হয়। ভিনেগার প্রস্তুতের জন্য সাধারণত ৩টি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন-

i. ওরলিন (Orlean) পদ্ধতি।

ii. ট্রিকল (Trickle) বা Generator পদ্ধতি।

iii. সাবমার্জড অক্সিডেশন (Submerged Oxidation) পদ্ধতি।

১. **Orlean পদ্ধতি :** বাণিজ্যিকভাবে ভিনেগার উৎপাদনের জন্য এটা একটা পুরাতন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কতকগুলো ব্যারেল অনুভূমিকভাবে স্থাপন করে উপরের দিকে কতকগুলো ছিদ্র করা হয়। এই ছিদ্র দিয়ে বায়ু ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। এবার ঐ পাত্রে ২ ভাগ ভিনেগার এবং ৩ ভাগ ওয়াইন দ্বারা পূর্ণ করা হয়। এক্ষেত্রে পাস্তুরিত Wine ব্যবহার করা ভালো। যেহেতু অ্যাসিটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া অম্লীয় মাধ্যমে ভালো জন্মে; তাই ভিনেগার ব্যবহার মাধ্যমটি অম্লীয় করা হয়। তাছাড়াও অম্লীয় মাধ্যম অন্যান্য অণুজীবের বৃদ্ধিকে ব্যহত করে। ফার্মেন্টেশনের তাপমাত্রা ২১° সে. রাখতে হয়, তবে এর চেয়ে কিছুটা বেশি হলেও অসুবিধা হয় না। নির্দিষ্ট সময় পর পর কিছু পরিমাণ ভিনেগার বের করে নেয়া হয়। একই সঙ্গে নতুন ওয়াইন প্রয়োগ করা হয়। যদিও এটা খুব ধীর পদ্ধতি তবুও এটা গৃহপর্যায়ে ব্যবহার করা হয়।

২. **Trickle বা Generator পদ্ধতি :** এই পদ্ধতির জন্য বড় কাঠের ট্যাংক বা Generator ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে Beech wood shaving কাঠ কয়লা, চারকোল ইত্যাদি ভ্যাট বা কলামের মতো সাজানো হয় যেন বাতাস ট্যাংকের তলদেশে পৌছাতে এবং উপরের দিকে ফিরে আসতে পারে। প্রথমে অ্যাসিটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়াকে কাঠপৃষ্ঠে জন্মানো হয়। ব্যাকটেরিয়ার জন্য উপযোগী (২৮-৩৫° সে.) তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। পরে উপর থেকে ১০-১৩% অ্যালকোহলীয় দ্রবণ ধীরে ধীরে প্রবেশ করানো হয় যার ফলে ভিতরে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়ার সাথে মিশ্রিত হতে পারে। একই সঙ্গে উপর থেকে বিশুদ্ধ বায়ুও প্রবেশ করানো হয়। এভাবে সমগ্র তরল নিচে পৌছাতে পৌছাতে অ্যালকোহল জারিত হয়ে ভিনেগারে পরিণত হয়। পূর্ণভাবে জারিত না হলে ঐ পদ্ধতি চক্রাকারে আবার ঘটানো হয়। একটি ২০ ফুট উচ্চতায় এবং ১০ ফুট ব্যাসের ট্যাংকে প্রতিদিন ৪০ থেকে ১০০ গ্যালন ভিনেগার উৎপাদন করা যায়।

৩. **নিমজ্জিত জারণ (Submerged Oxidation) পদ্ধতি :** অন্য দুটি পদ্ধতি থেকে এই পদ্ধতির পার্থক্য হচ্ছে অ্যালকোহলীয় দ্রবণের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া নিমজ্জিত অবস্থায় সমভাবে মিশ্রিত হয়। এক্ষেত্রে ভিতরে Acetobacter-এর বৃদ্ধির জন্য যে তাপমাত্রার প্রয়োজন তা স্থির রাখা হয়। বাহির থেকে O_2 সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। এই পদ্ধতিতে ৯০-৯৮% অ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপাদন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যে Generator ব্যবহার করা হয় তার নাম Cavitor। যদি এই পদ্ধতিতে ভিনেগার তৈরির সময় অনেকক্ষণ ধরে প্রবাহিত করা হয় তবে ভিনেগারের গাঢ়ত্ব কমে যেতে পারে।

প্রশ্নমালা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. ভিনেগার শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

(ক) গ্রিক
(খ) ফরাসি
(গ) পর্তুগিজ
(ঘ) ল্যাটিন

২. ভিনেগারে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের শতকরা পরিমাণ কত?

(ক) ২% - ৫%
(খ) ৫% - ১৫%
(গ) ৪% - ১০%
(ঘ) ২০% - ৩০%

৩. ভিনেগার ব্যবহার হয়–

(ক) আচার তৈরিতে
(খ) পোল্ট্রি ফার্মে
(গ) খাদ্যসামগ্রী সংলক্ষণে
(ঘ) উপরের সবগুলো

৪. দানা বা পাতিত ভিনেগার বলা হয়–

(ক) সাইডার ভিনেগারকে
(খ) স্পিরিট ভিনেগারকে
(গ) মাল্ট ভিনেগারকে
(ঘ) ওয়াইন ভিনেগারকে

৫. অ্যালকোহল পূর্ণ জারণের জন্য কত ঘনত্বের অ্যালকোহল দরকার হয়?

(ক) ২ - ৩%
(খ) ৬ - ৮%
(গ) ১০ - ১৩%
(ঘ) ১৫ - ১৭%

৬. সাইডার ভিনেগার তৈরি হয়–

(ক) আপেল থেকে

(খ) আম থেকে

(গ) কলা থেকে

(ঘ) কোনোটিই নয়।

৭. স্পিরিট ভিনেগার তৈরি হয়–

(ক) আপেল থেকে

(খ) আম থেকে

(গ) কলা থেকে

(ঘ) তরল ইথাইল অ্যালকোহল থেকে।

৮. মাল্ট ভিনেগার তৈরি হয়–

(ক) আপেল থেকে

(খ) অঙ্কুরিত বার্লি থেকে

(গ) কলা থেকে

(ঘ) উপরের সব কয়টি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ভিনেগারের সংজ্ঞা লেখ।

২. ভিনেগারের ব্যবহার লেখ।

৩. ভিনেগারের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

৪. আদর্শ ভিনেগারের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

৫. ভিনেগার প্রস্তুতির মূলনীতি উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভিনেগার বলতে কী বোঝ? ভিনেগারের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

২. মূলনীতিসহ ভিনেগার প্রস্তুতির যে কোনো একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

ব্যবহারিক-১৪
জলপাইয়ের আচার প্রস্তুতকরণ

জলপাই-এর মিষ্টি আচার প্রস্তুতকরণ :

রেসিপি :

জলপাই	—	৪ কেজি
লবণ	—	৪০ গ্রাম
আখের গুড়	—	২ কেজি
শুকনা মরিচ ভাজা গুঁড়া	—	১০ গ্রাম
লবণ	—	৩০ গ্রাম
রসুন বাটা	—	১০ গ্রাম
মৌরী ভাজা গুঁড়া	—	৫০ গ্রাম
সরিষার তেল	—	মাখা মাখা

প্রস্তুত প্রণালি :

১) পরিষ্কার, পুষ্ট জলপাই ডুবো পানিতে সিদ্ধ কর এবং পানি ঝরিয়ে হাতে ভেঙ্গে টুকরা কর এবং ট্রেতে করে রোদে শুকাতে দাও। ২ ঘণ্টা শুকালেই হবে।

২) গুড় ও লবণ জলপাইর সাথে মিশিয়ে তাপ দাও এবং ঘন ঘন নাড়তে থাকো। ভালোভাবে ফুটলে নামিয়ে দাও। গুঁড়া মশলা এবং তেল মিশিয়ে রোদে দাও। পানি শুকিয়ে চটচটে হলে বোতলে ভর।

ব্যবহারিক-১৫
কাঁচা আমের আচার প্রস্তুতকরণ

কাঁচা আমের আচার প্রস্তুতকরণ :

পিকলিং:

পুষ্ট কাঁচা আম বোঁটা ছাড়িয়ে ভালো করে পানিতে ধুয়ে বোঁটার অংশ কেটে ফেলো। আমকে ফালি কর এবং বিচি ফেলে দাও। এবার আমের ফালি একটি ঢাকনাসহ প্লাস্টিকের বালতিতে নিয়ে তাতে লবণ এবং হলুদের গুঁড়া মিশাও এবং ঢাকনা দিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখে দাও।

আমের ফালি	—	১০ কেজি
লবণ	—	২ কেজি
হলুদের গুঁড়া	—	১০ গ্রাম

দু'দিন পর এতেও আরও লবণ যোগ কর যাতে দ্রবণে লবণের ঘনত্ব ২৫% হয়। এবার আমের ফালির উপর কাঠের টুকরা রেখে ওজন চাপিয়ে দাও যাতে করে আমের ফালি পানিতে ডোবে। এ অবস্থায় আম বহুদিন পর্যন্ত ভালো থাকবে। এই পিকেল করা আম থেকে যে কোনো সময় আচার বানান যাবে।

লিচিং :

পিকেল করা থেকে অতিরিক্ত লবণ পানি দ্বারা ধুয়ে অপসারিত করার পদ্ধতিকে লিচিং বলা। এক্ষেত্রে আমের ফালিকে দীর্ঘ সময় ধরে অধিক পানিতে ডুবিয়ে রেখে দুই তিন বার পানি বদলিয়ে তার লবণাক্ততা দূর করা হয়। এভাবে আমের লবণাক্ততা দূর করা হয়। এভাবে আমের লবণাক্ততা সঠিক মাত্রায় হলে তা থেকে আচার প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

রেসিপি :

আমের ফালি	—	২৫০০ গ্রাম
চিনি	—	১০০ গ্রাম
সরিষা গুঁড়া	—	৭৫ গ্রাম
গুঁড়া হলুদ	—	৫০ গ্রাম
মেথি (আধা ভাঙ্গা)	—	১০০ গ্রাম

গোল মরিচ গুঁড়া	—	১০ গ্রাম
লং	—	২ গ্রাম
দারুচিনি	—	৫ গ্রাম
সফ (মৌরী)	—	১০ গ্রাম
কালিজিরা	—	১০ গ্রাম
গুঁড়া মরিচ	—	৪০ গ্রাম
এসিটিক এসিড	—	৫ মিঃ লিঃ
সরিষার তেল	—	এমন পরিমাণে দিতে হবে যেন আম তেলের মধ্যে ডুবে থাকে।

প্রস্তুত প্রণালি :

১) আমের ফালি থেকে পানি ঝরিয়ে নাও।

২) সমস্ত মশলা হালকা তাপে অল্প তেলে ভাজো এবং তাতে আমের ফালি মিশিয়ে গরম কর। চিনি এবং এসিটিক এসিড মিশাও।

৩) এরপর জীবাণুমুক্ত শুকনো বোতলে মশলাসহ আম ভর এবং হালকা গরম তেলে ডুবিয়ে দাও।

৪) মুখা এমনভাবে বন্ধ কর যেন বাতাস ঢুকতে না পারে।

ব্যবহারিক-১৬
আলুর চিপস প্রস্তুতকরণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১. স্লাইসার
২. চাকু
৩. সসপ্যান
৪. তারজালির ঝুড়ি
৫. সোলার ড্রায়ার
৬. প্লাস্টিক বোল
৭. খাবার লবণ
৮. প্যাকেজিং সামগ্রী ইত্যাদি ।

প্রস্তুতপ্রণালি :

১. মধ্যম আকারের আলু বাছাই করে পরিষ্কার পানি দ্বারা ভালো করে ধুয়ে নাও ।
২. চাকু অথবা স্লাইসার যন্ত্রের সাহায্যে যতটা সম্ভব পাতলা করে স্লাইস কর এবং পানিতে অথবা লবণে ডুবিয়ে রাখো । এতে করে আলুর ফালি কালো হবে না ।
৩. তারজালির ঝুড়িতে স্লাইসগুলো নিয়ে ফুটন্ত পানিতে ৫-৭ মিনিট ডুবিয়ে ব্লানচিং করে নাও ।
৪. পানি ঝরিয়ে পড়লে ড্রাইং করে ফুটন্ত তেলে ১১৫° সে. তাপে এমনভাবে ভেজে নাও যেন চিপসের রং হালকা বাদামি হয় এবং খেতে মচমচে লাগে ।
৫. চিপস থেকে ভালো করে তেল নিংড়াও । দরকার হলে তারজালির ঝুড়িতে করে ঝুলিয়ে রাখো ।
৬. অতিরিক্ত তেল ঝরে গেলে তাতে কেজিপ্রতি ১৫-২০ গ্রাম পাউডার লবণ এমনভাবে ছিটিয়ে দাও যেন সর্বত্র সমানভাবে লবণ পৌঁছে ।
৭. চিপস ঠান্ডা হলে সেলোফেন ব্যাগে প্যাকেট করে সংরক্ষণ কর ।

ব্যবহারিক-১৭

মাছের পিকেল প্রস্তুতকরণ

মাছের পিকেল প্রস্তুতকরণ:

প্রবাহ চিত্র-

মাছ (সামুদ্রিক রিঠা মাছ)

↓

ধোয়া, বাছা ও কাটা

↓

মেরিনেটেড

↓

ভাজা

↓

প্রিকনডিশনিং

↓

মিক্সিং

↓

বোতলজাতকরণ

উপকরণ :

ধোয়া, বাছা ও কাটা মাছ		১ কেজি
রসুন বাটা	—	৭৫ গ্রাম
আদা বাটা	—	৪০ গ্রাম
গুঁড়া মরিচ	—	১৫ গ্রাম
গুঁড়া হলুদ	—	৬ গ্রাম
লবণ	—	৩৫ গ্রাম
সরিষা বাটা	—	১৫ গ্রাম
লং	—	১ গ্রাম
এলাচ	—	১ গ্রাম
জিরা	—	২ গ্রাম
সফ	—	১ গ্রাম

তেঁতুলের পাল্প	—	১৫০ গ্রাম (পানিসহ)
চিনি	—	৩০ গ্রাম (৩০ মিঃ লিঃ) ভিনেগার-এর দ্রবণ)
সরিষার তেল	—	১২০ মিঃ লিঃ

প্রস্তুত প্রণালি :

১) ১ কেজি মাছ ভালো করে বেছে, কেটে এবং ধুয়ে পরিষ্কার করে লবণ ও ভিনেগার দ্রবণে মাখিয়ে তেলে ভাজতে হবে। এরপর ভাজা মাছকে ৪% এসিটিক এসিড এবং ৮% লবণ দ্রবণের সমান অনুপাতের মিশ্রণে ২৪ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে। এভাবে ডুবিয়ে রাখাকে বলা হয় প্রিকনডিশনিং।

২) উপকরণ (খ)-এর সব মশলা হাল্কা তাপে ৫০ মিঃ লিঃ সরিষার তেলে ভাজতে হবে এবং ঠাণ্ডা করতে হবে।

৩) উপকরণ (গ) ৫০ গ্রাম তেঁতুলের সাথে ১৫০ গ্রাম পানি মিশিয়ে পাল্প প্রস্তুত করতে হবে এবং সবটুকু পাল্প গরম করে ঠাণ্ডা করতে হবে।

৪) উপকরণ (ঘ) ৩০ গ্রাম চিনি ৩০ মিঃ লিঃ ভিনেগারে মিশিয়ে দ্রবণ প্রস্তুত করতে হবে। গরম করে ঠাণ্ডা কর।

এবার (২) (৩) ও (৪) নম্বর আইটেম-এর সব কিছু প্রিকনডিশন্ড মাছের সাথে যোগ করতে হবে এবং ভালোভাবে মিশাতে হবে। এখন সবকিছু একসাথে গরম করে বোতলে ভরতে হবে এবং সরিষার তেল দিয়ে মাছ ঢেকে বোতলের মুখ ভালোভাবে বন্ধ করতে হবে।

ব্যবহারিক ১৮

ডিমের পুডিং প্রস্তুতকরণ

রেসিপি–

ঘন দুধ	- ১ কেজি
ডিম	- ১০-১২টি
চিনি	- ২০০-২৫০ গ্রাম
ছোট এলাচ গুঁড়া	- ২-৩টি

প্রস্তুতপ্রণালি :

১. ডিম এবং চিনি ভালো করে ফেটে নাও।

২. দুধ গরম কর এবং ডিম চিনির মিশ্রণের সাথে ভালো করে মিশিয়ে প্যানের মাঝে ছেড়ে দাও।

৩. বড় লোহার কড়াইতে গরম পানির মাঝে প্যান এমনভাবে বসাও যেন প্যানের ২/৩ অংশ পানিতে ডুবে থাকে। চুলার আঁচ মাঝামাঝি করে ১-২ ঘন্টা ফুটাও। পুডিং জমলে নামিয়ে নাও।

৪. প্যান ঠাণ্ডা হলে চাকু দিয়ে পুডিং-এর চারদিক ছাড়াও এবং প্যান উল্টিয়ে থালার উপর পুডিং ঢালো।

ব্যবহারিক-১৯
মিষ্টি দই প্রস্তুতকরণ

উপকরণ	পরিমাণ
দুধ	২ লিটার
চিনি	১২৫ গ্রাম
টক দই	২০ গ্রাম
ঘি	৫ গ্রাম

দই তৈরির পদ্ধতি :

১. ১. ১ কেজি ওজনের একটি মাটির হাঁড়ি পরিষ্কার করে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।

২. ২ কেজি দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে ১ কেজি করতে হবে। ঘন করার সময় ঘি এবং অল্প অল্প করে চিনি দিয়ে নাড়তে হবে যেন সর না পড়ে। উনুন থেকে নামিয়ে উঁচু থেকে দুধ হাঁড়িতে ঢালতে হবে। দুধ অল্প গরম থাকতে ফেটানো টক দই দিতে হবে। হাঁড়ির মুখে ঢাকনা দিয়ে গরম কাপড় দিয়ে ঢেকে এমনভাবে রাখতে হবে যেন নাড়াচাড়া না হয় ৫-৬ ঘণ্টার মধ্যে দই জমবে। ওভেনে খুব মৃদু তাপমাত্রায় বা ৪০° সে. তাপমাত্রায় রাখলেও দই জমে যায়।

মণ্ডা প্রস্তুতকরণ

উপকরণ	পরিমাণ
ছানা	১ কেজি
চিনি	১২৫ গ্রাম

পদ্ধতি :

১. লোহার কড়াইয়ে ২৫০ গ্রাম ছানা ও ১২৫ গ্রাম চিনি মিশিয়ে জ্বাল দিতে হবে। জ্বাল কমিয়ে ছানা কড়াইয়ে ছড়িয়ে রেখে ঘন ঘন নাড়তে হবে।

২. ছানা আঠালো হলে বাকি ছানা মিশাতে হবে। ট্রে বা থালায় ছানা ঢেলে ছড়িয়ে দিতে হবে।

৩. কয়েক ঘণ্টা পরে ছানা সম্পূর্ণভাবে ঠাণ্ডা হলে এবং পানি শুকালে সব মসৃণ করে মাখতে হবে এবং মণ্ডার আকৃতি করে মণ্ড তৈরি করতে হবে। পাতলা কাগজে মণ্ড প্যাকেজিং করতে হবে।

২২. লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট

২২.১ ব্যক্তিত্ব বিকাশ

২২.১.১ ব্যক্তিত্ব বিকাশের তত্ত্বসমূহ :

বিখ্যাত অস্ট্রীয় চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) (১৮৫৬-১৯২৯) শত শত মনোবিকৃত রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে তাদের জীবন ইতিহাস পরীক্ষা করে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্পর্কে কতকগুলো ধারণা তৈরি করেন। ঐসব ধারণার সুশৃঙ্খল সম্পর্ক থেকেই মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের উদ্ভব হয়। এটি একটি মতবাদ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। ব্যক্তিত্বের তত্ত্বগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ও প্রভাব বিস্তারকারকী তত্ত্ব হচ্ছে এই মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Interpretation of Dreams" (1930) এই তত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই তত্ত্বকে Psycho-Theory ও Psycho-Therapy এবং Psychosexual Theory বলে অভিহিত করা হয়।

ফ্রয়েড মানুষের অস্বাভাবিক আচরণ বিশ্লেষণের চেষ্টা চালায়। তিনি বলেন মানুষের প্রতিটি আচরণের পিছনে চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি, স্বপ্ন প্রভৃতি কার্যক্রম বর্তমান থাকে। অর্থাৎ তিনি চেতনা মনের পাশাপাশি অবচেতন মনের কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন। তিনি ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মনকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। যথা–

১. চেতন মন (Conscious mind);
২. অবচেতন মন (Pre-conscious mind) এবং
৩. অচেতন মন (Unconscious mind)।

ফ্রয়েড অবচেতন মনকে মনের মূলস্তর হিসেবে ধরেছেন এবং মানুষের অশান্তির মূলে অতৃপ্ত যৌন প্রবৃত্তিকে দায়ী করেছেন, যা আচরণের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তিনি আরো বলেন, পরিণত বয়সে অতৃপ্ত যৌন প্রবৃত্তি অসমাঞ্জস্য আচরণ হিসেবে বিকশিত হয়। মূলত ফ্রয়েড তার তত্ত্বে মানুষের কর্মকাণ্ডের পিছনে অবচেতন মনকে দায়ী করেছেন এবং অনুসন্ধানমূলক মানবীয় সমস্যা সমাধানের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। আর এর নামই হলো মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব।

ফ্রয়েড তাঁর মনঃসমীক্ষণ মতবাদে ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. ব্যক্তিত্বের গঠন (Structure of Personality);
২. ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Development of Personality) এবং
৩. ব্যক্তিত্বের গতিশীলতা (Dynamics of Personality)।

২২.১.২ অহংবোধ ও গর্ববোধ :

অহংবোধ :

অহং (Ego) : অহং এর কাজ হচ্ছে আদিম সত্তার কামনা ও বাস্তবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। এটি বাস্তবের জ্ঞান দিয়ে বাস্তব সেবায় নিয়োজিত হয়। অহং ব্যক্তির প্রেষণাকে সামাজিকভাবে বাস্তবসম্মত উপায়ে পূরণের চেষ্টা চালায়। এটি আদিম সত্তা ও বাস্তব জগতের মধ্যে মধ্যস্থতা হিসেবে কাজ করে। অহং প্রাণীর কোন কোন কামনা কীভাবে তৃপ্তি লাভ হবে তা নির্দেশ করে বলে একে 'ব্যক্তিত্বের প্রশাসনিক শাখা' বলা যেতে পারে।

অহং (Ego) এর মধ্যে যেসব স্বকীয়তা পরিলক্ষিত হয় তা হলো–

১. অহং (Ego) শক্তি সঞ্চয় করে থাকে আদিম সত্তা (Id) থেকে।
২. এটি বাস্তবতা নীতিতে বিশ্বাসী।
৩. অহং কাল্পনিক বস্তু ও বাস্তব বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করে থাকে।
৪. অহং আদিম সত্তার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রেরণা যোগায়।
৫. অহং (Ego) আদিম সত্তা (Id)-কে সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

গর্ববোধ বা অতি অহংবোধ (Super Ego) :

ব্যক্তিত্ব বিকাশের তৃতীয় সত্তা হচ্ছে অতি অহং (Super Ego)। একে ব্যক্তির বিবেক বলা হয়। এ প্রসঙ্গে **হলো (Hall)** এবং **লিন্ডজে (Lindzey, ১৯৫৭)** বলেছেন, "বিবেক হলো ব্যক্তিত্বের নৈতিক হাতিয়ার। বাস্তবের পাশাপাশি আদর্শের প্রতিফলন ঘটে এর মাধ্যমে। এটি আনন্দের পরিবর্তে পূর্ণতা আনয়ন করে নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতে।"[১৩] শিশুর বিবেক তখনই বিকাশ লাভ করে যখন সে শাস্তি এড়ানোর জন্য সমাজের নিয়ম-কানুনকে নিজের বলে মনে করে। অতি অহং বা বিবেক জন্ম নেয় শিশুকালের শেষের দিকে। শিশু তার ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় শেখার পর তার মধ্যে জন্ম নেয় বিবেক। একে নৈতিকতার ধারক ও বাহক বলা যায়।

তাই অতি অহং-এর কাজগুলো নিম্নরূপ–

১. অহং (Ego) এর বাস্তবধর্মী লক্ষ্যের স্থলে আদর্শধর্মী লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটায়।
২. অহং-এর আবেগকে অবদমন করা।
৩. অতি অহং আনন্দের পরিবর্তে বাস্তবসম্মত পন্থায় পূর্ণতা আনতে চায়।
৪. সার্বিকভাবে পূর্ণতা আনতে প্রেরণা যোগায়।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে ফ্রয়েড প্রদত্ত উপর্যুক্ত সত্তাসমূহ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এসব সত্তা একে অপর থেকে আলাদা নয় বরং পরস্পর নির্ভরশীল। নবজাত শিশুর সবটুকুই আদিম সত্তা। বয়স বাড়তে থাকলে অহং জাগ্রত হয় এবং শেষের দিকে অতি অহং জন্মলাভ করে।

২২.১.৩ স্বার্থপরতা ও আত্ম প্রয়োজনের মধ্যে পার্থক্য :

মানুষ সামাজিক জীব। বিপদে-আপদে সাহায্যের জন্য অন্যের দ্বারস্থ হয়। নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বা নিজের স্বার্থ উদ্বারের জন্য অনেক ক্ষেত্রে পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব কিংবা আত্মীয় স্বজনের সহযোগিতা আশা করে। নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যে কাজ করা হয় তা আত্ম-প্রয়োজনীয় কাজ। অন্যের সহযোগিতায় নিজের প্রয়োজনীয় স্বার্থ উদ্ধার শেষে তার উপকার কিংবা সহযোগিতার বিষয়টি অস্বীকার করা হচ্ছে স্বার্থপরতা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখন স্বার্থপর মানুষের পরিচয় মেলে। বস্তুতপক্ষে স্বার্থপরতা একধরনের জঘন্য অপরাধ। কেউ যখন স্বার্থপর হিসেবে পরিচিতি পায়, তার বিপদে-আপদে কেউ আর এগিয়ে আসে না সবাই তাকে এড়িয়ে চলে। স্বার্থপর মানুষ জীবনে অনেক ক্ষেত্রে সফলতা পায় না। যে কারও জীবনে যে কোনো মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে। কে কখন কোন ধরনের সমস্যায় পড়ে তা বলা মুশকিল। মানুষের বড় বড় সমস্যা সমাজের মানুষের মাধ্যমে তথা পাড়া-প্রতিবেশীর মাধ্যমে সমাধান হয়। যেমন– বিয়ে-শাদি, কেউ অন্যের বিপদে এগিয়ে এলে তার নিজের বিপদেও অন্যেরা এগিয়ে আসবে। তাই সুখী-সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে হলে সমাজের সকল মানুষের প্রতি সহযোগিতা-সহানুভূতি প্রদশর্নের মাধ্যমে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

২২.১.৪ ইতিবাচক ব্যক্তিত্ব গঠনের পদ্ধতি :

ব্যক্তিত্বের গঠন (Structure of Personality) : ফ্রয়েড ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের ব্যক্তিত্বকে তিনটি সত্তায় বিভক্ত করেছেন। এগুলো হলো আদিম সত্ত্ব (Id), অহং (Ego) এবং অতি অহং বা বিবেক (Super ego)। মানুষের ব্যক্তিত্ব এসব সত্তার মাধ্যমেই বিকশিত হয়। এসব সত্তা এমনভাবে সম্পর্কিত যে, এদেরকে পৃথকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। ফ্রয়েড মনে করেন, এসবের স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। নিম্নে ফ্রয়েডের প্রদত্ত তিনটি সত্তার বিবরণ দেয়া হলো–

ক। আদিম সত্তা (Id) : মানুষের জন্মগত জৈবিক সত্তা ও সমস্ত কামনা-বাসনার আধার হলো আদিম সত্তা। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের শক্তি এসব আদিম কামনা থেকেই সঞ্চারিত হয়। আদিম সত্তা যখন পরিবেশের সাথে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তখনই ব্যক্তিত্বের বাকি দুটি সত্তা অহং ও অতি অহং সৃষ্টি হয়। কর্মশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্তিকে উন্নতর পর্যায়ে নিয়ে যায় আদিম সত্তা। আদিম সত্তাকে বলা হয় অবচেতন মনের এক লোভী শিশু। সে বৈধ উপায়ে হোক, আর অবৈধ উপায়ে হোক আনন্দ চায়। এজন্য সে অন্ধের মতো তার জৈবিক প্রেষণাগুলো চরিতার্থ করার জন্য চেষ্টা চালায়। শিশু জন্মের পর সে শুধু আদিম সত্তাকে খুশি করতে চায়। অর্থাৎ তার জৈবিক প্রেষণাগুলো চরিতার্থ করতে পারলেই সে খুশি। এটি জন্মসূত্রে প্রাপ্ত এবং ফ্রয়েড আদিম সত্তাকে মানসিক শক্তির রক্ষণাগার বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ব্যক্তিত্ব গঠনে আদিম সত্তার (Id) যে বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ–

১. আদিম সত্তার সাথে বাস্তব জ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই।
২. অবচেতন মনের অংশ হচ্ছে আদিম সত্তা (Id)।
৩. এটি তৃপ্তি চায়, আনন্দ চায়, এর মধ্যে ভালো-মন্দ বা ন্যায়-অন্যায় বলতে কিছু নেই।
৪. ব্যক্তির অনেক ভুল-ত্রুটি, বিস্মৃতি, বিচ্যুতি Id-এর আকাঙ্ক্ষা থেকে সৃষ্টি হয়।
৫. আদিম সত্তা পরিচালিত হয় 'Pleasure Principle' দ্বারা।

আদিম সত্তা (Id) দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির সুখ অর্জন ও বেদনা লাঘব করে থাকে। যথা–

১. আবর্তক ক্রিয়া (Reflex Action) এবং
২. প্রাথমিক প্রক্রিয়া (Primary Process)।

খ। অহং (Ego) : অহং-এর কাজ হচ্ছে আদিম সত্তার কামনা ও বাস্তবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। এটি বাস্তবের জ্ঞান দিয়ে বাস্তব সেবায় নিয়োজিত হয়। অহং ব্যক্তির প্রেষণাকে সামাজিকভাবে বাস্তবসম্মত উপায়ে পূরণের চেষ্টা চালায়। এটি আদিম সত্তা ও বাস্তব জগতের মধ্যে মধ্যস্থতা হিসেবে কাজ করে। অহং প্রাণীর কোনো কোনো কামনা কিভাবে তৃপ্তি লাভ হবে তা নির্দেশ করে বলে একে 'ব্যক্তিত্বের প্রশাসনিক শাখা' বলা যেতে পারে।

অহং (Ego)-এর মধ্যে যেসব স্বকীয়তা পরিলক্ষিত হয় তা হলো–

১. অহং (Ego) শক্তি সঞ্চয় করে থাকে আদিম সত্তা (Id) থেকে।
২. এটি বাস্তবতা নীতিতে বিশ্বাসী।
৩. অহং কাল্পনিক বস্তু ও বাস্তব বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করে থাকে।
৪. অহং আদিম সত্তার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রেরণা যোগায়।
৫. অহং (Ego) আদিম সত্তা (Id)-কে সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

গ। অতি অহংবোধ (Super Ego) : ব্যক্তিত্ব বিকাশের তৃতীয় সত্তা হচ্ছে অতি অহং (Super Ego)। একে ব্যক্তির বিবেক বলা হয়। এ প্রসঙ্গে হল (Hall) এবং লিন্ডজে (১৯৫৭) বলেছেন, "বিবেক হলো ব্যক্তিত্বের নৈতিক হাতিয়ার। বাস্তবের পাশাপাশি আদর্শের প্রতিফলন ঘটে এর মাধ্যমে। এটি আনন্দের পরিবর্তে পূর্ণতা আনয়ন করে নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতে।"[১৩] শিশুর বিবেক তখনই বিকাশ লাভ করে যখন সে শাস্তি এড়ানোর জন্য সমাজের নিয়ম-কানুনকে নিজের বলে মনে করে। অতি অহং বা বিবেক জন্ম নেয় শিশুকালের শেষের দিকে। শিশু তার ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় শেখার পর তার মধ্যে জন্ম নেয় বিবেক। একে নৈতিকতার ধারক ও বাহক বলা যায়।
তাই অতি অহং-এর কাজগুলো নিম্নরূপ–

১. অহং (Ego)-এর বাস্তবধর্মী লক্ষ্যের স্থলে আদর্শধর্মী লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটায়।
২. অহং-এর আবেগকে অবদমন করা।
৩. অতি অহং আনন্দের পরিবর্তে বাস্তবসম্মত পন্থায় পূর্ণতা আনতে চায়।
৪. সার্বিকভাবে পূর্ণতা আনতে প্রেরণা যোগায়।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে ফ্রয়েড প্রদত্ত উপর্যুক্ত সত্তাসমূহ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এসব সত্তা একে অপর থেকে আলাদা নয় বরং পরস্পর নির্ভরশীল। নবজাত শিশুর সবটুকুই আদিম সত্তা। বয়স বাড়তে থাকলে অহং জাগ্রত হয় এবং শেষের দিকে অতি অহং জন্মলাভ করে।

২২.২ আত্ম-বিশ্লেষণ

২২.২.১ মনোভাব :

মনোভাবের সাহায্যে মানুষ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গতি রক্ষা করে। মনোভাব ব্যক্তির একটি অপেক্ষাকৃত ধীরস্থির মানসিক প্রবণতা। কোনো বস্তু, পরিবেশ এবং ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অনুকূল বা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনাকে মনোভাব বলা যেতে পারে।

নিম্নে মনোভাবের কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা দেয়া হলো :

১. **জি ডব্লিউ, আলপোর্ট** বলেন, "মনোভাব মানসিক ও স্নায়বিক প্রস্তুতিস্বরূপ, যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংগঠিত হয় এবং ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বস্তুর সাথে তার প্রতিক্রিয়ার উপর নির্দেশক ও গতিশীল প্রভাব বিস্তার করে।"
২. **ব্যালাশির** মতে, "ব্যক্তির ক্রমবিকাশের সাথে তার পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর প্রতি তার জ্ঞান, অনুভূতি ও কর্মপ্রবণতা স্থায়ীভাবে সুসংগঠিত হওয়াকে মনোভাব বলে।"
৩. **মারফি ও নিউকমব** বলেন, "কোন বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে যাওয়ার পূর্বপ্রস্তুতিকে মনোভাব বলে।"
৪. **ডি. জে. বেম** বলেন, "ব্যক্তিবিশেষ, বস্তু, ধারণাসমূহ বা ঘটনাবলি সম্পর্কে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক মূল্যায়নকে মনোভাব হিসেব সংজ্ঞায়িত করা যেতে পরে।"

মনোভাবের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে তিনটি উপাদান পাওয়া যায়, যথা :

১। কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধে অবহিতমূলক বিশ্বাস (Cognative Belief),
২। কোনো বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে মূল্যায়নের অনুভূতি (Affective) এবং
৩। ব্যবহার সম্বন্ধীয় (Behaviour)।

কিছুসংখ্যক মনোবিজ্ঞানী অবশ্য প্রস্তাব করেছেন যে, এই তিনটি উপাদান মিলেই মনোভাব সৃষ্টি হয়। সুতরাং বলা যায় যে, মনোভাব হলো ব্যক্তির মানসিক উদ্দীপনা, যা বস্তু সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে আবেগিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মনোভাব জাগ্রত হয়।

২২.২.২ ইতিবাচক ইচ্ছা :

কোনো একটি কাজ করার জন্য যখন কেউ ইচ্ছা পোষণ করে, তখন তার ইচ্ছায় Positive ও Negative দুটি দিক থাকে। Positive ইচ্ছা হলো ইতিবাচক উপলব্ধি।
কোনো কাজে আগ্রহ হলে সেটি তার কাজের পক্ষে হলে তাকে ইতিবাচক উপলব্ধি বলে, আর বিপক্ষে হলে নেতিবাচক উপলব্ধি বলে। ভালো কাজে ইতিবাচক উপলব্ধি থাকলে কাজ করতে আগ্রহ হয় এবং কাজের পরিপূর্ণতা লাভ করা যায়। ভাল কাজে ইতিবাচক উপলব্ধি থাকা মানুষের কাম্য।

সুতরাং বলা যায় যে, কোনো কাজের প্রতি আগ্রহ, অনুভূতি, মনোভাব ও ইচ্ছা হাঁ-বোধক হলেই তাকে ইতিবাচক উপলব্ধি বলা যায়।

২২.২.৩ আত্মবিশ্বাস :

নিজের প্রতি নিজের বিশ্বাস বা আস্থা তৈরি হওয়াকে আত্মবিশ্বাস গঠন বলে। নিম্নোক্ত উপায়ে একজন ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস গঠন হয়ে থাকে :

১। **দৃঢ় মনোবল :** মনোবল নির্দিষ্ট করে সঠিকভাবে বিশ্বাসের সাথে কাজ করাকে দৃঢ় মনোবল বলে। আর আত্মবিশ্বাস গঠনে মনোবল মজবুত হতে হবে।

২। **পরিকল্পনা :** কোনো কাজ করার জন্য আগাম চিন্তা-ভাবনাকে পরিকল্পনা বলে। আত্মবিশ্বাস গঠনে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই পরিকল্পিতভাবে কাজ করতে হবে।

৩। **আস্থা ও বিশ্বাস :** কোনো কাজ করার জন্য অব্যশই আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরিউক্তভাবে আত্মবিশ্বাস গঠনে একজন ব্যক্তিকে সহায়তা করে থাকে।

২২.২.৪ আত্মউদ্বুদ্ধকরণের ধাপ :

একজন ব্যক্তির সকল কাজের সফলতা নির্ভর করে উদ্বুদ্ধকরণের উপর। কারণ মানুষই ঐসব কার্য সম্পাদন করে এবং মানুষ প্রেষিত না হলে সে কার্যসম্পাদনে স্বতঃস্ফূর্ততা লাভ করে না, যা সফলতার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় উপাদান।

মূলত উদ্বুদ্ধকরণ ইচ্ছা মানুষের মনের একটি অন্তর্নিহিত শক্তি (Force), যা তার আচরণকে গতিময় করে তোলে, উদ্দেশ্য অর্জনকে সফল করে তোলে। মানুষের ভেতর এরূপ শক্তি বা উদ্বুদ্ধকরণ যত প্রবল হবে, তার আচরণ তত বেশি গতিময়তা লাভ করে, সাফল্যজনকভাবে উদ্দেশ্য অর্জন করবে। সুতরাং এককথায় বলা যায়, অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা পরিচালিত সক্রিয়তা বা গতিময়তাই হলো উদ্বুদ্ধকরণ।
অর্থাৎ এর দ্বারা মানুষের ভেতর এমন একটি কর্মপ্রেরণা জাগিয়ে তোলা হয় যার দ্বারা মানুষ তার ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।

২২.২.৫ কর্মপ্রেরণার উপাদান :

প্রেষণা : প্রেষণা হলো কাজের প্রতি ব্যক্তির ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। প্রেষণা হলো অন্তর্নিহিত শক্তি, যা মানুষকে কোন কাজে চালিত করে। কার্য লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর্মীদের কার্যক্ষমতা পূর্ণ ব্যবহার করতে চালিত বা প্রণোতি করাকে প্রেষণা বলে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা :

১. **Heilmen and Honnstein-** এর মতে, "কাজের প্রতি ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষাই হলো প্রেষণা।"

২. **D. E. Mefarland-**এর মতে, "প্রেষণা এমন একটি প্রক্রিয়া বা পন্থা যা মানুষের প্রবল ইচ্ছা, বিশেষ প্রচেষ্টা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা উদ্যম, চাহিদা তার আচরণ পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যাখ্যা করে।"

উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, কোনো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যে প্রক্রিয়ায় কর্মীদের অধিকতর কার্যস্পৃহা, উদ্যম, বিশেষ প্রচেষ্টা ও পূর্ণ কার্যদক্ষতা নিয়ে কাজে ব্রতী হতে অনুপ্রাণিত করা হয়, তাকে প্রেষণা বলে।

প্রেষণা কর্মীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির সহায়ক : কর্মীদের কর্মস্পৃহা বস্তুগত প্রেষণা বৃদ্ধি করে। প্রেষণার মাধ্যমে কর্মীদের ন্যায্য বেতন ও পারিশ্রমিক, বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও যাতায়াত সুবিধা, চাকরির জন্য অনুকূল পরিবেশ, চাকরির নিরাপত্তা, ভবিষ্যতে চাকরির নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। এর ফলে কর্মীদের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়, তাদের কোনো ধরনের চিন্তা না থাকলে তারা প্রতিষ্ঠানকে ভালোবাসতে পারে নির্দ্বিধায়, তাদের কাজের প্রতি ভালোবাসা জন্মাতে পারে। ফলে তাদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের কাজের প্রতি আরও ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারে। ফলে তারা আরও দক্ষ হয়।

২২.২.৬ প্রেষণা ও প্রেষণার কৌশল :

প্রেষণা : কাজের প্রতি ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষাই হলো প্রেষণা। ইংরেজি Motivation কথাটি এসেছে Motive হতে যার অর্থ প্রেষণা বা চালিকাশক্তি বা স্বতঃস্ফূর্ততা।

মাইকেল জুসিয়ার্স বলেন, "অনুপ্রেরণা হলো ব্যবস্থাপক কর্তৃক সে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ, যা কর্মীদের নির্দিষ্ট কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করতে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও প্রণোদিত করে।"

প্রেষণা হলো একটি মানসিক প্রক্রিয়া যা দ্বারা কর্মচারী ও শ্রমিকদের মনে কর্তব্যের প্রতি আকর্ষণ জাগে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে এবং স্বেচ্ছায় তারা তাদের শক্তি ও বুদ্ধির পূর্ণ ব্যবহার করতে ইচ্ছুক হয়।

কর্মীদের প্রেষণাদানের বিভিন্ন কৌশল

১. অধিক আর্থিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কর্মচারীদের অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে।

২. বিভিন্ন বিষয়ে কর্মচারীদের কার্যসম্পাদনে উৎসাহিত করা যায়।

৩. চাকরির সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেও কর্মীদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন করা যায়। এতে কর্মীরা দায়িত্বশীল হয়।

৪. অফিসের কর্মচারীদের কর্মের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেও তাদের কর্মস্পৃহা জাগ্রত করা যায়।

৫. কর্মীদের কার্যের প্রতি মনোযোগী করে তুলতে হলে তাদের চাকরির নিরাপত্তা বিধান করা প্রয়োজন।

৬. প্রতিষ্ঠানে একজন গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাশীল ব্যাক্তি হিসেবে প্রত্যেক কর্মচারীকে স্বীকৃতি প্রদান করলে তারা কার্যের প্রতি অধিক মনোযোগী হবে।

৭. প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের সঠিক পদোন্নতি দানের ব্যবস্থা থাকলে তারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কার্যসম্পাদনে মনোনিবেশ করে থাকে।

৮. কর্মীদের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিলে তারা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয় এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠানের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে মনে করে থাকে।

৯. প্রতিষ্ঠানের অর্জিত মুনাফায় অংশগ্রহণ, বাসস্থান, বিভিন্ন প্রকার পুরস্কার প্রদান ও যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমেও কর্মীদের সাফল্যজনকভাবে প্রেষণা দান করা যায়।

প্রেষণাদানের পদক্ষেপসমূহ :

১. **প্রকৃতি নির্ণয় :** প্রথমত ব্যবস্থাপনাকে কর্মীর স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ, কর্মস্পৃহা ও ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহের প্রকৃতি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিরূপণ করতে হবে। এরপর প্রয়োজনগুলো কীভাবে মেটানো যায় তা বিচার-বিবেচনা করতে হবে।

২. **প্রেষণার যথার্থতা বিচার :** প্রেষণার প্রকৃতিগত অবস্থা সঠিকভাবে নিরূপণের পর প্রেষণার উপকরণসমূহের যথার্থতা, কার্যকারিতা এবং উপায় সঠিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে স্থির করতে হবে।

৩. **প্রেষণার উপকরণসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ :** এরপর প্রেষণা ও এর উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে।

৪. **বিকল্প প্রেষণাদানের ব্যবস্থা :** নির্ধারিত উপায়ে কোনো কারণে প্রেষণাদান সম্ভব না হলে ব্যবস্থাপনাকে অবশ্যই বিকল্প উপায়ে প্রেষণাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. **মূল্যায়ন বা যাচাই :** সর্বশেষ প্রেষণাদানের পদক্ষেপ হলো প্রেষণাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে মূল্যায়ন করা। কেননা প্রেষণার বিভিন্ন পদক্ষেপ হতে কিরূপে ফল লাভ করা গেছে, তা যুক্তিযুক্তভাবে ব্যবস্থাপনাকে যাচাই করে দেখতে হবে।

২২.৩ দলগত কাজে দক্ষতা

২২.৩.১ সমঝোতা এবং গতিশীলতা :

সাধারণত দলীয় ঐক্যই হলো সংহতি। দলের যে সকল ব্যক্তিবর্গ একত্রে কাজ করে তাদের মধ্যে একতা, ঐক্য, একমত পোষণ করাই হলো সংহতি সৃষ্টি। অর্থাৎ যে কোনো লক্ষ্যকে কার্যে বাস্তবায়ন করতে কর্মে নিয়োজিত সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তার মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ঐকমত্য হওয়াই সদস্যদের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি। সমন্বয়ের ফলে যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের বিভিন্ন বিভাগ ও সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা সম্ভব হয়। ফলে দলবদ্ধ প্রচেষ্টা জোরদার হয়, সংগঠন মজবুত হয় এবং সামগ্রিক কার্য একটি অখ- কার্যের মর্যাদা লাভ করে। তাই লক্ষ্যার্জনের জন্য সুশৃঙ্খল দলীয় প্রচেষ্টা ও সকল কাজের যুক্তিযুক্ত সমন্বয় সৃষ্টি এবং দলীয় সকল সদস্যের মধ্যে ঐকমত্য পোষণই হলো সংহতি সৃষ্টি।

সুতরাং বলা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগঠনে নিয়োজিত সকল কর্মচারী-কর্মকর্তা ও সকল ব্যক্তিক প্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করে দলীয় প্রচেষ্টা জোরদার ও শৃঙ্খলা বিধানের কাজকেই সংহতি সৃষ্টি বলে।

২২.৩.২ দলে কাজ করার কৌশল :

সাধারণত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে মিলিত হয়ে কোনো কার্য সম্পাদন করলে তাকে দলবদ্ধ কার্য বলে। দলবদ্ধ কার্য এমন এক পদ্ধতি, যা গঠনমূলক দলীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকার উন্নয়ন এবং তাদের ব্যক্তিগত, দলীয় বা সমষ্টিগত সমস্যা অধিকতর কার্যকরভাবে মোকাবেলায় সহায়তা করে। দলীয়কার্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সদস্যদের স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগীয় ও শারীরিক বিকাশ সাধনের সাথে সাথে তারা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত দলীয় লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য লাভ করে থাকে।

কোনো ব্যক্তির একার পক্ষে যে কার্য সম্পাদন করা সম্ভব নয়, তা দলবদ্ধভাবে অল্প সময়ে, দ্রুত ও সফলতার সাথে সম্পাদন করা সম্ভব। দলবদ্ধ কার্যের মাধ্যমে দলীয় সদস্যদের ব্যক্তিগত, আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করা যায়। দলীয় সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ ও সমস্যা মেটানোর মাধ্যমে দলীয় লক্ষ্যার্জনে সক্ষম করে তুলে।

২২.৩.৩ দলে নেতৃত্ব :

দলীয় নেতৃত্ব বলতে দলের সদস্যদের আদেশ দান করার এবং আদেশের প্রতি সদস্যদের আনুগত্য আদায় করার ক্ষমতা ও অধিকারকে বুঝায়।

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে অর্থপূর্ণ নেতৃত্ব বলা যেতে পারে। যখন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে এমন আচরণ বজায় থাকে যাতে অধস্তন কর্মচারীরা উক্ত সিদ্ধান্ত সাদরে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়, তখন তাকে দলীয় নেতৃত্ব বলা হয়।

প্রমাণ্য সংজ্ঞা : বিভিন্ন ব্যবস্থাপনাবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দলীয় নেতৃত্বের সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো :

১. **হল্যান্ড ও জুনিয়রের মতে,** "নেতৃত্ব হচ্ছে একটি দ্বিমুখী প্রভাবের সম্পর্ক। অর্থাৎ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নেতা ও অনুগামীদের আদান-প্রদানের সম্পর্ক রয়েছে।"

২. **ড. হামিদা আক্তার বেগম বলেন,** "নেতৃত্ব বলতে কোন পরিস্থিতিতে নেতা ও অনুগামীদের সম্পর্কের ফলকে বোঝায়।"

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, দলীয় নেতৃত্ব হচ্ছে দলের উধ্বর্তন কর্মকর্তা কর্তৃক অধস্তন কর্মচারীদের আদেশ দান এবং আদেশ পালনে বাধ্য করার অধিকার। যদিও এ নেতৃত্ব অর্থবহ করে তোলার জন্য প্রতিটি কাজের সঙ্গে তাকে উপর হতে নিচের দিকে গতি বজায় রাখার প্রয়োজনকে বুঝায়।

২২.৩.৪ দলীয় হতাশা :

দলের সদস্যদের মধ্যে কমবেশি হতাশা থাকতে পারে। যথাসম্ভব এই হতাশা দূরীকরণ সমীচীন। দলের এই সদস্যদের হতাশা দূরীকরণের জন্য নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম লক্ষ রাখতে হবে।

নিম্নে হতাশা দূরীকরণের উপায়সমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **সদস্যদের প্রয়োজন অনুধাবন :** দলীয় সদস্যদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিকে এবং সাধ্যমতো তাদের প্রয়োজন মিটানোর চেষ্টা করেত হবে, তবেই হতাশা দূর করা সম্ভব হবে।

২. **সঠিকভাবে অধস্তন নির্বাচন করা :** দলের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে বা নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিকে সঠিকভাবে অধস্তন নির্বাচন করতে হবে, যাতে দলে সদস্যদের মনোমালিন্য না থাকে, তবেই হতাশা দূর হবে।

৩. **কর্তৃত্ব/নেতৃত্ব হস্তান্তরের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করা :** দলের সদস্যদের নেতৃত্ব হস্তান্তরের উপর ভালো বিশ্বাস সৃষ্টি করার মাধ্যমে হতাশা দূর করা যায়।

৪. **দলীয় সদস্যদের মধ্যে ভালো ব্যবহার :** উধর্বতন কর্মকর্তা দলের সদস্যদের মধ্যে ভালো ও গঠনমূলক ব্যবহার করতে হবে এবং যে কোনো সমস্যা বুঝার চেষ্টা করতে হবে। তবেই হতাশা দূর করা সম্ভব হবে।

৫. **অধস্তনদের নিকট কাজ এবং নেতৃত্ব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে :** দলের সদস্যদের নিকট কার্য এবং নেতৃত্ব পুরোপুরিভাবে ব্যাখ্যা না করলে তাদের নিকট হতে ভালো ফল লাভ করা যায় না। সুতরাং দলের সদস্যদের নিকট কার্যের উদ্দেশ্য, কার্যসম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রক্রিয়া বুঝিয়ে কাজ করার চেষ্টা করতে হবে তবেই হতাশা দূর হবে।

৬. **দলের সদস্যদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে :** দলের সদস্যদের হতাশা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে।

৭. **সঠিক যোগাযোগের সূত্র বজায় রাখতে হবে :** দলীয় সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগের সূত্র বজায় রেখে সঠিক কর্মফল আদায়ের মাধ্যমে হতাশা দূর করা যায়।

৮. **দলীয় সদস্যদের পুরস্কারের মাধ্যমে :** কোন ভালো কাজের জন্য সদস্যদের পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে। তাহলে সদস্যদের হতাশা অনেকাংশে দূর হবে।

২২.৩.৫ কার্য ব্যবস্থাপনা কৌশল :

কর্মবিভাজনে কাজের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিবরণ থাকে। কিন্তু বাস্তবে যেমন কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্ম বিশ্লেষণের এসব খুঁটিনাটি তথ্যকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। কারণ এসব বিষয় দেখতে গেলে প্রচুর সময় ব্যয় করা সম্ভবপর হয় না। তাই এরূপ অসুবিধা দূর করার জন্য কার্য বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে কাজের ধারাবাহিকতা নিরূপণ করতে হয়। এটা কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলির সংক্ষিপ্ত সার ছাড়া আর কিছুই নয়।

নিম্নে এর ধারাবাহিকতা উপস্থাপন হলো :

১. কী কী ক্ষুদ্র কার্য সম্পাদন করতে হবে?
২. উক্ত কার্য সম্পর্কে কী কী দায়িত্ব জড়িত আছে?
৩. উক্ত কার্যসম্পাদনে কীরূপ দক্ষতা ও ট্রেনিং এর প্রয়োজন?
৪. কী কী ধরনের অনুকূল কার্য পরিবেশ প্রয়োজন?
৫. কার্যসম্পাদনের জন্য কী ধরনের কর্মীর প্রয়োজন?

উপরিউক্ত তথ্যাবলি বিবেচনা করে কর্মের ধারাবাহিকতা নিরূপণ করতে হয়।

কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যসম্পাদন করতে কর্মীদের কীরূপ যোগ্যতা প্রয়োজন হয় তা জানা যায়। তাই একটি প্রতিষ্ঠানে একই ধরনের কার্যগুলোকে খুঁজে বের করা যায়। ফলে কর্মীদের প্রমোশন, ট্রান্সফার ইত্যাদি ব্যবস্থা সহজভাবেই করা যায় আর তা সম্ভব হয় ধারাবাহিকতা নিরূপণের মাধ্যমে।

কার্য বিশ্লেষণের ফলে কার্যসম্পাদনের বিভিন্ন পরিবেশকে ভালোভাবে জানা যায়। কার্য পরিবেশ সম্পর্কে এভাবে ভালো জ্ঞান লাভ করে বুঝা যায় যে, কার্য পরিবেশগুলো কার্যসম্পাদনের অনুকূল বা প্রতিকূল; যদি প্রতিকূল হয় তবে সত্বরই বিভিন্ন অসুবিধা দূর করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া যায়। আর তা সহজ হয় ধারাবাহিকতা নিরূপণের ফলে।

২২.৩.৬ কার্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা ও সংগঠন :

সাধারণত যে কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রত্যেক কর্মীর কার্যাবলি নির্দিষ্ট থাকে। এই নির্দিষ্টতা যে তালিকার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে কর্মবিবরণী বলে। প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন ব্যক্তিকে কী কী কাজ কর্মকর্তার অধীনে সম্পাদন করতে হবে তার বিশদ বর্ণনার তালিকাকে কর্মবিবরণী বলে।

অর্থাৎ কর্মবিবরণী হলো এমন একটি তালিকা, যেখানে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রত্যেক কর্মীর করণীয় যাবতীয় কার্যাবলির বর্ণনা থাকে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে।

পরিশেষে বলা যায়, একজন কর্মীকে কী করতে হবে তা ঠিক করাকে কর্ম বলা হয় এবং কীভাবে কাজটি সম্পাদন করতে হবে তার শ্রেণিবিভাগই কর্মবিভাজন আর এগুলো যেখানে লিপিবদ্ধ থাকে, তাকে কর্ম বিবরণী বলে

পরিকল্পনা :

সাধারণত কোনো কিছু করার আগে করণীয় সম্পর্কে আগাম চিন্তাভাবনা করাই হচ্ছে পরিকল্পনা। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপকে পরিকল্পনা বলে। আর যখন কোনো নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে কর্মপরিকল্পনা বলে। প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনের জন্য সঠিক উপায়ে এবং উপযুক্ত সময়ে কার্যসম্পাদনের পদক্ষেপই হলো কর্মপরিকল্পনা।

সুতরাং বলা যায়, যে পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ লেখা হয় এবং কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়, তাকে কর্মপরিকল্পনা বলে।

২২.৩.৭ সঠিকভাবে কার্য সম্পাদন :

সাধারণত যে কোনো কাজ শুরু করে তা শেষ করাই হলো কার্যসম্পাদন। অর্থাৎ কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য পরিকল্পিতভাবে যাবতীয় কার্য শুরু বা আরম্ভ করে তার সফল সমাপ্তি হলো কার্যসম্পাদন। কার্যসম্পাদনে প্রেষণা পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। প্রতিষ্ঠানের কর্মীর যদি কর্মসম্পাদনে আগ্রহ না থাকে তবে কোনো সংগঠনই পরিকল্পিতভাবে কার্যকে বাস্তবায়িত করতে পারে না। কার্যসম্পাদন করতে হলে কার্যের কলাকৌশল সম্পর্কিত জ্ঞান থাকতে হবে। আর কলাকৌশলের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে একজন কর্মী বা নির্বাহী কার্যসম্পাদনের কলাকৌশল সম্পর্কে অবগত ও বাস্তবে তা প্রয়োগ করতে পারে। সুতরাং বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের সফলতা, ভাবমূর্তি বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা কলাকৌশল শিখে যে কোনো কাজ পরিকল্পিতভাবে আরম্ভ করে তা সমাপ্ত করাই হলো কার্যসম্পাদন।

ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, কারও উপর কোনো কাজ করার দায়িত্ব অর্পণই হলো কার্যসম্পাদন।

২২.৪ যৌথ আলোচনা

২২.৪.১ যৌথ আলোচনার সংজ্ঞা :

যৌথ আলোচনা : কমিটির বা দলের ব্যাপক ব্যবহারের প্রধান কারণ যৌথ বিচার-বিবেচনাভিত্তিক সিদ্ধান্তের সফলতা। একটি অতি পুরাতন প্রবাদ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য "দুই মাথা এক মাথার চেয়ে উত্তম।" দল এ প্রবাদেরই সার্থক প্রতিফলন। যৌথ সিদ্ধান্ত সবসময়ই একক সিদ্ধান্ত অপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রত্যেকের নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা, মত, বক্তব্য ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ের মাধ্যমে দলের সদস্যরা নিজ নিজ কার্যশক্তি বর্ধন করেন। এ কার্যশক্তি বর্ধন প্রক্রিয়াই হলো যৌথ আলোচনা।

২২.৪.২ বিশ্লেষণমূলক নীতি এবং যৌক্তিক চিন্তা :

বিশ্লেষণমূলক নীতি : ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে সিদ্ধান্তকে বিবেচনা করে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে বিচার-বিশ্লেষণপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নীতিকে বিশ্লেষণমূলক নীতি বলে।

যৌক্তিক চিন্তা : কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে সিদ্ধান্তকে গণ্য করে পূর্ব ঘটনার জের ধরে সমস্যা সমাধানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চিরাচরিত নীতি বলে। যেমন একজন কর্মী যদি কয়েকদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে কর্তৃপক্ষ কর্মীকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্তটি এ জাতীয় সিদ্ধান্তের অন্তর্গত।

২২.৪.৩ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাপসমূহ :

প্রায় সব কাজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নে অনেকগুলো বিকল্প কার্যক্রম হতে একটিকে যেমন বেছে নেয়ার দরকার হয় তেমনি সংগঠনে কাকে কোন কাজ দেয়া হবে এ ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাই অনেকেই ব্যবস্থাপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া মনে করেন।

নিম্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো :

১. **P.F. Druker** মনে করেন "একজন ম্যানেজার যা কিছু করেন তা করেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে।"

২. **R.S. Davar** সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে– "সুনির্দিষ্ট কোনো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি বিভিন্ন বিকল্প আচরণ হতে একটিকে বেছে নেয়ার যে পন্থা তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ।"

৩. **Joseph L. Massie ও John Doughlas** বলেছেন, "সিদ্ধান্ত হলো কতকগুলো বিকল্প হতে নির্বাচন, সচেতন মানসিক প্রক্রিয়ার পরিণাম এবং বিশেষ লক্ষ্য পূরণের প্রয়াস।"

সুতরাং বলা যায়, পরিকল্পনা প্রণয়নে অনেকগুলো বিকল্প হতে যে কোনো একটি বিকল্প বেছে নেয়াকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতি ও পদ্ধতিসমূহ : ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সিদ্ধান্ত একটি জটিল প্রক্রিয়া। নিম্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান প্রধান নীতি ও পদ্ধতিসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১. **চিরাচরিত নীতি :** কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে সিদ্ধান্তকে গণ্য করে পূর্ব ঘটনার জের ধরে সমস্যা সমাধানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চিরাচরিত নীতি বলে। যেমন একজন কর্মী যদি কয়েক দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকে তাহলে কর্তৃপক্ষ কর্মীকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্তটি এ জাতীয় সিদ্ধান্তের অন্তর্গত।

২. **বিশ্লেষণমূলক নীতি :** ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে সিদ্ধান্তকে বিবেচনা করে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে বিচার-বিশ্লেষণপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নীতিকে বিশ্লেষণমূলক নীতি বলে।

৩. **অংশগ্রহণমূলক বনাম অ-অংশগ্রহণমূলক নীতি :** অংশগ্রহণমূলক নীতিতে ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সকলের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আর অ-অংশগ্রহণমূলক নীতিতে ব্যবস্থাপকগণ সমস্যার সঙ্গে জড়িত তথ্যাবলি সংগ্রহ করে বিচার-বিশ্লেষণ করে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

৪. **গণতান্ত্রিক বনাম ঐকমত্য নীতি :** গণতান্ত্রিক নীতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অপরপক্ষে ঐকমত্য নীতিতে দলীয় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৫. **কেন্দ্রীভূত বনাম বিকেন্দ্রীভূত নীতি :** কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে শীর্ষ পর্যায়ের নির্বাহীগণ নিজেরাই সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। অপরপক্ষে, বিকেন্দ্রীভূত নীতিতে শীর্ষ পর্যায়ের নির্বাহীগণ অধীনদের ওপর অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক অবস্থা, ব্যবস্থাপনার ধরন, বিভিন্ন পক্ষের মতামতের উপর। মূলত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন সঠিক পদ্ধতি নেই।

২২.৫ সমস্যা এবং তার সমাধান

২২.৫.১ সমস্যা সমাধানের ধাপসমূহ :

সহজ ও সাধারণ অর্থে চাওয়া ও পাওয়ার পার্থক্যকে সমস্যা বলা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে যেসব প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, তাকেও সমস্যা বলে অভিহিত করা যায়। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে কাজ করতে গিয়ে যেসব বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তাকে সমস্যা বলা যায়।

বিশেষ অর্থে : কাম্য অবস্থা এবং বর্তমান অবস্থার মধ্যে পার্থক্য থাকলে সেই পার্থক্যকেই সমস্যা বলা হয়।

নিচে চিত্রের সাহায্যে সমস্যা দেখানো এবং ব্যাখ্যা করা হলো :

সাধারণ অর্থে, **বর্তমান অবস্থা → বাধা/সমস্যা → কাঙ্ক্ষিত লক্ষ**

মৌলিক অর্থে : সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে কাজ সম্পাদনের জন্য জনবল, যন্ত্রপাতি ও ইমারতের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এগুলো যথাস্থানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ না পাওয়াকে সমস্যা বলে।

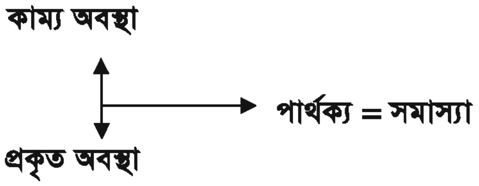

সমস্যা সমাধানের ধাপ/পদ্ধতিসমূহ : প্রাতিষ্ঠানিক কার্য সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে সমস্যা তিরোহিত করার জন্য বিকল্পগুলো হতে সর্বোৎকৃষ্ট বিকল্পটি গ্রহণ করে সমস্যাার মূল উৎপাটনকেই সমস্যা সমাধান বলে। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কতকগুলো ধাপ ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হয়। সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে যে কাজ শুরু হয়, ফলাবর্তনের মাধ্যমে তা শেষ হয়।

নিম্নে সমস্যা সমাধানের ধাপগুলো চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :

সমস্যা শনাক্তকরণ
↓
তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
↓
বিকল্প কর্মপন্থা নির্ধারণ
↓
বিকল্প কর্মপন্থা মূল্যায়ন
↓
সর্বোৎকৃষ্ট বিকল্প নির্বাচন
↓
সিদ্ধান্ত গ্রহণ
↓
সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
↓
ফলাবর্তন

১. **সমস্যা শনাক্তকরণ :** সমস্যা সমাধানের প্রথম ও প্রধান ধাপ হলো সমস্যা শনাক্তকরণ। রোগীর রোগ যদি সঠিকভাবে শনাক্ত করা যায় তবে চিকিৎসার কাজ অর্ধেক সম্পন্ন হয়ে যায়। ঠিক তেমনিভাবে সমস্যা চিহ্নিত করা গেলে সহজেই তার সমাধানও খুঁজে পাওয়া যায়।

২. **তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ :** সমস্যার মূলে যাওয়ার জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ। এ পর্যায়ে এসে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে কী কারণে সমস্যার সৃষ্টি হয় তা বিশ্লেষণ করা হয়। সমস্যার ধরন, প্রকৃত কারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেয়া হয়।

৩. **বিকল্প কর্মপন্থা নির্ধারণ :** সমস্যা সমাধানের তৃতীয় পর্যায়ে এসে এর সমাধানে কোন কোন পথ আছে তা খুঁজে বের করা হয়। ব্যবস্থাপক এ পর্যায়ে সমস্যা সমাধানের জন্য একাধিক বিকল্প পথ উদ্ভাবন করেন।

৪. **বিকল্প কর্মপন্থা মূল্যায়ন :** এ পর্যায়ে এসে প্রতিটি বিকল্প কর্মপন্থার ভালো ও মন্দ দিকগুলো যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন করতে গিয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় :

ক। সম্ভাবনা;

খ। মান;

গ। গ্রহণযোগ্যতা;

ঙ। খরচ;

চ। মূল্যবোধ ইত্যাদি।

৫. **সর্বোৎকৃষ্ট বিকল্প নির্বাচন :** মূল্যায়িত বিকল্পগুলো হতে যে বিকল্পটি সবদিক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট সেটি গ্রহণ করা হয়। সাথে সাথে অন্য বিকল্পগুলো বর্জন করা হয়। অনেক সময় একাধিক বিকল্পের সমন্বয়ে একটি গ্রহণযোগ্য বিকল্প নির্বাচন করা হয়।

৬. **সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** নির্বাচিত সমাধান বা পন্থাকে বাস্তবায়ন করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। একজন ব্যবস্থাপক যা কিছু করে তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমেই করেন। তাই এ পর্যায়ে ব্যবস্থাপককে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

৭. **সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন :** সমস্যা সমাধানের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন। কারণ শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেই চলবে না, সাথে সাথে বাস্তবায়ন না হলে কোনো ফল পাওয়া যাবে না। তাই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন শুধু সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন দ্বারাই সম্ভব।

৮. **ফলাবর্তন :** সমস্যা সমাধানের সর্বশেষ ধাপ হলো ফলার্বতন। এর মাধ্যমে মূলত সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হয়। যে আদর্শ মান অনুযায়ী কাজ হওয়ার কথা সে অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা দেখা হয়। যদি কোনো কারণে না হয় তবে পুনরায় একই প্রক্রিয়া করে সমস্যা সমাধানের পথ বের করা হয়।

২২.৫.২ সমস্যা বিশ্লেষণ :

সহজ ও সাধারণ অর্থ চাওয়া ও পাওয়ার পার্থক্যকে সমস্যা বলা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে যেসব প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, তাকেও সমস্যা বলে অভিহিত করা যায়। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে কাজ করতে গিয়ে যেসব বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তাকে সমস্যা বলা যায়।

বিশেষ অর্থে বলা যায়, কাম্য অবস্থা এবং বর্তমান অবস্থার মধ্যে পার্থক্য থাকলে সেই পার্থক্যকেই সমস্যা বলা হয়।

নিচে চিত্রের সাহায্যে সমস্যা দেখানো এবং ব্যাখ্যা করা হলো :

সাধারণ অর্থে, **বর্তমান অবস্থা → বাধা/সমস্যা → কাঙ্ক্ষিত লক্ষ**

মৌলিক অর্থে : সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে কাজ সম্পাদনের জন্য জনবল, যন্ত্রপাতি ও ইমারতের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এগুলো যথাস্থানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ না পাওয়াকে সমস্যা বলে।

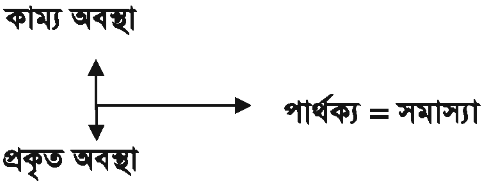

২২.৫.৩ সমস্যা চিহ্নিতকরণ :

সমস্যা শব্দটি আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে কোনো পরিস্থিতিতে এরূপ সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। ব্যবসায়িক জীবনে সমস্যার গুরুত্ব আরও বেশি। সমস্যা সমাধানের উপরেই ব্যবসায়িক সাফল্য নির্ভরশীল। ব্যবস্থাপক তাই যে কোনো পরিস্থিতিতে সৃষ্টি সমস্যা সমাধানের সচেষ্ট থাকে।

সমস্যা সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায়, উদ্দেশ্য অর্জনের পথে যে বাধার সৃষ্টি হয়, তাই হলো সমস্যা।

ব্যাপক অর্থে বলা যায়, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের পথে যে সকল অন্তরায় বা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, তাকে সমস্যা বলে। এ বাধাবিপত্তিসমূহ দূর করার জন্য আমাদের প্রথমেই সমস্যাকে চিহ্নিত করতে হবে। কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় তার জন্য সমস্যা চিহ্নিত করা একান্ত প্রয়োজন। সমস্যাটি কী, কোথায় সমস্যা, কী কারণে সমস্যা তা খুঁজে বের করাই হলো সমস্যা চিহ্নিতকরণ।

ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ হলো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করার পথে যাবতীয় বাধা বা অন্তরায় দূর করা। আর এটা দূর করার জন্য সমস্যাগুলো কী তা চিহ্নিত করা। সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারলেই সমস্যার অর্ধেক সমাধান হয়ে যায়। এখানে একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ডাক্তার ঠিকমতো রোগ ধরতে পারলে যেমন চিকিৎসার অর্ধেক কাজ সম্পন্ন হয়, তেমনি সমস্যাটি কী তার রূপরেখা জানলে সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া সহজ হয়।

২২.৫.৪ সম্ভাব্য সমাধানসমূহ

সমস্যার কারণ একটি বা অনেকগুলো হতে পারে। কিন্তু এর সম্ভাব্য সমাধানের পথ অনেক। যদি প্রতিটি সমস্যার মাত্র একটি করে সমাধানের উপায় থাকত তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি সরল সমীকরণে পরিণত হত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অনেক রকম উপায়ে অধিকাংশ সমস্যার মোকাবেলা করা সম্ভব। তাই অধিক কার্যকর সমাধানসমূহ নিরূপণ করতে হবে। তার জন্য বিকল্প সমাধানগুলো অনুসন্ধান করে তালিকাভুক্ত করতে হবে। নিম্নলিখিত বিকল্প সমাধানের ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

১. **ব্যবস্থাপকের পূর্ব অভিজ্ঞতা :** বিকল্প সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক তার পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারেন। অতীতে এ ধরনের সমস্যা সমাধান কোন পন্থায় সফলতা লাভ করেছিলেন বা সফলতা লাভ করতে পারেননি তা পর্যালোচনা করে বিকল্প সমাধান গ্রহণ করবেন।

২. **প্রতিষ্ঠানের পূর্বের নথিপত্রের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান :** ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত পূর্বের নথিপত্র খোঁজ করে দেখবেন অতীতেও বর্তমান সমস্যার মতো কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল কিনা। যদি হয়ে থাকে তবে তখন কী ধরনের সমাধান দেয়া হয়ছিল এবং তার ফল কেমন ছিল।

৩. **প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মতামত :** ব্যবস্থাপকের সহকর্মী, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অধস্তন কর্মী এবং প্রতিষ্ঠানের উচ্চস্তরের ব্যক্তিবর্গের মতামত অতীত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিবেচনা করে বিকল্প সমাধান গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪. **বিশেষজ্ঞের পরামর্শ :** সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিষয় বিশেষজ্ঞের নিকট থেকে সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫. **তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ :** যে কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ করে তার বিশ্লেষণ করলেও সমস্যার অর্ধেক সমাধান হয়ে যায়। সমস্যা সমাধানের মূলভিত্তিই হলো তথ্য। বর্তমানে কম্পিউটারের মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও অতি দ্রুত বিশ্লেষণ করে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

উপরের বিকল্প সমাধানের সূত্রগুলো উল্লেখ করা হলো, যা সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে থাকে।

২২.৫.৫ সর্বোত্তম সমাধান নির্ধারণ :

যে কোনো প্রতিষ্ঠানে সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে তা থেকে সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান নির্বাচন করে তা চিহ্নিত করতে হবে। মূল্যায়নকৃত শিল্প কার্যধারা থেকে সর্বোত্তম বা কাম্য বিকল্পটি গ্রহণই মূলত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকৃত কাজ। এ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বিকল্প হতে উত্তম পন্থাটি চিহ্নিত করে নির্বাচন করবেন। তবে সকল সময়েই যে উত্তম পন্থাটি নির্বাচন করবেন তা নয়। কারণ ব্যবস্থাপককে প্রায় কতগুলো সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়। তাই প্রাতিষ্ঠানিক দিক বিচারে নির্বাচিত বিকল্পের কার্যকারিতা ব্যয়, অর্থ, সময় ইত্যাদি সকল দিক বিচারে যেটি উত্তম বলে প্রতীয়মান হয় সেটিকে চিহ্নিত করে নির্বাচন করবেন।

২২.৫.৬ সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ :

সাধারণত কাজ করার পথটি সর্বদা মসৃণ থাকে না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে কাজ সঠিকভাবে হয় না। সমস্যা সমাধান একটি জটিল ব্যবস্থাপকীয় কাজ। নিম্নে সংক্ষেপে সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হলো :

সমস্যার ধারন ও প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বিভিন্ন সময় একই প্রতিষ্ঠানে নানা ধরনের অথবা একই ধরনের সমস্যা বার বার আসতে পারে। তাই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথমে তার ধরন ও প্রকৃতি নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়। ডাক্তার যেমন উত্তম চিকিৎসার জন্য প্রথমে তার রোগীর রোগ ধরার চেষ্টা করেন, ঠিক

তেমনি ব্যবস্থাপক সমস্যা সমাধানে সমস্যার মূলে যেতে চেষ্টা চালান। ব্যবস্থাপক সমস্যা সমাধানের জন্য তার কারণ আবিষ্কারের পরই সমস্যা সমাধানের পথ বের করেন। কোন কোন পথে সমস্যার ভালো সমাধান পাওয়া যাবে সে পথগুলো চিহ্নিত করেন। পথ বের করার পর কোন পথে সফলতা কী পরিমাণ পাওয়া যাবে তা নির্ধারণ করেন। পথগুলোর সুবিধা-অসুবিধাগুলো এ পর্যায়ে মান নির্ধারণ করা হয়। সাথে সাথে সর্বোধিক সুবিধাজনক পথটি সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রহণ করেন।

এ পর্যায়ে এসে সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে সর্বাধিক সুবিধাজনক পথটির দ্বারা সমস্যা সমাধান করা হয়। কোনো কারণে তা যদি বাস্তবায়ন করা না যায় তবে অন্য পথের কথা চিন্তা করে একই পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক তার জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রতিষ্ঠানে সংগঠক যে কোন ধরনের সমস্যা সমাধান করতে সচেষ্ট হয়।

22.6 Skill in Communicative English

22.6.1 About Trade Related Topic

Conversation A

S1. Is there any fish processing plant in Bangladesh?

S2. Yes, more than one hundred fish processing plant in Bangladesh.

S1. What does it (Fish Processing Plant) do?

S2. Through fish processing plant processors processes many kinds of fish, shrimp, prawn etc. and export.

Conversation B

S1. What is the position of fisheries sector in case of revinue income by export?

S2. It is the second largest source of revinue income.

S1. What is the present condition?

S2. Export is increasing now day by day.

Conversation C

S1. What is the procedure of export?

S2. When product is ready then there is a random sampling in processing plant. Collected samples are sending to the laboratory for testing and certifying. By showing this certificate to customs department, processors export the product.

S1. Who perform test and who is certify authority?

S2. Fish Inspection and Quality Control Laboratory, Department of Fisheries Performs Test and Certify it. It is the Governmental Authority for quality control of fisheries sector.

22.6.2 Common Health Problem and Quiting & Findings Jobs

Common Health Problem

Conversation A

S1. I have a terrible headache today.
S2. Have you taken any aspirin for it?
S1. Yes. I'll get over it soon.
S2. Lying down for a few minutes might help it too.

Conversation B

S1. I've got a cold in my head.
S2. It's probably this terrible weather,
S1. Yes. It's giving everyone a cold.
S2. I hope I don't catch one.

Conversation C

S1. What are you taking for your cold?
S2. Just the usual things—water and fruit juice.
S1. You'll be over it soon then.
S2. I really hope you're right.

Conversation D

S1. You look tired. Are you ill?
S2. I think I've caught a cold.
S1. How can you tell?
S2. My throat is sore.

Conversation E

SI- You don't look very well.
S2. I don't feel very well cither,
S1. Why don't you rest for a few minutes?
S2. I think I will.

Common Health Problems / Exercises 1-5

Exercise 1 / Line Al /

I have a terrible headache today.

stomachache	I have a terrible stomachache today,
severe	I have a severe stomachache today,
backache	I have a severe backache today,
very bad	I have a very bad backache today,
earache	I have a very bad earache today.

Exercise 2 / Line A4 /

Lying down might help it too.

Taking some medicine	Taking some medicine might help it too.
resting a while	Resting a while might help it too.
going to bed	Going to bed might help it too.
drinking some tea	Drinking some tea might help it too.

Exercise 3 / Line Cl /

What are you doing for your cold?

toothache	What are you doing for your toothache?
upset stomach	What are you doing for your upset stomach?
rheumatism	What are you doing for your rheumatism?
sore throat	What are you doing for your sore throat?

Exercise 4 / Line D2 /

I think I've caught a cold.

broken my finger	I think I've broken my finger.
scratched my arm	I think I've scratched my arm.
injured my knee	I think I've injured my knee.
hurt my shoulder	I think I've hurt my shoulder.

Exercise 5 / Line D4 /

My throat is sore.

toes	My toes are sore,
leg	My leg is sore,
shoulders	My shoulders are sore.
wrist	My wrist is sore,
chest	My chest is sore.

Quitting and Finding Job/Conversations

Conversations A

S1. How did you find your?
S2. I went to an employment agency?
S1. Was it worth it to do it that way?
S2. Yes. They were able to get me something good right away.

Conversation B

S1. I think I'm going to change jobs.
S2. What do you want to do that for?
S1. There's not enough chance to get ahead here.
S2. But don't forget you're getting a pretty good salary.

Conversation C

S1. Did it take you long to apply for a job?
S2. Too long in my opinion.
S1. What did you have to do?
S2. Speak to people, fill out forms and wait.

Conversation D

S1. Is John going to quit his job next month?
S2. No. He's going to quit next January.
S1. Are his parents going to support him then?
S2. No. He isn't going to ask them for any money.

Conversation E

S1. I'd like to speak lo the personnel manager, please.
S2. May I ask what It's about?
S1. I'd like to see him about the position advertised in today's newspaper.
S2. Certainly, Just have a seat over there for a moment.

22.6.3 Office Details and Office Conversations

Office Details

Conversation A

S1. How long has that man **been** over there at the desk?
S2. About a minute or two, I think.
S1. Can you find out what he wants?
S2. I'll ask him right away.

Conversation B

S1. Has the secretary sent the letter yet?
S2. Yes. She's already sent them the letter.
S1. She still hasn't sent a copy of the letter to me.
S2. I forgot to tell you she gave me your copy.

Conversation C

S1. To whom did you send the invoice?
S2. I sent it to the General Sales Company.
S1. Specifically, whom did you address it to?
S2. I addressed it to the purchasing agent.

Conversation D

S1. Have you finished the report on current inventory yet?
S2. No, I haven't, but I certainly wish I had.
S1. Why haven't you finished it?
S2. I didn't have enough time to spend on it yesterday.

Conversation E

S1. I'm having some trouble with this sales-volume report.
S2. You didn't have any trouble with your report last week.
S1. Well, there are some difficult parts in this one.
S2. I'm sorry, but I don't have any suggestions.

Office Conversations

Conversation A

S1. What did you spend all your time on today?
S2. Checking the annual report.
S1. Was everything in it all right?
S2. No. I discovered several errors.

Conversation B

S1. How is the mail handled?
S2. The executive secretary opens it and sorts it out.
S1. Is any record kept of incoming mail?
S2. Yes. Everything is entered on the mail register.

Conversation C

S1. Do you receive many inquiries about your product?
S2. Yes. There are a good number every day.
S1. You can't answer all of them personally, can you?
S2. No. Unless they're obviously important, we send back a form letter.

Conversation D

S1. I'd like to dictate a letter to the A.B.C. Company.
S2. Just a moment please, while I get my shorthand notebook.
S1. Would you also bring me the previous correspondence them?
S2. I've already put the file on your desk.

Conversation E

S1. I've been working very hard recently.
S2. How come you've been working so hard?
S1. I've been trying to impress my boss.
S2. I hope you haven't been working in vain.

22.6.4 About Practical Job

Conversation A

S1: When will your Final exam start?
S2: Next week.
S1: Is it your last year exam?
S2: Yes.

Conversation B

S1: After completion of exam what will you do?
S2: I will go to visit my ex Room met Office.
S1: Who is he?
S2: He is MR. Parvis, He complete the degree 2 years ago.

Conversation C

S1: Wher does he wark?
S2: Eurasia Food processing (BD) Ltd. Asulia, Saver, Dhaka.
S1: What type of office it?
S2: It is a Exportable Food processing plant.

Conversation D

S1: Why he choice this type of Job?
S2: Becouse it is his Subject related Job, and actually it is practical Job.
S1: Why do you say it practical Job?
S2: In this Job, he developes recepi and produce different types of food, check it, taste it, if everything ok then the company sells it to market. It is nice Job.

Conversation E

S1: Do you like this type of Job?
S2: Yes.
S1: But is it easy to get?
S2: I am studying in Food science. After completing my Study i will complete some Food Related Training coarse, i think then it will be very easy to find such kind of Job.

Conversation F

S1: Wher will you go for Training?
S2: BCSIR (Bangladesh Council for Scientific and Industrial Research), they provide different type of Food related traning course.
S1: I pray for your Success.
S2: Thank you.

22.6.5 On a specific situation and public speaking

Situation : cows and goats market on the two sides of a strect, wher Bus and other vehicles are passing the road.

Conversation A

S1: The cow is very nice to see, is not it?
S2: Yes it is very nice and healthy also.
S1: Last us to know about price?
S2: Yes, lst us talk to seller.

Conversation B

S1: What is the age of the cow?
S3: About 6 years.
S2: What is the price of it?
S3: BDT 30,000/=

Conversation C

S1: Since Bus are coming and passing the market, is it possible to carry the cow from the road market to otherside then my home.
S3: Wait, 9 am talking to the secetary of the market.
S2: As soon as possible you can talk with secretary, we agree to buy it.
S3: Ok.

Conversation D

S3: Hello how are you?
S4: Fine.
S3: It is difficult to carry cow or goat across the road, since bus is continuously coming.
S4: Ok. For half an hour, moving of vehicle is stopped, road is free for carrying cow or goat for half an hour.

Conversation E

S5: Why bus is not moving, driver?
S6: Our time is short. please move, we have to go home early.
S7 : Here there is a cow and goat selling market. market authority stopped vehiclle for half an hour.
S8 : It is not fair situation. this type of market should be situated outside of the rood.

22.6.6 About exchanging views with a persons and introducing Oneself

Conversation A

S1: Helow, I want to introduce with you.
S2: Ok fine, what is your name?
S1: I am Ashraf. and you?
S2: I am seraj.

Conversation B

S1: Is there any bus or train station?
S2: Why?
S1: I have to go chittagong.
S2: 0.5 kilometer north side, there is a big bus station. you can choice any bus and you can go.

Conversation C

S1: Which bus has comfortable journey?
S2: Here you can have many good bus service to chittagong. AL Baraka transprot, Jonaki transprot, AL amin transprot etc.
S1: Hhich have best service, and what is the fair of it.
S2: Al Baraka, fair is BDT 300/=

Conversation D

S1: How many far the train station?
S2: That is 2 kilometer distance from here.
S1: is there any train within 1 hour.
S2: Yes, upakul express, it has Direct service.

Conversation E

S1: How many time to reach chittagong by bus?
S2: More than 7 hours.
S1: How many time to reach chittagong by train?
S2: About 5 hours.

Conversation F

S1: What is train fair (upakul express) to chittagong.
S2: BDT 250/=
S1: Which journey is comfortable, bus or train?
S2: I think, train journey is more comfortable than bus.

22.6.7 Describe and narrate events, place, objects etc.

Conversation A

S1: Where did you go yesterday?

S2: Yesterday we had a study tour.

S1: Where was it?

S2: It was Eurasia Food processing (BD) Ltd. Asulia, Saver, Dhaka.

Conversation B

S1: How many time did you spend there?

S2: From morning to Evening.

S1: When did you reach there?

S2: We reached this Food Processing Factory before 9.00 am.

Conversation C

S1: What is the first thing did you see in the factory?

S2: First the authority gave 5 minutes breefing about this factory. then we went to paratha section with them.

S1: What did you see?

S2: There we saw different type of paratha are made up by high sophisticated machine named Rondo machine. one side of the machine received ingradient and other side deliver Final product, very much interesting.

Conversation D

S1: What was the sccond thing you see?

S2: We went hand made section.

S1: What was producing there?

S2: We saw workers are producing many hand made items named in Bangali puri, singara, samosa etc.

Conversation E

S1: What was the third thing you see?

S2: We went vegetable section.

S1: What was there?

S2: There were different type of vegetables processing.

Conversation F

S1: What was the fourth thing you see?

S2: We went to see cold storage.

S1: What was the tamperature of cold storage?

S2: That was -18^0 c.

Conversation G

S1: Did you visit all procesning section of the factory?

S2: Yes.

S1: During your visit, which dress you were wear?

S2: After entering the factory, every participants wear apron, cap, musk, gloves and new sandles also. then we entered in to the different processing section and visit.

Conversation H

S1: Did you prepare study report?

S2: No, but I have to prepare it.

S1: The factory is very nice. i think you will be able to prepare a good report.

S2: I will try.

সহায়ক পুস্তকের নাম (Reference)

1) Norman W. Desroiser-The Technology of Food Preservation
2) John M. DeMan-Principles of Food Chemistry.
3) S. Ranganna-Analysis and Quality Control for Fruit and Vegetable Products.
4) Dr. M. Swaminathan-Food Science. Chemistry and Experimental Foods.
5) Johnson/Peterson-Encyclopedia of Food Technology
6) R. Heiss-Principles of Food Packing
7) Maurice E. Stans by-Industrial Fishery Technology.
8) W.C. Frazis/D.C. Westhoff-Food Microbiology.
9) N Shakuntala Manay, M. Shadaksharaswamg-Foods, Facts and Principles.
10) JBP Boards of consultants and Engineers-Processing of Fruits, Vegetables and Other Food Products (Processed Food Industries)
11) J.G. Brennan/J.R. Butters/N.D. Cowell-Food Engineering Operations.
12) James M. Jay-Modern Food Microbiology
13) Michael J. Pelczar. Jr/Roger D. Reid-Microbiology
14) Slade, Food Processing Plants (Vol-2)
১৫) খাদ্য বিজ্ঞান-ডঃ মো শহীদুল হক
১৬) খাদ্য সংরক্ষণ মোঃ আবু আব্দুল্লাহ
১৭) ডাঃ এস এ খালেক-মাইক্রোবায়োলজি
১৮) অধ্যাপিকা নারয়েনী বসু-খাদ্য ও পুষ্টি
১৯) সৈয়দা হালিমা রহমান-বিপাক ও পুষ্টিবিজ্ঞান
২০) ফুড টেকনোলজী-জিন্নাত আরা বেগম
21) Eugen Pali-Classical Cooking, The Modern Way
22) R.S. Khurmi-A Text Book of Refrigeration and Air-Conditioning.
23) Kent-Jones and Ames-Modern Cercal Chemistry
২৪) নুরুল হক/মহির উদ্দীন-উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন
২৫) নুরুল হক/মহির উদ্দীন-ব্যবহারিক উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন
26) P.B Sarker-Organic Chemistry
27) Ladlimohan Mitra-A Text Book of Inorganic Chemistry
২৮) মোহাম্মদ ইউনুস-খাদ্য বিজ্ঞান (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক)
২৯) আ. স. ম. সিরাজ উদ্দীন-আধুনিক প্রাণ রসায়ন

৩০) ডঃ এস জেড হায়দার-উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন।
31) Sir Stanley Davidso-Human Nutrition and Dietetiecs.
32) Magnus Pyke-Catering Science and Technology
33) Josepn Merory-Food Flavours: Composition, manufacture and use.
34) Kramer and Twigg-Quality Control for the Food Industry (Vol^{m-1})
35) Kramer and Twigg-Quality Control for the Food Industry ($Vol^{m-2)}$
36) R. Less and E.B. Jackson-Sugar Confectionary and Chocolat Manufacture
৩৭) নুরুল হক/মহির উদ্দীন-স্নাতক ব্যবহারিক রসায়ন
38) Salvato-Environmental Sanitation
৩৯) জীববিজ্ঞান ২য় পত্র (একাদশ-দ্বাদশ), ড. এস এম আলী আশরাফ, ড. বিজন বিহারী সানা
৪০) জীববিজ্ঞান ১ম পত্র (একাদশ-দ্বাদশ), ড. মোঃ আবুল হাসান
৪১) পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র (একাদশ-দ্বাদশ), ড. আমীর হোসেন খান, প্রফেসর মোঃ ইসহাক, ড. মোঃ নুরুল ইসলাম
৪২) খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ-মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
৪৩) স্বাস্থ্য রক্ষায় পুষ্টি-অধ্যপক শাহ মোঃ কেরামত আলী
৪৪) কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন- ৪, আবু জাফর মোহাম্মদ হোসাইন খান
45) English Conversation Practice- Grant Tailor
৪৬) ফুড প্রসেসিং এন্ড প্রিজারভেশন-১, মোহাম্মদ আনোয়ার পারভেজ
৪৭) ফুড প্লান্ট ফান্ডামেন্টালস, তসলিম উদ্দিন ও মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম
৪৮) সমাজ কর্মের ইতিহাস ও দর্শন, ডঃ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম
৪৯) সমাজ কর্মের ধারণা ও তত্ত্ব, মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ
৫০) খাদ্য ও পুষ্টি শিক্ষা, নুর আহম্মদ ও শাহ্ মোঃ কেরামত আলী
৫১) উদ্যান বিজ্ঞান এবং ফল ও সবজি সংরক্ষণ, রামানন্দ চক্রবর্তী
৫২) ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড প্রিজারভেশন-২, সরোয়ার হোসেন
৫৩) ফল-সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, ড. শ্রীকান্ত শীল, এগ্রিবিজিনেস প্রমোশন স্পেশালিস্ট, বাংলাদেশ এগ্রিবিজিনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
৫৪) নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪৩ নং আইন), তারিখ ১০ অক্টোবর ২০১৩ ইং।
৫৫) সৌর শুকানো যন্ত্রে শাকসবজি শুকানো, ড. শ্রীকান্ত শীল, সাপ্লাই চেইন ডেভেলপমেন্ট কম্পোনেন্ট (এসসিডিসি) ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (এনএটিপি), হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, ২২, মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭

সমাপ্ত

২০১৮ শিক্ষাবর্ষ

ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড প্রিজার্ভেশন-২

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য